বঙ্গবন্ধুর শেষ

আনু মাহমুদ



বঙ্গবন্ধুর শেষ • আনু মাহমুদ

NP

Bangobondhur Vhashon
Pathak Shamabesh
Since
1987
5071801
Tk. 500.00

Northern University
NUB
Library
Bangladesh

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

আনু মাহ্‌মুদ
সম্পাদিত

NP
ন্যাশনাল পাবলিকেশন

Dhaka Bangladesh
Establish 2014
patbak@bol-online.com

প্রকাশক
এইচ এম ইব্রাহিম খলিল
ন্যাশনাল পাবলিকেশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১-৫৮৪২৬২
স্বত্ব
লেখক
সংশোধিত সংস্করণ
বইমেলা-২০১৫
প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ
কম্পোজ
শাওন কম্পিউটার
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০
মুদ্রণ
পাণিনি অফসেট প্রেস
পরিবেশক
আলীগড় লাইব্রেরী
নিউমার্কেট, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৫২৮৪৪৬

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭, ০১৫১৯৫২১৯৭১

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঘরে বসে ন্যাশনাল পাবলিকেশন-এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন : http://rokomari.com/np

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 98772
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

'Bangobondhur Vhashon' Edited by Dr. Anu Mahmud Published By H. M. Ibrahim Khalil, National Publication, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100. 2nd Edition : 2015. Price : 500.00 Tk. Only. E-mail : nationalpablication@gmail.com

ISBN: 984-711-201-2

উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। এর পটভূমি তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। হাজার বছর ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে টিকে থাকলেও একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে উনিশ শ' বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই। অবশ্যি ভাষা আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল ১১ মার্চ ১৯৪৮ থেকে। একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে জিন্নাহর চেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই আন্দোলন দানা বাঁধে। একথা ঠিক, বাঙালিরাও বিপুলভাবে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। মূলত আর্থ-সামাজিক মুক্তির আশা নিয়েই তাঁরা তা চেয়েছিলেন। তারা আশা করেছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রটি হবে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণধর্মী। জমিদারি প্রথা দ্রুত উচ্ছেদ করে পূর্ব বাংলার কৃষকদের ওপর শোষণের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এই রাষ্ট্র তৎপর হবে। প্রশাসনিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ অনগ্রসর বাঙালিদের দেয়া হবে। কিন্তু নয়া রাষ্ট্রের বাজেটের প্রায় পুরোটাই খরচ হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যে। সেদিনের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন তারাই। তাই সরকারি জমা-খরচের ন্যায্য হিস্যা বাঙালিরা যে পান নি তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। উল্টোটা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় বাংলা ভাষার ওপর নেমে আসে নগ্ন আঘাত। ফলে তাদের নিজস্ব সংহতি, রাজনীতি, অর্থনীতির বিকাশের পথ হয় রুদ্ধ।

আমলাতান্ত্রিক, অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক পাকিস্তানি রাষ্ট্রের চাপে বাঙালিদের বেড়ে ওঠার সকল প্রয়াস ধুলিসাৎ হয়ে যায় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বেশ কটি ভাষাপ্রেমী তাজা প্রাণ। সেদিনই পূর্ববাংলার মূলত কৃষক সন্তান মধ্যবিত্ত তরুণেরা পাকিস্তান ধারণাটির কবর রচনা করে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বহুমাত্রিক আধুনিক এক নয়া রাষ্ট্রচিন্তার বীজ বপন করে। চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়, একষট্টির রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং অসংখ্য ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। এ সকল আন্দোলনে অনেক নেতারই অবদান ছিল। কিন্তু তাদের সকলের অবদানকে তুচ্ছ করে ধীরে ধীরে একজনই কেবল বেড়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই যে সমগ্র বাঙালি জাতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে। তাঁর চোখ দিয়েই যে সমগ্র বাংলাদেশকে দেখা যেত। সুখে-দুঃখে তাঁর উপস্থিতি প্রায়

সকলেই অনুভব করতেন। আর সে কারণেই ঊনসত্তরের সকল গণঅভ্যুত্থান শেষে ছাত্রজনতা তাঁকে বাংলার বন্ধু বা বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে নিজে বেড়ে উঠেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তারও পূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছেন।

বিশ্বের দেশে দেশে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই সুদীর্ঘ সংগ্রাম করে তাঁদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এসব নেতাদের মধ্যে ঘানার খামা এনক্রুমা, ভিয়েতনামের হো চি মিন, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন, বার্মার আউঙ্গ সান, শ্রীলংকার বন্দরনায়েক, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত এবং আলজিরিয়ার আহমেদ বেন বেল্লার নাম প্রণিধানযোগ্য। নিজ দেশ ও জাতির জন্য এদের অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে কালজয়ী হয়ে থাকবে। তাই তারা বিশ্বনন্দিত নেতা এবং স্ব স্ব দেশের জাতির পিতা। এসব নেতৃবৃন্দের মাঝেও বঙ্গবন্ধু চিরভাস্বর, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য। বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে প্যাট্রিস লুমুম্বার মতো সাহসিকতা, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো উদার্য, সুকর্নের মতো বাগ্মিতা, হো চি মিন-এর মতো দৃঢ়চেতা মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। এ যেন একের মাঝে অনেক নেতার সমাহার।

কঙ্গোর ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে প্যাট্রিস লুমুম্বা নিহত হবার পূর্বে বলেছিলেন, "I prefer to die with my head high, unshakable faith and greatest confidence in the distiny of my country, rather than live in slavery."

সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করানোর প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু যে বক্তব্য প্রদান করেন তা মনে হয় প্যাট্রিস লমুম্বার কথারই প্রতিধ্বনি : "I am not intersted in being the Prime Minister, showered on me is the only thing which I would cerish all through my life. Neither the jails of Ayub Khan-Monem Khan, nor a conspiracy case could me feel weak." (Voice of Freedom, edited by Zahid Hassan, Bangabandhu Parishad, 118 Bashiruddin Road, Dhaka. pp.173)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ফাঁসির রুজ্জু অথবা পরাধীন দেশে মুক্ত জীবন ও এ দুয়ের মাঝে ফাঁসির রুজ্জুই বেছে নিয়েছিলেন, স্বাধীনতাহীনতা নয়। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতের ঘটনা সম্বন্ধে ডেভিড ফ্রস্টকে বলতে যেয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেন তাতে জনগণের জন্য তার ভালোবাসা, ত্যাগ ও সাহসিকতার একই সুর অনুরণিত হয় : "They will kill my whole people. They will make a massacre. I thought it is better I die and at least save my people who love me to much. I must share the suffetings of my people along with them. I must share. I can't leave them on the face of fire. I can't (মুহাম্মদ আবদুল হাই : ইতিহাস বিকৃতির বেড়াজালে বঙ্গবন্ধু, দৈনিক জনকণ্ঠ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২০০৪, পৃষ্ঠা ২১)। এমনকি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের প্রলোভনেও তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। আন্তর্জাতিক জনমত এবং ক্ষমতাধর শত্রুমুক্ত বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তি দেওয়ার প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দেন, যা বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখান করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার একমাত্র বঙ্গবন্ধুরই ছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার অর্জন করেছেন এ বাংলার জনগণের জন্য। তার সারা জীবনের আন্দোলন সংগ্রাম এবং সত্তরে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মধ্যে দিয়ে–এটি কারো দান নয়। আর ঐ অধিকার স্বাধীনতা ঘোষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একাত্তরের ১০ এপ্রিলের (১৯৭১) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। যা হলো নিম্নরূপ :

"যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছায় এবং বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যেহেতু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

১ মার্চ একাত্তর, দুপুর ১৫০ মি. বেতারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। খবর শুনেই বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে এল। তাদের নিকট এটা প্রতিভাত হলো যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর হাতে পশ্চিমারা কিছুতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। পূর্বাণী হোটেলে তখন আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভা চলছিল। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পূর্বাণী হোটেলের দিকে ছুটল বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য। সেখানে বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২ মার্চ ঢাকার এবং ৩ মার্চ সারা

দেশে হরতাল ঘোষণা করলেন। ২ মার্চ রাতে কার্ফু জারি করা হলো। ছাত্র-জনতা কার্ফু ভঙ্গ করলে সেনাবাহিনী গুলি চালাল। বেশ কিছু লোক হতাহত হলো। বাংলাদেশ পরিচালিত হলো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ২০ লক্ষ জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু কার্যত স্বাধীনতাই ঘোষণা করলেন। উচ্চারণ করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এর মাঝে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে বিহারী-বাঙালি দাঙ্গা শুরু হলো। সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রচুর বাঙালি নিহত হলেন। সারাদেশে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটি সেনানিবাস ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো চিহ্নই রইল না সারা পূর্ব বাংলায়। বস্তুত বঙ্গবন্ধু দেশকে de facto স্বাধীন করে ফেললেন। এ বিষয়ে প্রতিথযশা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী জেড আর খানের মতে :

"He was the only political leader in the world history who established a de facto government in a nation of 75 million people through non-violent civil disobedience movement (Gandhi and King never established de facto government)" (Zillur R.Khan, The Third World Charismat: Sheikh Mujib and the sturggle for Freedom, University Press Ltd, Dhaka 1996, pp-5).

এ সময়ে বাংলাদেশের উপর বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ এতই ব্যাপক ছিল যে এ সম্বন্ধে লন্ডনের The Evening Standard যথার্থই বলেছেন :

"Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan, with complete support of the population. Rahaman's home in Dhanmondi, already known as Number 10, Downing Simitation of the British Prime Minister's residence, had been besieged by bureaucrets, politicians, bankers, industrialists and the people from all walks of life."

২৩ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন। এর মাঝে জেনারেল ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনীতিবিদরা ঢাকায় এলেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক সহচরদের আলোচনা শুরু হল। কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টো কিছুতেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উপস্থাপিত রাজনৈতিক সমাধানের ফর্মুলা মেনে নিতে পারল না। আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনা ও সমরাস্ত্র আনা শুরু করল। এরই এক পর্যায়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা ত্যাগ করল এবং যাওয়ার পূর্বে সামরিক কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়ে গেল গণহত্যা চালিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে দমন করার জন্য। ইয়াহিয়া পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার খবর এবং ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান আর্মির সাজসাজ রব, এর কিছুই দৃষ্টি এড়ালো না বঙ্গবন্ধুর। আসন্ন সামরিক হামলার বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ করলেন তিনি। প্রস্তুতি নিতে বললেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, ছাত্র, শ্রমিক এবং জনগণেকে আসন্ন হামলা প্রতিরোধে। ই.পি.আর. পুলিশ, আনসার এবং সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন।

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির জীবনে ২৫ মার্চ এমনি একটি দিন। তড়িদগতিতে সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তা ছিল যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করা।

২৫ তারিখ সন্ধ্যারাতে যখন রক্তপাত এড়ানোর সকল পথ বন্ধ হল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরের রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং গণহত্যা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবার প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করে আনেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দুটি ঘোষণা দেন।

প্রথম ঘোষণাটি প্রস্তুত করেন রাত ১০ থেকে ১০.৩০ মি. এর মধ্যে। ঘোষণাটি প্রস্তুত ও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে টেপে ধারণ করা হয় তাঁর ৩২ নং বাসভবনে। ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

"This may be last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধারণকৃত এ টেপটি প্রচারিত হয় E.P.R. (Signal-এর Subedar Major Sawkat Ali কর্তৃক প্রস্তুত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তার E.P.R. Head Quarters-এর বাসা থেকে। প্রচারের সময় ছিল ১২.১৫ ভোররাত ২৬ মার্চ। এ ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছিল Voice mail এবং Morse Code-এ। E.P.R. Head Quaters-এ গোলাগুলি শুরুর পরমুহূর্তে এটি প্রচার করা হয়। (প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ই.পি.আর. ওয়ারলেসে স্বাধীনতার ঘোষণা। আরও তথ্য দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬, সংবাদ ৩১ মার্চ ১৯৯৭)।

এ সম্প্রচারের সত্যতা পাওয়া যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের বই Witness of Surrender-এর বর্ণনা থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, "When first shot has been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came finaly through a wavelength close to than of official Pakistan Radio. In the must have been and sounded like, a prerecorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the people's Republic of Bangladesh. (Withness to surrender, Oxford University Press, Karachi 19—. Page-75).

এর আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর এবং বেলুচিস্তান এবং বাংলাদেশের গণহত্যার নায়ক Gen. Tikka Khan-র একটি interview থেকে। (মুসা সাদিক, স্বাধীনতার ঘোষণা : বঙ্গবন্ধু, জিয়া ও টিক্কাখান, দৈনিক জনকণ্ঠ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২৬ মার্চ, ২০০৪) ১৯৮৮ সালে টিক্কাখান মুসা সাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি-ব্যান্ড রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম। শেখ সাহেবের কণ্ঠ আমি ভালো করেই চিনতাম। সে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহিতার শামিল ছিল। সে ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প উপায় ছিল না।" আর এক প্রশ্নের উত্তরে টিক্কাখান বলেন, "আমি ভালো করেই জানতাম শেখ মুজিবের মতো নেতা তাঁর নিজের লোকদের ছেড়ে যাবে না কোথাও। আমি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্যে ঢাকার সমস্ত জায়গায়, প্রতিটি বাড়িঘরে এমনকি কোণায় কোণায় তল্লাশি চালাতাম।"

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ। এটি প্রস্তুত করা হয় পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর। এটি প্রচার করা হয় টিএন্ডটি এবং ই.পি.আর. ওয়ালেসের মাধ্যমে :

Declaration of war of independence :

Pak Army suddenly attacked E.P.R Base at Pilkhana, Rajarbag police Line and killing citizens. Street-battles are going on in every street of Dhaka and Chittagong. I appeal to the nations of the world for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to libearat the country. Ask police, E.P.R. Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise. Victory is ours. Drive out the enemy from the holy soil of motherland, Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom.

May Allah bless you
Joy Bangla
Sk. Mujibur Rahman

(দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ পৃ. ১২)

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি কিছুটা সংশোধনী সহকারে পাঠকদের হাতে আরও আকৃষ্টভাবে তুলে দেওয়ার প্রত্যাশায় দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো।

ড. আনু মাহমুদ

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত আওয়ামী লীগের ৬-দফা / ১৭
আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি / ১৯
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি / ৩৫
ইনশাআল্লাহ্ সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবো / ৪৩
এই নির্বাচনে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে / ৫৪
আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি / ৫৬
শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন / ৬২
প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা / ৬৬
জনসাধারণের প্রথম মহান বিজয় / ৬৮
সাত কোটি বাঙালির জয় / ৭১
৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রেই সুবিচারের নিশ্চিতি / ৭৩
৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় / ৭৪
জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে / ৭৬
উস্কানিমূলক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান / ৭৭
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করুন / ৭৯
জনগণের রায় আমরা পেয়েছি / ৮১
বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করুন / ৮৬
আমার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র / ৮৮
শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি এগিয়ে আসবে / ৯০
চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে সফল হওয়া যাবে না / ৯৩
জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার চেষ্টা / ৯৫

পাকিস্তানে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে / ৯৬
আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট / ৯৮
ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমী / ১০২
শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায় / ১০৫
বাংলাদেশের মাটি থেকে গণবিরোধী শক্তিকে উৎপাটিত করুন / ১০৭
শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবে / ১১৪
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা দুর্ভাগ্যজনক / ১১৭
৩ মার্চ শোক দিবস হিসেবে পালিত হবে / ১২০
হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না / ১২৩
প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা / ১২৬
বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি / ১২৭
৭ মার্চ ১৯৭১ : রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ / ১২৯
আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে / ১৩৪
উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন / ১৪২
হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না / ১৪৪
আমরা এ কমিশন অনুমোদন করি না / ১৫৫
আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ পালনের জন্যে অভিনন্দন জানাই / ১৫৭
সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত / ১৫৮
দাবির প্রশ্নে কোন আপোস নেই / ১৫৯
বাংলায় মুক্তির জন্যে শেষ সংগ্রাম / ১৬১
অশুভ শক্তির চক্রান্ত সফল হবে না / ১৬৩
স্বাধীনতার ঘোষণা / ১৬৬
এই মুহূর্তেই আমি জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই / ১৬৭
অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে / ১৬৯
ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ,
বাংলা আমার ভাষা / ১৭০
আসুন সমবেতভাবে সোনার বাংলা গড়ি / ১৭৩
স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব / ১৮২
১৯৭২ সালের মহান মে দিবসে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু / ১৮৯
আমার কর্তব্য আমি করবো / ১৯৬
আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি / ২০৬
সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষা করতে নিজেদেরও আত্মসমালোচনা করুন / ২১৯
সংবিধানের আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার সমাজ গড়ে উঠবে / ২২৮
চারটি মৌলিক আদর্শের উপর শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে / ২৩৯
বাংলার দুঃখী মানুষের নিকট থেকে সরে যেও না / ২৫৭
ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়া প্রয়োজন / ২৮৩
কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে হবে / ২৯০
পুলিশ এখন জনগণের / ২৯৬
দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে / ৩০২
বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে / ৩১৮
বিনা কারণে সিস্টেম পরিবর্তন করি নি / ৩৩১
আপনারা কিন্তু সবাই এক / ৩৪৮

বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত আওয়ামী লীগের ৬-দফা

এক. পাকিস্তান হইবে একটি "ফেডারেশন" বা যুক্তরাষ্ট্র। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই,– ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সরকার হইবে "পার্লামেন্টারী" ধরনের, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইনসভা হইবে সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

দুই. যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে– যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ।

তিন. সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে।

অথবা

বিশেষ ব্যবহার শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন "স্টেট ব্যাংকের" পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি "রিজার্ভ ব্যাংক" থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকগুলি আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

চার. শাসন সম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহের সুবিধার জন্যে এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্যে কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোন ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃত অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে।

পাঁচ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

ছয়. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।

আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬-দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয় শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি– তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছে। ফলে ৬-দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী।

ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকার দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের

পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই ; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনলেই যাঁরা আঁতকাইয়া ওঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমি স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমরা প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভালো, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও

যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটিমাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আবার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এই প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থ শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম

বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান হইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বাঙ্কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজেই বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁরা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না। পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ

করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্শার মুদ্রা প্রচলন করা হইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সি সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম

পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষিদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের

তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন না যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই, আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না; কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক

বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসারবাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগ্‌ল্‌ ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগ্‌ল্‌ ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা, আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষিদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষির ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরিব চাষি

চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পাশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়াও উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করত এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন

সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, ঐ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত,

পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা বাষট্টি টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুশ শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইবে পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবহিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণ গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্টাই চাই।

আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমারা ইচ্ছা করিলেই গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানী মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের

কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি-আই-ডি-সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে– কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী

হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়– পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহীর অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদের হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়া সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহ্র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম

৪ চৈত্র, ১৩৭২

শেখ মুজিবুর রহমান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে, ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একই নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদ এবং পরে জাতীয় বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতোমধ্যে কয়েক বৎসর কারা-নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটকে রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়– যেমন : ঢাকা ত্যাগ করলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয়

তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সবলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান– আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ৬-দফা কর্মসূচি উপস্থিত করি। ৬-দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান– উভয় অংশের জন্যেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্যে ৬-দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনবলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা ৭টায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, ৮টায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা

প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিতে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত ৮ মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত ১টার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম, এন, এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম, এন, এ, জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ,

রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী-লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধিবলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার

পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখে রাত ১টার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারো সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রচার করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হওয়ার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌসুলি নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এ, এস, সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের কখনো দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুল রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান– এই তিনজন সি. এস. পি. অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে

অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামাল উদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দিনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে দমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনো ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আট জন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম. এন. এ. ও এম. পি. এ.। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০ জন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম. এন. এ., এম. পি. এ. ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল. এম. এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্যে ডা. সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল–দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্যে ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম–৬ দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্যে আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং

এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে–তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে–এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যে কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

ইনশাআল্লাহ্ সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবো

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন। ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতার ও টিভিতে নিম্নলিখিত ভাষণ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে ইংরেজিতে রেকর্ডিং করা হয়। বাংলা ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ।

জনগণের মুক্তির জন্যে যেসব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেসব বীর সন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তাঁরা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত, আমি আজ জাতীয় বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছাই নি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত ২২ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেইসব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যে সক্রিয় থাকবে। এজন্যে প্রয়োজন

হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবে। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষ আপোসহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষপর্যন্ত জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশেপাশেই থাকবে, স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবিলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোনো জাতি কোনোদিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায় নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবিলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। ক্ষমতাসীন চক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যে হামলার পর হামলা চালিয়েছে, আঘাতের পর আঘাত হেনেছে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি, বিজয়ী হয়েছি। এই বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে, সে সংকটসমূহের অবসান ঘটাতেই হবে। আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়ত অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলো বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজের ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার করে আছে তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং-সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা-সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগও দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নিকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর-প্রথা কায়েম রয়েছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপরপক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। ছিটেফোঁটা ভূমি-সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প, শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা, মজুরি যা বাড়ছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশি দ্রব্য তারা আমদানি করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিন গুণ বেশি বিদেশি দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশি মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে। তার কারণ, বাংলাদেশের অর্জিত ৫০০ কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানও একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধু অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হতে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে প্রতি মণ মোটা চালের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সে চালের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫

থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে সরিষার তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ টাকা থেকে ১৪০ টাকা– ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তার পরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমসের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত ২২ বছরে ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছে, এসব অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি, যে কর্মসূচি ১১-দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয়বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এজন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশি অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দানের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি।

এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা ও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল

সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে এক ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল সরকার কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ফেডারেশনের ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারি বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরিভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে– যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো–অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হবে। শৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিততর করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাটচাষিদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ আয়োজন দেখা দিয়েছে। পাটব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতি একই ধরনের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সেই জন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারি জায়গীরদারি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমিদখলের সর্বোচ্চসীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষিদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি-সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি-রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার

কথা ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজসম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ–সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি-সম্পদ গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তম্ভ সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটি সুসংহত ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিজলি। বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলি সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পাঁচশত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল-ব্যবস্থার উপরেও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি। সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক

Northern University Bangladesh NUB Library

শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলো বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্যারা-মেডিকেল পার্সোনেলদের ট্রেনিং দেয়া দরকার। শিল্প শ্রমিকরা গণআন্দোলনের মতোই অর্থনীতিক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকবার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যাদানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাত সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে-অঞ্চলে এবং মানুষে-মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহের নির্দেশিত ইসলাম নীতির পরিপন্থী কোন আইনই এ দেশে পাস হতে পারে না, চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনো মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এ জন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিপূর্বে 'সিয়াটো-সেন্টো' ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব– এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে–যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে। এই কারণেই আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধি–নিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোনো প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্রবাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে–আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবোই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশের সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো।

[সূত্র : দৈনিক আজাদ, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০]

এই নির্বাচনে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে

নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু সারা দেশে ব্যাপক নির্বাচনী সফর করেন। সেসব দিনে ছোট-বড় নির্ধারিত-অনির্ধারিত অসংখ্য জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন তিনি। ৩০ অক্টোবর, ১৯৭০ ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে তিনি এমনি এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো।

আসন্ন ডিসেম্বরের নির্বাচন ক্ষমতা লাভের নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে শোষিত ও অবহেলিত বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় বাঙালিরাই হবে তাদের নিজেদের সম্পদের মালিক।

বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়। একইভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার জন্যে দায়ী। এসব রাজনৈতিক পরগাছা সামান্য লাভ ও মন্ত্রিত্বের লোভে বাংলার মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে শোষকদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে।

আসন্ন নির্বাচনে এসব রাজনৈতিক গরগাছাদের শুধু উৎপাটিতই করা হবে না, তাদেরকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে এই বাংলার মাটি থেকে।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের আহ্বানেই ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই হক সাহেবকেই দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম সেনানী, তাঁর উপরও নেমে এসেছিল জেল-জুলুম ও অত্যাচারের খড়্গ। বাংলার দুর্ভাগ্য ছাড়া এটা আর কি হতে পারে?

কিন্তু আমি সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, আমি শেরে বাংলার মতো তেমন বৃদ্ধ হয়ে পড়ি নি। নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহলে আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্যে আমি গণআন্দোলনের ডাক দেব। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্যে এটা আমার শেষ সংগ্রাম। গত গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা

করতে যেয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ঋণ শোধ করতে প্রয়োজন হলে যাতে আমি জীবনও বিসর্জন দিতে পারি তার জন্যে আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। কারণ বীর শহীদদের সংগ্রামের ফলেই আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছি। নির্বাচনের পর জনগণের বিজয়ের বিরুদ্ধে কায়েমি, স্বার্থবাদী মহলের যে কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর জন্যে প্রয়োজন হলে গণআন্দোলন শুরুর যে পরিকল্পনা আমার রয়েছে তাতে অংশগ্রহণে প্রস্তুত থাকার জন্যে আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার আওয়ামী লীগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রদত্ত কর মওকুফের সুযোগ প্রত্যাহারও আমরা প্রস্তাব করেছি।

কিছু সংখ্যক লোক জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব লোক সমান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানী যে কোনো নাগরিকের মতোই সমান নাগরিক এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার জন্যে আমি সংখ্যাগুরু নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাই।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ১ নভেম্বর, ১৯৭০]

আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি

১২ নভেম্বর, ১৯৭০ মধ্যরাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে আঘাত হানে। এতে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায়। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হবার অনেক আগেই বিদেশি সংবাদদাতারা এ মর্মান্তিক সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচার করে। পাকিস্তান সরকারের আগেই বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলো কর্মতৎপরতা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণসামগ্রীসহ ন'দিন পর্যন্ত দুর্গত এলাকায় ব্যাপক সফর করেন। ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হন। ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখে ঢাকা হোটেল শাহবাগে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে তিনি প্রথমে যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন নিচে তা উদ্ধৃত হলো।

নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা–এই চারটি জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চল সফর করে আমি সবেমাত্র এখানে ফিরেছি। গত ১২ নভেম্বর রাতে এবং ১৩ নভেম্বরের ভোরে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবলীলায় যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ইতোমধ্যে সমগ্র বিশ্ব অবগত হয়েছে। মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জনগণের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যে আপনাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের কাছে বাঙালি আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে।

আমাদের হিসাবে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। অবশ্য কারো কারো মতে এই সংখ্যা ১০ লাখের বেশি। যে সমস্ত এলাকায় এখনো হাজার হাজার মানুষ ও মৃতদেহ সৎকারের অভাবে পড়ে রয়েছে, সে সকল এলাকায় বাতাস গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। খুলনায় পাইকগাছা, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, বোরহানুদ্দিন, চর লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা দ্বীপসহ ভোলার প্রায় সর্বত্র, কালাইয়া ও বাউফল থানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, গলাচিপা থানার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে চর অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থিত দ্বীপসমূহ, রাঙ্গাবালি, বড় বাইশদিয়া, ছোট বাইশদিয়া, চরকাজল ও পানপট্টিসহ পটুয়াখালী জেলার দুর্গত এলাকাসমূহ, নোয়াখালী জেলার উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ–বিশেষভাবে হাতিয়া, চর গাজী, চর আবদুল্লাহ, চর আলেকজান্ডার এবং রামগতি থানা ও সুধারাম থানার অন্যান্য দুর্গত অঞ্চলে ৯ দিনের বেশি সময় আমি ঘুরেছি।

এ সমস্ত অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর রেখে গেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাপ্রলয়ের ধাক্কা সামলে যারা এখনো প্রাণে বেঁচে আছে, তারা যে কী ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতির মধ্যে কালাতিপাত করছে, তাও ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। পটুয়াখালী, ভোলা ও নোয়াখালীর বহু অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০/২৫ ভাগ এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রাণে বেঁচেছে সত্য, কিন্তু ঘরবাড়ি, ফসল, গবাদিপশু অর্থাৎ পার্থিব সহায়সম্বল হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের পরনে কাপড় নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, এমন কি বহুস্থানে তৃষ্ণার পানিটুকু পর্যন্ত না খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। তাদের শরীরের আহত স্থানে ঘা হয়ে গেছে। এভাবে অসহায় বাত্যাবিধ্বস্ত অধিবাসীরা অনাহারে, অনাশ্রয়ে এবং রোগগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, দায়িত্ব পালনের প্রতিটি পর্যায়ে সরকারের চরম ব্যর্থতা। ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার দুদিন আগে 'সুপারকো' ও আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে খবর পাওয়া সত্ত্বেও উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের যথাযথভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় নি। হতভাগ্যদের কিছু লোককে অন্তত অন্যস্থানে অপসারণের কোনো প্রকার চেষ্টা করা হয় নি। ঘূর্ণিঝড়ের পর মৃতের সংখ্যা অথবা ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব নিরূপণের তেমন কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয় নি। সরকার মৃতের যে হিসাব দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য রকমের কম। প্রাথমিক সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৫০ জনের মতো বলে জানানো হয়েছে।

যদি প্রলয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্ধারকাজ ও সাহায্য অভিযান চালানো হতো, তাহলে হাজার হাজার লোককে বাঁচানো সম্ভব হতো, হাজার হাজার লোক–যারা প্রলয়ের ধাক্কা সামলেও টিকে ছিল তাদেরকেও অনাহারে, অনাশ্রয় ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হতো না। যদি নৌ-বাহিনী তৎপরতার সাথে উপদ্রুত অঞ্চলে গমন করতে তাহলে হাজার হাজার লোককে সাগরে সলিল সমাধি লাভ করতে হতো না। উদ্ধার কাজ ও সাহায্য অভিযানের এই ব্যর্থতা ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু উদাসীনতা আর অপরাধের এখানেই শেষ নয়।

আমি যে সমস্ত অঞ্চল ঘুরেছি সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের ১০ দিন পরেও বাত্যা-দুর্গতদের কাছে এক আউন্স রিলিফও পৌঁছায় নি। তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে বৃক্ষমূলে। এমন পানি তাদেরকে পান করতে হচ্ছে, মানুষ ও গবাদি পশুর লাশে যা পচে দুর্গন্দ ও বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেই পানি পান করে তাদের মুখে দেখা দিয়েছে দগদগে ঘা। উদরাময় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং কলেরা মহামারী আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

যে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজকর্মী এং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ রিলিফ দল দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্যে গিয়েছেন, প্রশাসন ব্যবস্থার অসহযোগিতার ফলে তাদেরকেও নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে যানবাহন ও যোগাযোগের সামান্যতম সুবিধা দিয়েও সাহায্য করে নি। যানবাহনের এই চরম সংকট দেখা দিত না যদি সরকার বিশেষ করে মার্শাল 'ল' সরকার সময়মতো তার ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য জেলা থেকে লঞ্চ ও অপরাপর নৌ-যান রিকুইজিশনের ব্যবস্থা করতেন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় তা দুর্গত এলাকার কাজে ব্যবহার করতেন। সেক্ষেত্রে তথাকথিত 'দুর্গম' এলাকার প্রশ্ন দেখাই দিত না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা বলতে পারি। কেননা, আমি নিজে একটা ছোট্ট ভগ্নপ্রায় লঞ্চের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপসমূহসহ প্রায় প্রতিটি দুর্গত অঞ্চলে যেতে পেরেছি। সরকারের এ সমস্ত ব্যর্থতা এবং লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে সাইক্লোনের ১০ দিন পরেও অনেক জায়গায় এতটুকু সাহায্যও পৌঁছে নি।

বর্তমানে কিছু কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু কিছু হেলিকপ্টার পরিদৃষ্ট হয়। আগে কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিমানযোগে রিলিফ নিক্ষেপের কাজ শুরু হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এটা প্রদেশব্যাপী জনগণের উচ্চ এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদেরই ফলশ্রুতি। সত্য কথা বলতে কি, সারা বিশ্ব থেকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য সামগ্রী এসে না পৌঁছলে অবস্থার হয়ত কোনো পরিবর্তন হতো না। বাংলাদেশের দুর্গত মানুষ বিশ্ব সমাজের মহানুভবতাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, আমাদের সরকারের এটা লজ্জারই কথা।

আমাদের দুর্গত ভাইদের জন্যে বহির্বিশ্বে অন্ন-বস্ত্র, ওষুধ এবং ঐ সমস্ত জিনিস দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে অত্যাবশ্যক পরিবহণ সরঞ্জাম পাঠিয়েছেন। বাঁচা-মরার প্রশ্নে যে সমস্ত দেশ উদার হস্তে সাহায্যদ্রব্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশের মানুষ চিরকাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আমার দুর্গত ভাইদের প্রতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দ্রুত ও মানবিক সাড়া দেওয়ায় সেসব দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি জানাই আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

বিদেশ থেকে দ্রুতগতিতে প্রাপ্ত বিপুল সাহায্য কেবল আমাদের সরকারের টালবাহানা এবং ঔদাসীন্যকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। ভাগ্যের পরিহাস, যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও পটুয়াখালীতে মৃতদেহ দাফন করতে হচ্ছে ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যদের। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম

পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারসমূহ অলসভাবে বসে আছে, সেখানে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু দূর-দূরান্তের দেশের হেলিকপ্টরের জন্যে। যেক্ষেত্রে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের জন্যে উদার হস্তে সাহায্যের কথা ঘোষণা করতে পেরেছে মাত্র দুদিনের মধ্যে, সেক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্গতদের জন্যে ৫ কোটি টাকা সাহায্য ঘোষণা করতে সময় লেগেছে ১০ দিন। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে ধরা হলে শুধুমাত্র চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সাহায্যের পরিমাণ অনেক ছাড়িয়ে যাবে।

যেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী দানশীল ব্যক্তিরা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেক্ষেত্রে বাংলার মানুষের রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা বাইশ পরিবারের কেউই আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য ঘোষণা করেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত বস্ত্রশিল্প এ যাবৎকাল বাংলাদেশকে তাদের প্রধানতম বাজার হিসাবে ব্যবহার করেছে, তাদের কেউই এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারের জন্যে একগজ কাপড় দেয় নি। এ জন্যেই কি বিগত দু'দশক ধরে আমরা আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করেছি? এ জন্যেই কি বাংলাদেশের পাটচাষি অভুক্ত থেকে করাচী ও লায়ালপুরের পুঁজিপতিদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে সহায়তা করেছে?

জাতীয় সংহতির সেই খুঁটিরা আজ কোথায়? ইসলামের স্বয়ম্ভু রক্ষকরা আজ কোথায়? কোথায় আজ মওলানা মওদুদী, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ? কোথায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা? বাংলাদেশের এই চরম দুর্দিনে দুর্গত মানুষকে এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু সাহায্য দেয়ার জন্যে তাদের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমান অভিজ্ঞতা একটি বিষয় আমাদের কাছে অতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এবং প্রতিটি বাঙালি সেই মহাসত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, তা হলো এতদিন, যাবৎ আমাদেরকে একটি কলোনি ও বাজারে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত অধিকার আমাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হয় নি। আমাদের জীবন-মরণের সমস্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদে। সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার আমলাদের হাতে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জঘন্য অবহেলা ও বৈষম্যের জন্যে আজ তাদেরকেই আমি দায়ী করছি, কেননা তারাই বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতির রুদ্ররোষের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। বাংলার ১০ লাখ আদম সন্তান প্রাণ হারিয়েছে,

আরো ৩০ লাখ মৃত্যু এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। স্বাধীনতার সময়কাল থেকে আমাদের বাস করতে হচ্ছে বন্যা এবং সাইক্লোনের মধ্যে।

আজাদীর ২৫ বছর পরেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে এমন কি পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি হয় নি। ১০ বছর আগেও একবার ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এই এলাকার মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এবার ১০ বছর পর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দশক আগে ঘূর্ণিবাত্যা প্রতিরোধী স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পূর্ণ এক দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও এসব পরিকল্পনা একগাদা প্রকল্পের মধ্যে আটকা পড়ে আছে এবং তা এখনো কার্যকর করা হয় নি। এসব ঘূর্ণিবাত্যা প্রতিরোধ আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্যে গত ১০ বছরে মাত্র ২০ কোটি টাকার সংস্থান হয় নি। অথচ ইসলামাবাদের বিলাস বৈভবের জন্যে ২২০ কোটি টাকার অভাব হয় নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানের মংলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্যে ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা দেয় নি।

এসব দেখেশুনে আজ আমাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, বাংলাদেশকে যদি প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে অবশ্যই আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে। তখনই কেবল আমরা ক্ষমতাসীন চক্রের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নই হোক আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রাম পুনর্গঠন বা ঘূর্ণিদুর্গতদের পুনর্বাসনই হোক, যে কোনো জরুরি সমস্যার সমাধান করতে পারব।

উপকূলবর্তী এলাকায় যারা বেঁচে আছে, তাদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুধ ও খাবার পানি যোগানোর জন্যে অতি শিগগির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর মাত্র কয়েকদিন বিলম্ব হলে সাহায্য গ্রহণের জন্যে সেখানে আর কাউকে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ যদি দেশে গণসরকার প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে তারা সাহায্যদ্রব্য দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্যে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে নিয়োজিত করতে পারতেন। আমলাদের যদি কোনো গণসরকারের কাছে নিজেদের কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হতো, তাহলে তাঁরা এত উদাসীন হতে সাহস পেতেন না।

দেশবাসীকে আরেকটি ঘূর্ণিবাত্যা ও গর্কির (সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস) অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে এক ব্যাপক পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ

করতে হবে। এজন্যে ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বাঁধ ও ঘূর্ণি প্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সুষ্ঠু বিপদ-সংকেত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। যারা প্রাণে বেঁচে গেছে, তাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে গবাদি পশু ও বিদ্যুৎচালিত লাঙ্গল সরবরাহ করতে হবে। তারা যাতে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে, সেজন্যে শীতকালীন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে বীজ ও কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। এর সবই করা সম্ভব যদি আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারি। আমরা আজ শপথ নিচ্ছি, বাংলার উপকূল অঞ্চলে এবার যা ঘটেছে তা আর ঘটতে দেব না। এবারের ঐতিহাসিক বিপর্যয় সারা বিশ্বের কাছে এই মহাসত্যই তুলে ধরেছে যে, ৭ কোটি বাঙালি কত অসহায়। শুধু শহরে-বন্দরে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নয়, বাংলার প্রতিটি পল্লীতে, প্রতিটি অলিতে-গলিতে, দ্বীপাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় এই মহাসত্যই আজ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে– আমাদের শাসনভার আমাদের হাতেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মালিক-মোক্তার আমাদেরই হতে হবে। আমাদের সম্পদ কিভাবে ব্যয়িত হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকতে হবে আমাদের। আর আমাদের তহবিল কিভাবে কোথায় ব্যয় করব, সেই ক্ষমতাও থাকতে হবে আমাদেরই হাতে।

আমরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, পুঁজিপতি ও সামন্তবাদী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত হতে চাই না। জনগণকে সর্বসময় ক্ষমতা অর্জন করতে হবেই। নির্বাচনে যদি হয়–ভালো, আর যদি না হয়, জাগ্রত জনগণের আত্মশক্তি তো অর্জন করতে হবে। বাংলার জনগণ অন্তরে এবং মনে ইতোমধ্যে ভোটের রায় ঘোষণা করেছে। তারা 'শক্ত কেন্দ্রের' বদৌলতে অনেক দুর্ভোগই ভুগেছে। জাতীয় সংহতির নামে তাদের উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। শাসকদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে, জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যাবে, তাঁরা হুঁশিয়ার হোন, বাংলাদেশ আজ জেগেছে। বানচাল করা না হলে বাংলার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের রায় ঘোষণা করবে। আর যদি নির্বাচন বানচাল হয়ে যায়, তাহলে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোক আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে, তা সম্পাদনের জন্যে, আমরা যাতে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে পারি তার জন্যে, আরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি তার জন্যে, প্রয়োজনবোধে আরো ১০ লাখ বাঙালি প্রাণ দেবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন

(৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন)

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারাদেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সঙ্কট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ ২৩ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতনভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পরপরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার ২৩ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান–বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তিসনদ ৬-দফা ও ১১-দফা

বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন, অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐকমত্যে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিসনদ ৬-দফা ও ১১-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও আদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যাঁরা এ দেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাঁদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা,

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নাই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালি-বিদ্বেষীদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্যে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে

তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম–সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন–বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তি পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সাথে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রে প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্যে নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোনো নেতা নয়, কোনো দলপতি নয়, আপনারা–বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও

সর্বহারা মানুষের রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নাই, জীবনে কোনোদিন ভুলব না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজো অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেঁজগাওর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো–তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬-দফা ও ১১-দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা।

নিবেদক–
আপনাদেরই
শেখ মুজিবুর রহমান
১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয় ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে আসন বণ্টন করা হয়। মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯০টি আসনের নির্বাচন ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনে একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের ৯টি আসনের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ২৫টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ মোট ১,৫৫৫ জন প্রার্থী ২৯০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ২টি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০ আওয়ামী লীগ প্রধান দেশবাসীর উদ্দেশে নিম্নোদ্ধৃত বাণী প্রদান করেন।]

পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সনদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এ দেশের ১৩ কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই এক কণ্ঠের আওয়াজ–সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের, পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁদের অধিকাংশই এ দেশের সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভূ। তাঁদের কণ্ঠে কখনো দেশের কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা চাইবেন গণস্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাঁদের মোকাবিলা করে এ দেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার উপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভূমিকা। ইতোমধ্যেই আপনারা দেখেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ ৯০/৯৫টি, কেউবা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্যে তাদের এমনই দরদ যে,

পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও, বাংলাদেশের বেলায় যে কয়টি আসন পাওয়া যায়, ভাল–এই নিয়মেই তাঁরা নির্বাচনে নেমেছেন। তাঁরা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নন, তার সবচাইতে বড় প্রমাণ তাঁরা নির্বাচনে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোনো চেষ্টাই করতে চান না। তাঁরা জানেন যেনতেন প্রকারে গুটিকয়েক আসনে যদি তাঁরা এখান থেকে তাঁদের প্রার্থীকে পার করিয়ে নিতে পারেন তাহলে তাঁদেরকে বগলদাবা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবেন। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।

ক্ষমতার প্রত্যাশী আশি নই। তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে–কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চাই-ই চাই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারাই। এ কারণে, আপনাদের খেদমতে একটাই মাত্র প্রার্থনা; জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ ও অধিকার যাতে আমরা আদায় করে নিতে পারি, তার জন্যে জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে আপনারা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ, আপনাদের চাহিদামতো শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমরা চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের চাবিকাঠি। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা দিচ্ছি, আপনাদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই। আর যদি আপনাদের বিচার ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তোলেন, তাহলে হাতে পেয়েও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এ দেশের ১৩ কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আমি আপনি জ্ঞানত শরিক হতে পারি কিনা তা বিচারের ভার আপনাদের উপর আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

জনসাধারণের প্রথম মহান বিজয়

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ১৫৩টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসন লাভ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ২টি আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। প্রাদেশিক কাউন্সিল লীগ প্রধান খাজা খায়েরউদ্দিন ১ লাখের বেশি ভোটে বঙ্গবন্ধুর কাছে পরাজয় বরণ করেন। এ নির্বাচনে অন্যান্য পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাজী কাদের, মাহ্‌মুদুল হক ওসমানী, অধ্যাপক গোলাম আজম, ফরিদ আহমদ, ওয়াহিদুজ্জামান, আবদুর রহিম, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরাট সাফল্য ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ অফিসে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে ইংরেজিতে একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গণজাগরণকে স্বাগত জানান এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে তাঁর বিবৃতির শেষে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করেন। বিবৃতির বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো।

আমাদের জনসাধারণ একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন। একটি দুর্দমনীয় সংগ্রাম পরিচালনা করে তাঁরা এই রায় প্রদান করার অধিকার নিজেদের জন্যে অর্জন করেছেন। এই সংগ্রাম পরিচালনার সময় হাজার হাজার মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং অগণিত লোক বছরের পর বছর ধরে উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনসাধারণের সংগ্রামের এই প্রথম মহান বিজয়ের জন্যে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

আমরা আমাদের শহীদানের স্মৃতির প্রতি সালাম জানাই। আমরা আমাদের জনসাধারণ, বীর ছাত্রসমাজ, মজুর ও কৃষকদের অভিনন্দন জানাই। আমরা যাতে একদিন প্রকৃত স্বাধীনতায় বসবাস করতে পারি তার জন্যে এঁরা বর্বরোচিত নির্যাতনের মুখেও অকুতোভয় সংগ্রাম করেছেন।

আওয়ামী লীগের এই বিজয় প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের লাখো লাখো নির্যাতিত মানুষেরই বিজয়। আমাদের দেশের জনসাধারণের, অর্থাৎ আমাদের ছাত্র, আমাদের মজুর এবং আমাদের কৃষকদের প্রাণঢালা

ভালোবাসায় আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছি। এরা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আওয়ামী লীগ হলো তাঁদেরই দল। আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, তাঁরা এই সত্যটি আগামী ১৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক নির্বাচনেও প্রমাণ করবেন। আমাদের দলীয় কর্মীরা নিরতিশয় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁরা আজ যথোচিতভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন বলে মনে করার কারণ রয়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে বিরাট একতা ও ব্যাপক গণজাগরণই ছিল আমাদের কর্মীদের পুরস্কার। জনসাধারণ প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে সাধারণ নির্বাচনে একটি পরিষ্কার রায় প্রদান করেছেন। এই নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্যে ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে গণভোটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান।

সে যাই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য সামনে রয়েছে এবং এই লক্ষ্যগুলো অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। ৬-দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে একে সর্বতোভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ এবং এর অগণিত জনসাধারণকে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ও কায়েমি স্বার্থ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা ছাড়াও ক্ষুধা, বেকারত্ব, রোগশোক, বন্যা-দুর্ভিক্ষ এবং নিরক্ষরতা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান অতি জরুরি হয়ে পড়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ লোক মারা গেছে এবং বর্তমানে এ অঞ্চলগুলোতে ৩০ লাখ লোক শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের এই অবস্থা আমাদের অতীতের শোষণ ও অবহেলার নিষ্ঠুরতাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের পাহাড় প্রমাণ কর্তব্যকে।

আমরা মনে করি, কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ ও প্রকৃতির অভিশাপ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যে আমাদের সব শক্তি ও সহায়সম্বল নিয়োজিত করার পবিত্র ওয়াদা করাই হলো জনসাধারণের এই বিজয় উৎসব উদ্‌যাপনের একমাত্র উত্তম পন্থা।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আমরা শোষণমুক্ত একটি নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করছি।

পশ্চিম পাকিস্তানেও গণজাগরণের ঢেউ জেগেছে। আমরা গণজাগরণের এই প্রথম লক্ষণকে স্বাগত জানাই। জনতাকে তাদের বাঙালি ভাইদের বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আদায়ের জন্যে আমাদের সমর্থন করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাই। পক্ষান্তরে আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে সামন্ততন্ত্র ও অন্যান্য কায়েমি স্বার্থবাদীদের নির্যাতন থেকে তাদের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের সমর্থনের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আজ যে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি, তা আমরা আমাদের জনগণের ব্যাপক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে পারব। আমাদের জনসাধারণ আজ ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে তাদের দায়িত্বাবলী বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই আমরা শক্তি ও আশা লাভ করি। গণঐক্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরই একমাত্র আমাদের সমাজের পুনর্গঠন এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষের মধ্যে অবিচার দূর করার কার্যকরী কর্মসূচি রচিত হতে পারে। তাই আমরা আমাদের লাখ লাখ নির্যাতিত মানুষের দুর্গতি লাঘবে, স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির জন্যে অতীতের সমস্ত তিক্ততা, বিভেদ এবং শত্রুতা ভুলে যেয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা!

[সূত্র : পূর্বদেশ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

সাত কোটি বাঙালির জয়

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয়বারের মতো ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্যে ১০ ডিসেম্বর রাতে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। সপ্তাহব্যাপী এ সফরে বঙ্গবন্ধু নৌকা ও পায়ে হেঁটে বিধ্বস্ত এলাকার অনেক অংশ সফর করেন, প্রতিদিন অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করেন, দলীয় ত্রাণতৎপরতা তদারক করেন। ১১ ডিসেম্বর সন্দ্বীপ হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এটা আমার জয় নয়, এটা ৭ কোটি বাঙালির জয়। আমার কথা মতো কাজ করায় এবং সর্বদা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর জন্যে আমি জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি পুনরায় জনগণের প্রতি আশ্বাস দিচ্ছি, ৬-দফার উপর ভিত্তি করেই দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। আওয়ামী লীগ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং ইনশাআল্লাহ্ আমরা এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো যার ফলে বাঙালিদের শোষণের যুগের অবসান হবে। যদি নির্বাচনে জনগণ অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে তাদের কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে হতো। এখন কেমন করে বাংলার দাবি ঠেকিয়ে রাখা হয় সেটা আমি দেখবো।

আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্যে আপনারা রক্ত দিয়েছেন এবং প্রয়োজন হলে সে ঋণ শোধ করার জন্যে আমিও রক্ত দান করবো।

আমি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে অভ্যস্ত নই। যদি আমি একবার কোনো প্রতিজ্ঞা করি তাহলে সে প্রতিজ্ঞায় অটল থাকি। আজ আমার এক প্রতিজ্ঞা রক্ষার দিন নিকটতর হয়েছে। শিগগিরই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেয়া হবে।

আমি অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র চর এলাকায় বাঁধ দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। এজন্যে টাকা নেই এ কথা আমি আর শুনতে রাজি নই।

ঘূর্ণিঝড়-পীড়িত জনগণকে সাহায্যের ভিত্তিতে রিলিফ দিতে হবে। তাদের ঋণ দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সব সাহায্যই বিদেশী রাষ্ট্রগুলো দিয়েছেন। সুতরাং টাকা-পয়সা, হালের বলদ, বীজ, গৃহনির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম এবং সবকিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যই তাদের বিনামূল্যে দিতে হবে।

অন্যান্য দুর্গত অঞ্চল সফরকালে আমি দেখতে পেয়েছি, দুর্গত জনগণের কাছে যথাযথ ও প্রচুর সাহায্য-সামগ্রী পৌঁছাচ্ছে না। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে, এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্বহীনতা সহ্য করা হবে না, রিলিফ অর্থের কোনোরকম অনিয়ম করতে দেয়া হবে না। রিলিফ কর্মকাণ্ডে সকল সংশ্লিষ্টকে স্মরণ রাখা উচিত যে আইয়ুব খানের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমরা প্রতিটি পয়সার হিসাব নেব।

[সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও দৈনিক আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রেই সুবিচারের নিশ্চিতি

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে নির্বাচনে তাঁর দলের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠান। নির্বাচনী সাফল্যে ভুট্টোও বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান। বঙ্গবন্ধু জবাবে ভুট্টোকেও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জবাবে শেখ মুজিবুর যে তারবার্তা প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ।

চট্টগ্রাম ও ঘূর্ণিউপদ্রুত সন্দ্বীপ সফর শেষে ঢাকা ফিরে আমি আপনার অভিনন্দন বাণী পেয়েছি। এজন্যে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের মানুষ অভূতপূর্ব একতা প্রদর্শন করে আমাদের ৬-দফা শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলার স্বপক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করেছে। একমাত্র ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রই অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছা অনুসারে শাসনতন্ত্র রচনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন, মহান আল্লাহর কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে ঐতিহাসিক রায়

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে ৩১০ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ২৭৯টি আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৬৮টি আসন লাভ করে। পিডিপি পায় ২টি, ওয়ালী ন্যাপ, জামায়াত ও নেজামে ইসলাম ১টি করে ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনও আওয়ামী লীগের সুনিশ্চিত। উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের কোথাও ৩ মুসলিম লীগের কোনো প্রার্থী জয়লাভ করেন নি। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হবার পর ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে এই বিবৃতি প্রদান করেন।

জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়ে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং আমার প্রিয় দেশবাসী–ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদানের জন্য আমি জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই রায় বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিতেছি। ৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র হতে পারে না।

আমি চাল, খাওয়ার তেল ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যের ব্যাপারটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদীদের কোনো চেষ্টারই একটি অংশ। তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, ঐ ধরনের অপরাধমূলক কাজের জন্য যারা দায়ী জনসাধারণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই ধরনের শোষণ চলে অবশ্যই এমন একটি ব্যবস্থার দ্বারা এর অবসান ঘটাতে হবে যা আমাদের মেহনতি জনগণের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক শস্যহানির দরুন আমরা যে দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন, এতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও মওজুদ ও বিতরণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা জনগণকে জানানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আহ্বান জানাচ্ছি, বাংলাদেশের ঘূর্ণি-উপদ্রুত এলাকার রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের রিলিফের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য সাহায্য এসেছে, তার সমদুয় প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা উচিত। রিলিফ হিসাবে প্রাপ্ত এই ধরনের অর্থের বোনাস রেটের সুবিধা দেয়া উচিত। প্রাপ্ত সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের ঘূর্ণি-উপদ্রুত এলাকাসমূহে ব্যয় করতে হবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের দ্বারা রিলিফ কাজে সৃষ্ট বিঘ্নসমূহ এখনো বিদ্যমান থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেহেতু এ যাবৎ প্রাপ্ত সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য সম্পদ এবং এ যাবৎ এর কি পরিমাণ ব্যবহার হয়েছে, সে ব্যাপারে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ হোক। এই ব্যাপারে যে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদানের জন্য আমি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাই।

প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিতদের ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। আমরা এর প্রশংসা করি। আমরা সবসময় এ ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন এবং রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় দণ্ডিতসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, এই ক্ষমা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হোক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে কারাগারে আটক ছাত্র ও শ্রমিকসহ সকল রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত সকল মামলা এবং বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দিরও মুক্তি দেয়া উচিত।

অন্যান্য মারাত্মক সমস্যাবলির মধ্যে ক্ষুধা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও বন্যা আমাদের সামনে রয়েছে। যাতে আমরা একটি উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, তজ্জন্য আমরা আমাদের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে সম্ভব সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

[সূত্র : সংবাদ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে

২২ ডিসেম্বর ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সদস্য পাবনার আহমদ রফিক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে খুন হন। তার কিছুদিন আগে খুলনায় মমতাজ নামে আরেকজন আওয়ামী লীগ কর্মী আততায়ীর হাতে নিহত হন। এসব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ২৪ ডিসেম্বর পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন। নিচে বিবৃতি উদ্ধৃত হলো।

আমি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত, যার ফলে জনগণের সংগ্রামে নিবেদিত নির্ভীক সৈনিক এবং আওয়ামী লীগের দুইজন বিশিষ্ট সদস্যের মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটল। আহমদ রফিকের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপই পাবনার জনগণ তাঁকে এম, পি, এ নির্বাচন করেছিলেন। খুলনার মমতাজ ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। আমি এই দুই শহীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। তাঁরা গণ-দুশমন ও ষড়যন্ত্রকারীদের পূর্বপরিকল্পিত ও সুস্থ মস্তিষ্ক হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এই অমানুষিক চক্রান্তের পেছনে কোন গণবিরোধী মহল সক্রিয় রয়েছে জনগণের তা অজানা নয়। জঘন্য অপরাধীদের বিচারের জন্যে সত্বর ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে ত্বরিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে এবং তারা এই সকল গণ-বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে পারে।

[সূত্র : ইত্তেফাক ও সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

উস্কানিমূলক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন ও ড. কামাল হোসেনকে সাথে নিয়ে পাবনা রওয়ানা হন। বিকেলে পাবনার পুলিশ ময়দানে আহমদ রফিকের স্মরণে প্রায় লক্ষ লোকের এক শোকসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। পথে পাবনা পৌঁছে তিনি মরহুমের মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিতে আহমদ রফিকের বাসভবনে যান। শোকসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

বাংলাদেশের শহীদদের তালিকায় আরো ২টি নাম অন্তর্ভুক্ত হলো। তাঁরা হচ্ছেন আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত পাবনার আহমদ রফিক ও খুলনার মমতাজ উদ্দিন। তবে তথাকথিত বিপ্লবীদের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মতো মারাত্মক উস্কানিমূলক কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও পূর্ণ শান্তি বজায় রাখার জন্যে আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি। আমার দল যিশুর নীতিতে বিশ্বাসী নয়। আমি একজন মুসলমান এবং আমি জানি কি করতে হয়। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হয়, আমি সে নীতিতে বিশ্বাসী। তবে আমি বলব তার আগে জনগণের উচিত সরকার এই ব্যাপারে কি করে, তার জন্যে অপেক্ষা করা। অবিলম্বে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আহমদ রফিক ও খুলনার মমতাজউদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের সরকার শাস্তি দিতে না পারলে বাংলার মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে এবং তার মারাত্মক পরিণতির জন্যে সরকার দায়ী থাকবেন।

এই ধরনের জঘন্য কার্যক্রমে জড়িত একটি বিশেষ দল সবসময়ই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক বিরাট ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের বিরুদ্ধে জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর সেই ষড়যন্ত্রের জাল আবার নতুন করে বিস্তার শুরু করেছে। আপনারা ৬-দফা ও ১১-দফার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আপনারা আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সকল রকমের

বাধাবিপত্তি অতিক্রমের শক্তি যেন আমি পাই। আওয়ামী লীগ কিংবা ৬-দফা ও ১১-দফার দাবিতে ভোটদানকারী বাংলার মানুষ, কেউ দুর্বল নয়। আগামী ৩রা জানুয়ারি রমনা রেসকোর্সে আওয়ামী লীগ যে জনসভার আয়োজন করেছে, সেখানে আমি আমার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবো।

আহমদ রফিককে মনোনয়নের আগেও দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে ৩ বার ছুরি দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। এ ধরনের কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, নয়তো গুণ্ডাদের জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শহীদদের স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত করা হবে। সবাইকে আমি নিহতদের আত্মার জন্যে দোয়া করতে বলছি।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করুন

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশানস্-এর সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিকী 'পূর্বাণী'র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০ ঢাকার হোটের পূর্বাণীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বাণী উচ্চকণ্ঠ সমালোচক ছিল। আইয়ুব আমলে পূর্বাণীর প্রকাশনা দীর্ঘদিন সরকারি নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবিদের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে। তাঁরা তাঁদের মানুষ, তাঁদের মাতৃভূমি ও সংস্কৃতির জন্যে শিল্পচার্য করবেন।

জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্যে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছি, শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোন অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে। আজ আমাদের সংস্কৃতির সামনে কোনো চক্রান্ত নেই, শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্যে সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্যে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বলেই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয় নি।

স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে প্রায় কিছুই করা হয় নি। শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবীদের তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করতে দেয়া হয় নি। যে

সংস্কৃতির সাথে দেশের মাটি ও মনের সম্পর্ক নেই তা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাদের জনগণ এই চক্রান্ত প্রতিহত করেছে। আপনারা সবাই আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানেন।

বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংহতিকে ধ্বংস করার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তান বেতার এবং টেলিভিশনও এই ষড়যন্ত্রের দোসর। তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আজও এ ব্যাপারে উঁচু মহলে জোর আপত্তি রয়েছে। জনগণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত সহ্য করবে না। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যেসব বাঙালি সরকারি সমর্থন পেয়েছেন, তাঁদের দিন আজ শেষ।

[সূত্র : আজাদ, ইত্তেফাক ও সংগ্রাম, ১ জানুয়ারি, ১৯৭১]

জনগণের রায় আমরা পেয়েছি

৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুমানিক ২০ লাখ লোকের এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ জনগণের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার আকৃতিবিশিষ্ট প্রায় ১২ ফুট উঁচু ও ১২০ ফুট দীর্ঘ মঞ্চে সবার প্রারম্ভে ৬-দফা ও ১১-দফার প্রতীক হিসাবে বঙ্গবন্ধু ৬টি ও ১১টি কবুতর উড়িয়ে দেন। ঢাকায় এ যাবৎকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ১৫১ জন এম. এন. এ. ও ২৬৭ জন এম. পি. এ.-কে শপথবাক্য পাঠ করাবার পর বঙ্গবন্ধু বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ৫০ মিনিটের একটি নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। নিচে সে ভাষণের অংশ উদ্ধৃত হলো।

শুরু করার আগে আমি ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ৭ জুনের আন্দোলন এবং ১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সব এমএনএ এবং এমপিএ-সহ প্রতিজ্ঞা করছি, এসব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। গত ৭ জুনের পর আপনাদের সামনে রেসকোর্সে এই প্রথম উপস্থিত হয়েছি। নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচন জয়ের মাধ্যমে তাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করেছে।

আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নয়, আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করবো, সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বানচালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি। যদি কেউ এ রায়ের বিরোধিতা করে তবে রক্তক্ষয় হবে এবং যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১-দফার প্রতিফলন থাকবে, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ৬-দফা ও ১১-দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬-দফা পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই।

কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না এ ধরনের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই– নীতির প্রশ্নে কোনো আপোস নাই।

আমরা দেশের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো, কারণ আমরা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি। এই প্রক্রিয়ায় যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে নির্মূল করা হবে।

অতীতে আমাদেরকে হিন্দুদের এজেন্ট হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হয়। কারণ আমরা বাঙালি। এ দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। আমরা অনেক অন্যায় সহ্য করেছি। অন্যায়ের শিকার কিভাবে হয় তা আমরা জানি। তাই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায়বিচার করব। যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী করতে দিয়েছি। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে প্রথম জাতীয় পরিষদের ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিদানে আমরা কি পেলাম? অবিচার।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছো ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছো ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইলো। রিলিফ কাজের জন্যে বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল–অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোন হেলিকপ্টার আসলো না। আমরা এসব বে-ইনসাফির অবসান করব।

বাংলার গরিব আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যেসব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকের সাথে কোনো আপোস নাই।

আওয়ামী লীগ সরকার যদি গঠন হয় তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক-অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব হতে দেয়া হবে না।

আমি পুনর্ব্যক্ত করছি, যে যাই বলুক না কেন, ব্যাংক, বীমা ও পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ২৩ বছর দেশের গরিব জনগণকে

কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল শোষণ করেছে। আওয়ামী লীগ এই শোষণের শেষ দেখতে চায়। শুধুমাত্র কয়েক মাস সময় আছে, লুটপাট যা করার করে নেন। এরপর আর সময় পাবেন না।

আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাস জমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাস জমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে এবং চর এলাকায়ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।

এবছর প্রদেশে ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল। আমরা আর খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীল হতে পারি না। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শীতকালীন শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

গত ২০ বছর ধরে শুনে এসেছি টাকা নেই, টাকা নেই। এবার আমি দেখিয়ে দেব বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে টাকা পাওয়া যায় কিনা।

পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকার মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বানের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে '৬২ সাল থেকে শুধু পরিকল্পনার কথাই শুনে আসছি। সাম্প্রতিক মহাপ্লাবনে যেসব এলাকায় বাঁধ ছিল সেখানে লোকক্ষয় কম হয়েছে আর বাঁধহীন এলাকাগুলোয় জনমানবের চিহ্ন নেই বললেই চলে। মনপুরা দ্বীপ যা বাঁধের আওতায় নাই সেখানে ২৬ হাজার জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার লোক এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। '৬২ সাল থেকে সাইক্লোনের হাত থেকে এদের বাঁচানোর জন্যে যে টাকা এসেছে তার হিসাব দিতে হবে এবং অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচি নিতে হবে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরাই চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করব। বর্তমান সরকারের কোনো অধিকার নেই এটা তৈরি করার। আপনাদের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা বাক্স বন্ধ করে রাখুন। চতুর্থ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে হবে। বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের কর্মচারী, ছাত্র এবং শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুসারে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবেশী ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, সিংহল ও বার্মাসহ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো সাথে শত্রুতা নয়। কোনো বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধান করা হবে। আমরা কাশ্মীর এবং ফারাক্কা সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে চাই। অধিকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্যে পাকিস্তানী জনগণ সবসময়ই আরবদের সাহায্য করে যাবে।

আমি বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে সে অর্থ দিয়ে দরিদ্র দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা বিপুল অর্থের এক-দশমাংশও যদি জনগণের জন্যে খরচ করা হয় তবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র মুছে যাবে এবং তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে। অস্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের দিন অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে শুধু ভালোবাসার মাধ্যমেই অপরকে জয় করা যেতে পারে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ দেব এ জন্যে যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তিনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তবে তাঁর কর্মচারীদের একাংশ আজও নির্বাচন ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্প্রতি ঢাকায় একটি গোপন সভায় মিলিত হয়েছে। নির্বাচন ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্র থেকে এসব কর্মচারীকে বিরত রাখার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, জনগণের কর্তা হবার আশা ত্যাগ করুন, জনতার সারিতে নেমে জনগণের খাদেম হোন। না হয় ইয়াহিয়া সাহেব তো ৩০৩ করেছেন, আমরা শুধু জনতাকে বলে দেব– 'ভালো লোক নয়, বের করো বাড়ি থেকে'। আমি সবার হাতে লাঠি দেখতে চাই। সবাই লাঠি তৈরি রাখুন। আমি হুকুম করলেই লাঠি ব্যবহার করে তাদের শায়েস্তা করবেন। প্রয়োজন হলে এদের কামান-বন্দুককেও লাঠি হাতে বাংলার মানুষ রুখবে।

ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয় নি। নির্বাচন শেষ না হতেই খুন করা হয়েছে আমার এক সহকর্মীকে। যে যুবক বাংলার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, জেল খেটেছিল সেই আহমদ রফিককে আমি মনোনয়ন দিয়েছিলাম প্রাদেশিক পরিষদে। তাঁকে চোরের মতো তার বাড়ির সামনে ১৩টি ঘায়ে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মনে রাখা উচিত চুরি করে বিপ্লব করা যায় না। খুলনায় আমার ছোট ভাই সংগ্রামী কর্মী মমতাজকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। যে কোনো ষড়যন্ত্র বাঙালিরা প্রতিহত করবে। প্রয়োজন হলে বাঁশের আর সুন্দরীর লাঠি নিয়ে এসব সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেবে। অবশ্য আমার নির্দেশের আগে কিছু করতে যাবেন না। আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে শান্তি রক্ষা করাই গুরুত্বপূর্ণ, আর তাই আমরা আমাদের কর্মী হত্যাও সহ্য করে আছি।

নির্বাচনের পরদিন থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। এটাও এক ধরনের ষড়যন্ত্র। কারা এসব করেছে? তারা কি সেইসব ভুঁড়িমোটা পুঁজিপতি নয়, যারা এখনই দাম বাড়িয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার শেষ চেষ্টা করছে? তারা এখনো লোভের মধ্যে রয়েছে, আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, অনেক খেয়েছেন, এবার মুখ বন্ধ করুন, নচেৎ জিহ্বা কাটা যাবার সম্ভাবনা আছে। এসব পুঁজিপতিরাই যে নির্বাচনের সময় ইসলাম রক্ষার নামে, সংহতির নামে আওয়ামী লীগকে কোনো না কোনো উপায়ে পরাস্ত করার জন্যে পূর্ব বাংলায় টাকা ঢেলেছেন–তা আমাদের জানা আছে। এক শ্রেণীর লোক নির্বাচনের সময় 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল' বলে চিৎকার করেছেন। নির্বাচনে জয়ের ফন্দি খুঁজছেন পিডিপি করে, ইসলাম ফ্রন্ট করে, আরো কতকিছু করে। অথচ নির্বাচনের পর কি কেউ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে, রোজা রাখতে নিষেধ করেছে? যদি না করে থাকে তাহলে এসব অপপ্রচারের জন্যে কি তাদের 'কোড়া' মারা উচিত নয়?

এ দেশে ইসলাম, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান–সবই থাকবে এবং বাংলাদেশও থাকবে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর গত এক দশকে যে অত্যাচার হয়েছে তার অবসান হবে। মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হবে এবং তারা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকবে না। ২৩ বছর পর এ দেশে কোনো মোহাজের নেই। সবাই এখন বাঙালি। মোহাজেরদের আমি বাংলার মাটির সাথে মিলে যাবার আহ্বান জানাই। এখনো যেসব মোহাজের পুনর্বাসিত হন নি, তাদের সবাইর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

যে সব রাজবন্দি বিনা বিচারে এবং যেসব রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা ও কর্মী বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে রয়েছেন, অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দিন এবং রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মালা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে সে সব কিছুই প্রত্যাহার করুন। নতুবা আমরা কয়েক মাস পরেই ক্ষমতায় যাচ্ছি, তখন সব কিছু করব।

প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। অত্যাচার নিপীড়ন এবং কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

[সূত্র : পূর্বদেশ, সংগ্রাম ও দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১]

বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করুন

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৭১ সনে সংগঠনের ২৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। এ উপলক্ষে ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রমনা গ্রিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্যে লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান যাতে করে পাকিস্তানী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত বাঙালির বিকৃত ইতিহাস বর্জন করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি' নামক এ ধরনের একটি বই ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ১৯৭০ স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে না সে ছেলে সত্যিকারের বাঙালি হতে পারে না। আজো বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয় নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্যে দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

অতীতে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, হরফ-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, বানান-সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আন্দোলন করে তা রুখেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুলকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এর উপর বারবার হামলা এসেছে। ভেবে অবাক হতে হয়, কাজী নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। গানের শব্দ বদল করে রেডিওতে গাওয়া হয়েছে। তারা মুসলমানী করিয়েছেন। এ অধিকার তাদের কে দিল?

নির্বাচনের ফলাফলই বলে দিচ্ছে বাঙালি, বাঙালি হিসেবেই বেঁচে থাকবে, কেউ তা রুখতে পারবে না। এবারকার নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের সম্পদ এবং বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর কোনো মতেই দাবিয়ে রাখা যাবে

না। বিগত ২৩ বছর ধরে একটানা শোষণ ও অবিচারের ফলে বাঙালিরা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই অন্যায় ও অবিচার মেনে নিতে পারে না। জনগণের স্বাধীনতার ফলভোগকে নিশ্চিত করার জন্যে আওয়ামী লীগ শেষপর্যন্ত লড়ে যাবে।

ষড়যন্ত্রকারীরা শেষ হয় নি, তারা এখনো আছে। তাদের চক্রান্তে সহজে ক্ষমতা হস্তান্তরিত নাও হতে পারে। কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের সকলের উস্কানির মুখেও তোমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে। তোমাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য বজায় রেখে তোমরা ঝিমিয়ে পড়ো না, ঘুমিয়ে যেয়ো না। আস্তে আস্তে চল, নীতি নিয়ে চল, কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো সচল, রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেতা, নীতি, সংগঠন ও আত্মত্যাগ– এই চারটি বিষয়ে একনিষ্ঠ থেকে এগিয়ে যেতে হবে।

দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয়–তবে সে বিপ্লবের ডাক আমিই দিব। যদি ৬-দফা আদায়ের সংগ্রামকে ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ করে দেয়া হয়, তবে কয়-দফা দিতে হবে তাও আমার জানা আছে। অতিবিপ্লবী কয়েকটা স্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের উদ্ভব হয় মাটি থেকে এবং এর একটা বিশেষ অবস্থা ও ধাপ রয়েছে।

আজো বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হয় নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙালির গৌরবময় ভূমিকাকে চাপা দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকে পর্যন্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে বাংলার হাজার হাজার ছেলে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছে, বাংলার বহু সন্তান ফাঁসির মঞ্চে ঝুলেছে, চট্টগ্রামের পাহাড়ে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যারাকপুর থেকে শুরু হয়েছিল। সেদিন বাঙালিদের কেউই বেঈমানী করে নি। বড় নেতাদের দেশের লোকেরাই বেইমানী করেছিল। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসে তাঁর উল্লেখ নেই। তাঁদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার গাথা-ভিত্তিক ইতিহাস রচনার জন্যে শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এইবার আর তারা ব্যান করতে পারবে না। যদি ব্যান করার চেষ্টা করে তবে আমরাই তাদের ব্যান করে দেব।

তোমরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়ো না। আজ ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে একতার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। একই একতা অক্ষুণ্ন না থাকলে ৬-দফার সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়বে। ছাত্রলীগের মতো বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ভেঙে যেতে পারে, এমন কিছু করো না।

[সূত্র : আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, ইত্তেফাক, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১]

আমার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র

৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ রাতে গোলাম মোস্তফা নামক এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করা হয়। তার কাছে ছোরা পাওয়া যায় এবং পুলিশের কাছে সে স্বীকার করে যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্যে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এ ঘটনায় বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ ঘটনার সংবাদ শুনে স্বস্তি প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর কাছে বার্তা পাঠান। বরিশাল, পটুয়াখালী ও নোয়াখালীর ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলে ৬ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধু ঘটনার দিন রাতে লঞ্চযোগে মঠবাড়িয়া রওয়ানা হয়ে যান। দুর্গত এলাকার ৯টি জাতীয় ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদের স্থগিত নির্বাচন ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর এ সফর ছিল এ এলাকায় তাঁর শেষ নির্বাচনী সফর। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১ জানুয়ারি ঢাকা আসেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে একই দিন ঢাকা ফিরে আসেন। এ সফরে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন অগণিত সভায় বক্তৃতা করেন। ১১ জানুয়ারি তিনি নবগঠিত পটুয়াখালী জেলার সদর দফতরের জনসভায় যে ভাষণ দেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো।

এটা প্রমাণিত হয়েছ যে আমি এবং আমার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র। গত নির্বাচনে জনগণ ৬-দফা ও ১১-দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। আগামী নির্বাচনেও জনগণ আমার দলের পক্ষে ভোট দেবেন। আমি আবারও বলছি দেশের শাসনতন্ত্র অবশ্যই ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে। এতে কোনোরূপ বাধা দান করা হলে তার পরিণাম ভয়াবহ হবে।

নির্বাচনে হেরে গিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের দাবি স্তব্ধ করার জন্যে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। পাবনা থেকে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত এমপিএ আহমদ রফিক এবং খুলনার আরেক পার্টি-কর্মী মমতাজকে নির্বাচনের পর পরই খুন করা হয়েছে। সেদিন আমার ঢাকার বাড়িতে এক ঘাতককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ কথাও নিশ্চয়ই আপনারা জানেন।

রাতের অন্ধকারে চোর-ডাকাতের মতো জনগণকে হত্যা করে তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা কোনোমতেই দেশের মঙ্গল করছে না। এরা জনগণকে বিশ্বাস করে না এবং জনগণের মতামতেরও তোয়াক্কা করে না। আমি এসব তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চিনি। শিগগিরই এরা এদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

কায়েমি স্বার্থবাদী ও শাসকগোষ্ঠী আজো একের পর এক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এই মহলই ৮৩ বছর বয়সে দেশদ্রোহিতার অপরাধে শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে অন্তরীণ ও মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। অথচ এসব নেতা না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি হতো না।

গত ২৩ বছর যাবৎ একটানা শোষণে গ্রামবাংলা আজ বিরান হয়ে গেছে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষকে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং সামুদ্রিক বানের ছোবল থেকে রক্ষার জন্যে গত ২৩ বছরে কিছুই করা হয় নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যান্য দেশ ও খাদ্য ও রিলিফ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে এসেছে কিন্তু আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা নীরব আছেন। রিলিফ দ্রব্য বিতরণে বিশৃঙ্খলা ও অবহেলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীরা ভুলে যাবেন না এটা আইয়ুব আমল নয়। দুই-তিন মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হলেই রিলিফ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চাওয়া হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, দায়িত্বহীনতা কিংবা অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত সাহায্য দ্রব্য অবিলম্বে প্রেরণ করা হবে। মঠবাড়িয়া ও অন্যান্য দুর্গত এলাকার খাজনা অবশ্যই মওকুফ করতে হবে।

আইয়ুব খান রাতের অন্ধকারে পেছনের দরজা দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং জনগণকে কঠোর হাতে দমন করতে চেষ্টা করেন। তিনি জনগণকে মূর্খ ভেবেছিলেন। তাই জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেন, কিন্তু এ দেশের মানুষ রক্তের বিনিময়ে সেই ভোটাধিকার অর্জন করেছে।

দুর্গত এলাকার আসন্ন নির্বাচনে সকল আওয়ামী প্রার্থীকে আমার এবং আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে ভোট দেয়ার জন্যে আপনাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আওয়ামী প্রার্থীদের নির্বাচিত করলে বাংলাদেশের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

শোষণে আর নির্যাতনে সোনার বাংলাকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আজ বুভুক্ষু। কারো বিরুদ্ধে আমার শত্রুতা নেই। কিন্তু যারা বাংলাদেশকে লুট করেছে তাদের সঙ্গে কোনো আপোস নাই। দেশকে এবং দেশের মাটিকে ভালোবাসি বলেই আমি রাজনীতিতে আছি। আমি অন্যের পয়সা চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে। দুঃখী বাংলার মানুষের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনবোধে জীবন দান করতে আমি প্রস্তুত আছি।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, সংগ্রাম, পূর্বদেশ, ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭১]

শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি এগিয়ে আসবে

পূর্ব পাকিস্তান সঙ্গীত শিল্পী সমাজ বঙ্গবন্ধুর সম্মানে ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭১ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। শিল্পীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রে শিল্পী আবদুল আহাদ বঙ্গবন্ধুকে 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম লায়লা আর্জুমান্দ বানু। শিল্পীদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে সরোদ, সেতার, একতারা এবং জয় বাংলার রেকর্ড উপহার দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই আইয়ুব সরকার রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। কতিপয় বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের এই পদক্ষেপ সমর্থন করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী ও তাঁবেদার শিল্পী প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাদের এ ধরনের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেন। বাংলা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

আজ ২৪ জানুয়ারি, এক অনন্যসাধারণ দিন। এই দিনে আমার মনে পড়ে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদদের কথা। আইয়ুব বিরোধী সেই গণআন্দোলনে আসাদ, মতিউর, আনোয়ারা, ডাঃ জোহা, জহুরুল হকরা জীবন দিয়েছে। আর তাদের রক্তের বিনিময়েই স্বৈরাচারীর পতন ঘটেছে। তাদের জীবন এবং অগণিত দেশপ্রেমিকের সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়েই আজ দিগন্তে স্বাধিকারের সূর্যালোক ঝলমল করে উঠেছে। সেই বীর শহীদরা চিরস্মরণীয়। আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সঙ্গীতে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।

আপনারা ভালোবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্যে গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্যে ৭ কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।

একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই–এই ধরনের অভিযোগ দিয়া বাঙালির বিরুদ্ধে ২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর বাংলার মানুষও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন।

জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছিল, তখন এক শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? কোন ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? কোন বিশেষ মহল তথাকথিত ইসলামের নামে নজরুলের গান ও কবিতার শব্দ বদলেছে? রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়? যে মৌলিক গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরি শাসনের পতন ঘটাবার জন্যে বাংলার বীর ছাত্র-জনতা-শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদেরই গুণকীর্তন করে, প্রবন্ধ লিখে, বেতার কথিকা প্রচার করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ পয়সা রোজগার করেছেন। বিএনআর-এর অর্থানুকূল্যে বই প্রকাশ করেছেন।

'৪৭ সাল থেকে বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন যে কেউ স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলতে এবং নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা করতে পারেন। যদিও জনগণ প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছে, তবুও বিপদের আশঙ্কা এখানো দূরীভূত হয় নি। পথ এখনো কণ্টকাকীর্ণ এবং অনিশ্চিত। সকল বিপদ ও অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করার জন্যে আমি কবি-সাহিত্যিকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্যসেন। এই অগ্নি-পুরুষই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের বুকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করি তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ

আমাদেরকে কখনো সম্মান করবে না। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আমি যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলি তখন সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, পশ্তু তথা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সমান সমৃদ্ধি কামনা করি। কারণ আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারারই শামিল।

আমি স্বীকার করি আমাদের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এখনো তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা পাচ্ছেন না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যদি আমরা ৬ ও ১১-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন লাভে সক্ষম হই, তাহলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবকিছুই পাবেন।

সবকিছুই হবে তাঁদের। ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অর্থই হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক স্বাধিকার। জয় বাংলা স্লোগানেরও লক্ষ্য এই সামগ্রিক স্বাধিকার অর্জন। জনগণের সরকার কায়েম হলে বাংলার মাটিতে জাতীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠা ও একটি জাতীয় "ললিতকলা একাডেমী" গঠন করতে হবে।

মনে রাখবেন, বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্যে প্রস্তুত হন। আপনাদের সমস্যা শুধু আপনাদেরই নয়–এ সমস্যা সারা জাতির। শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতিই এগিয়ে আসবে।

[সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১]

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে সফল হওয়া যাবে না

পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্যে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ জন বিশিষ্ট সদস্যসহ ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ করাচী থেকে ঢাকা আসেন। আওয়ামী লীগ প্রধানের বাসভবনে প্রথম দফা, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ভুট্টোর স্যুইটে দ্বিতীয় দফা এবং পুনরায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে মুজিব-ভুট্টো তৃতীয় ও শেষ দফা আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। মুজিব-ভুট্টোর এ বৈঠক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর আলোচনায় ৬ দফার ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দফা আলোচনা শেষে ২৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে দেশে যে ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম চলছে, যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে সে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে প্রতিরোধ করা হবে। আমি ঘোরপ্যাঁচে বিশ্বাস করি না, আমি সোজা পথের পথিক এবং সমস্যাবলীর আমি সরাসরি সমাধান চাই।

গত ২৩ বছর বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সনাতন ষড়যন্ত্র আজো চলছে। তবে ভরসা হচ্ছে, দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত এবং ষড়যন্ত্র জালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমি স্বার্থবাদকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের কথা বলেছি। দেশের জন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আর বিলম্ব করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান, উপকূল অঞ্চলে সাহায্য ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এই অবস্থায় আমরা জড়ভরতের মতো বসে থেকে আমাদের মানুষকে মরতে দিতে পারি না। তাই পিপল্‌স পার্টির নেতাকেও আমি এ কথা বলেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে এবং একটি বেসামরিক সরকার গঠন ত্বরান্বিত করার জন্যে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা দরকার।

আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নয়, সমস্ত পাকিস্তানেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই সমগ্র জাতির প্রতি আমার ও আমার দলের একটা দায়িত্ব আছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা আওয়ামী লীগের আছে। তবুও জনাব ভুট্টো ও তাঁর দলসহ বেলুচ ও সীমান্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক দল ও সংশ্লিষ্ট নেতাদের সহযোগিতা আমরা চাই। বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ছোট ছোট দলের নেতাদের সঙ্গেও আমি আলোচনা করতে চাই। ঢাকায় এসে আলোচনা করার জন্যে আমি তাঁদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ষড়যন্ত্রকারীরা নির্বাচনের পর থেকেই খুব তৎপর হয়েছে এবং অতীতের মতো নানা চক্রান্ত চালাচ্ছে। কিন্তু চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র দিয়ে আর সফল হওয়া যাবে না। চক্রান্তকারীদের জানা উচিত যে, তারা আগুনের সাথে লড়াই করছে। আপনারা আগুন নিয়ে আর খেলবেন না। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করার চেষ্টা করবেন না– বাংলাদেশের মানুষকে আর শোষণ করা যাবে না।

[সূত্র : ইত্তেফাক ও দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১]

জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার চেষ্টা

তথাকথিত কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধা কোরেশী হাসিম এবং আশরাফ কোরেশী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের শ্রীনগর থেকে নয়াদিল্লীগামী একটি ফকার বিমান 'গঙ্গা' হাইজ্যাক করে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭১ লাহোর বিমানবন্দরে নিয়ে যায়। হাইজ্যাকাররা বিমানটির আরোহী ও কর্মীদের বিমান থেকে নেমে যেতে দেয়। নিজেরা বিমানটির ভিতর বসে থাকে। তাদের দাবি অনুযায়ী বন্দি কাশ্মীরীদের মুক্তিদানে ভারতের অস্বীকৃতির পর ২ ফেব্রুয়ারি ডিনামাইট দিয়ে তারা বিমানটি ধ্বংস করে। আহত অবস্থায় তারা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ হাইজ্যাকারদের আপোস বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করানোর কোনো চেষ্টা করে নি। জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকস্তানী বহু নেতা বিমানটি উড়িয়ে দেয়াকে সমর্থন জানান। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘটনার মধ্যে একটা চক্রান্তের আলামত দেখতে পান। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। নিচে তা উদ্ধৃত হলো।

ভারতীয় বিমানটিকে লাহোরে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। বিমানটি যখন অপহরণ করা হয়েই গেছে, সেক্ষেত্রে এর পরবর্তী পর্যায়ে বিমানটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। লাহোর বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী ভারতীয় বিমানটিকে ধ্বংস করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে অর্থাৎ অপহরণের পরবর্তী পর্যায়ে বিমানটিকে যাতে ধ্বংস করতে না পারে সেজন্যে কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্র ও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারতেন। জাতীয় জীবনের এই সংকট মুহূর্তে যে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি কেবল জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ও অন্তর্ঘাতীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকেই সফল করবে এবং এটা উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্যে জনসাধারণের সম্পূর্ণ সতর্ক থাকা উচিত।

আমি এই ব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যাতে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এই ঘটনাকে ব্যবহার করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাবো।

[সূত্র : পূর্বদেশ ও আজাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

পাকিস্তানে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে

লাহোরে ভারতীয় বিমান বোমা মেরে ধ্বংস করার জের হিসেবে ভারত ৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আকাশ-সীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করে। এ নিষেধাজ্ঞা সামরিক-বেসামরিক সব ধরনের পাকিস্তানী বিমানের জন্যে প্রযোজ্য হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তানী বিমান চলাচল শুরু হয় কলম্বো হয়ে। মৌলভীবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ মৌলভীবাজারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রমনা-লালবাগ থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নয়, সারাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কাজেই শাসনতন্ত্র আওয়ামী লীগ একাই প্রণয়ন করতে পারে। তবে আমরা এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করবো। যদি কেউ সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে তাহলে সে তা তার নিজ দায়িত্বেই করবে।

আমরা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চাই এবং ৬-দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতেই আমরা তা প্রণয়ন করবো। জনসাধারণ আমার দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে এবং একমাত্র জনপ্রতিনিধিরাই দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী।

ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে-চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। সে ষড়যন্ত্রের এখনো অবসান হয় নি। কিন্তু বাঙালি রক্ত দিতে শিখেছে। তাই এখন আর কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না। এবার বাঙালি বিশ্বে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ৬-দফা ও ১১-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে যতই ষড়যন্ত্র করা হোক না কেন, জনতা এবার অধিকার আদায়ে কামিয়াব হবেই।

বর্ষা মৌসুম শুরু হতে আর বেশি দেরি নাই। এ দেশে বর্ষাকালে উন্নয়ন কাজ প্রায় একরকম বন্ধই থাকে। তাই আমরা আশা করেছিলাম নির্বাচন শেষ হবার দু'এক মাসের মধ্যেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ করবো। আমরা আশা করেছিলাম জনগণের সরকার কায়েম হলে অন্তহীন সমস্যার জঞ্জাল সাফ করে বাংলার উন্নয়নমূলক কাজে জনপ্রতিনিধিগণ ঝাঁপিয়ে পড়বেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্বের এত সাহস তারা কোথা থেকে পায় তা আমি জানি না।

যমুনার ওপর সেতু ও উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, বাংলার বন্যা, বেকার, খাদ্য–এসব সমস্যা একদিনে সমাধান করা যাবে না। গ্রামের মানুষ এখন না খেতে পেয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বাংলাদেশেই ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। সাধারণ মানুষ কিভাবে যে বেঁচে আছে, তা কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে ৭০ থেকে ৮০ লাখ মানুষ বর্তমানে বেকার। প্রদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা এবং চক্রান্তকারী ও শোষণকারীরা এত বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে, আমার দল ক্ষমতায় আসলেও সঙ্গে সঙ্গে সেসব সমস্যা সমাধান খুব কঠিন হবে। বাংলাকে আজ একটি বাজার ও উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে। আমরা আমাদের জনসাধারণকে মরতে বা শোষিত হতে দিতে পারি না। আমার দল শোষণকারীদের হাত থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনবে এবং তারা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। আওয়ামী লীগাররা সত্যবাদী এবং তা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

এ ব্যাপারে আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করি। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আবার জেলে যাবো। তবুও আমরা নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। আমি ও আমার দলের কর্মীরা খোদা ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না। যদি চক্রান্তকারীরা মনে করে থাকে যে, তাদেরকে ভীত করা যাবে তাহলে তারা ভুল করছে।

দলীয় প্রধানরা প্রস্তুত থাকবেন, সময় আসলে আমি আহ্বান করবো। ক্ষমতা আমাদের কাছেই আসবে। কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক আহ্বান করেছি। আপনারা প্রতি মহল্লায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হন।

ক্ষমতা পেলে জনগণের সমস্যার সার্বিক সমাধান করবো। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং পৌর এলাকার ১ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের ঘর-বাড়ির পৌর করও মওকুফ করা হবে।

বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছুই নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেয়ার জন্যে সবসময় প্রস্তুত আছি।

[সূত্র : পূর্বদেশ, সংবাদ, আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের দু'দিনব্যাপী এক যৌথ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। নির্বাচনের পর এমএনএ এবং এমপিএ-দের এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। ঢাকায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির এক বৈঠকও আগের দিন অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় প্রধান তাঁর ভাষণে নবনির্বাচিত সদস্যদের জনগণের প্রতি তাঁদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রেই দেশ ও জনগণের কল্যাণ নিহিত আছে বলে তাঁর বিশ্বাসের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু প্রধানত বাংলায় ভাষণ দেন। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার সময় ইংরেজিতে বলেন। উক্ত ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের গণসমাবেশে আমি আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছি। আমি সেদিনও বলেছি, আজো বলছি, গণঅধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

আমরা জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যে। কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা আমাদের ওয়াদার সাথে বেঈমানি করতে পারি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। যদি এই কর্মসূচি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় তাহলেই আমরা একসাথে ভাই ভাইয়ের মতো বাস করতে পারি।

কেউ ষড়যন্ত্র বা গণরায় বানচাল করার চেষ্টা করলে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুকের ওপর মেশিনগান ধরে যেকোনো শাসনতন্ত্র পাস করতে বললেই, আমরা তা মেনে নেবো। কেউ যদি মনে করে থাকেন তিনি আমাদের অন্য কিছু গ্রহণ করাতে পারবেন, তবে তিনি ভুল করেছেন।

যাঁরা ৬-দফার বিরোধিতা করছেন তাঁরা ভালোভাবেই জানেন এই দফা কি। ৬-দফাকে নিয়ে নতুন করে আলোচনার কী আছে! ১৯৬৬ সালে এই কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। তারপর আইয়ুবের রণহুঙ্কার, জেল-জুলুম, গুলি, আগরতলার মিথ্যা মামলাসহ অনেক কিছু হয়ে গেছে। এরপরেও যাঁরা ৬-

দফা বুঝতে চান, তাঁরা বুঝেও বোঝেন না। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, চাবি আমাদের হাতে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই আর ভুল বোঝাবুঝির ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে ৬-দফা গ্রহণ করাই ভালো।

আমার দল কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলে নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। ৬-দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের সাথে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু বাংলার জন্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ৪টি প্রদেশের জন্যেও আমরা ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই। সেখানকার নির্যাতিত, শোষিত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা তাদের সাথে আছি।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্যতা আওয়ামী লীগের থাকলেও আমরা সবাই সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব চাই। গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়। গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী আমরা শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা পেয়েছি। আমরা শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিচ্ছি না। যাঁরা একথা বলেন কিংবা প্রচার করেন, তাঁরা মূলত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। তাঁদের থেকে ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যায়।

১৯৬৬ সালে লাহোরে যখন ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করি তখন তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পরে তা আওয়ামী লীগের সম্পত্তি হয়। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ৬-দফার পক্ষে রায়দান করেছে। তাই আজ আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগের নাই।

বিলম্ব হলেও ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসছে জেনে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবো। এই অধিকার কারো কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনতে হয় নি, সারাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের এই অধিকার দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন শুরু করেছে এবং জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের আগে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে খসড়া প্রণয়নের কাজ শেষ হবে। কেউ যদি ৭ কোটি মানুষের বুকে বন্দুক রেখেও অন্য কিছু মেনে নিতে বলে, তবে জনসাধারণ তা রুখে দাঁড়াবে– এই বিশ্বাস আমার আছে।

জাতি আপনাদের ওপর কত বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা আপনাদেরকে ভাবতে হবে। পাকিস্তানের রাজনীতি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। গত ২৩ বছরে দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার জের এখনো শেষ হয় নি। তাদের এত সাহস, নির্বাচনের ঐতিহাসিক ফলাফলের পরও ষড়যন্ত্র করছে। তারা জানে না যে তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে। তারা জানে না যে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে। তারা জানে না, জাগ্রত জনগণকে কেউ কোনোদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না। কোন ষড়যন্ত্রের কাছেই আমরা মাথা নত করবো না। যত ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, আওয়ামী লীগই দেশে সরকার গঠন করবে। আমি আমার দলীয় এমএনএ ও এমপিএদের প্রতি যেকোনো পরিস্থিতিতে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এতবড় নির্বাচনের পরেও বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনীতি পঙ্গু করার এবং সিকিউরিটি ছাড়া নোট বাজারে ছেড়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর চেষ্টা চলছে। শোষকদলের এজেন্ট এবং এক শ্রেণীর কুচক্রী আমলা আমাদের এবং ৬-দফার মোকাবিলায় সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে ক্যানভাস করে বেড়াচ্ছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে বলে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে অপ্রিয় হয়ে পড়ে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ক্ষমতার জন্যে রাজনীতি করি না। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্যেই আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে। কে মন্ত্রী হবেন আর কে কী হবেন, সেসব প্রশ্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের। এসব আমলার মনের রাখা উচিত যে, এ দেশে সরকার গঠন করলে একমাত্র আওয়ামী লীগই করবে। সেদিন সুদে-আসলে বাঙালির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাসুল দিতে হবে। কাজেই ওসব ষড়যন্ত্রের খেলায় এখন কোনো কাজ হবে না।

ষড়যন্ত্রকারীদের কথায় কান না দিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে আমি প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি যেসব ওয়াদা করেছেন, দেরিতে হলেও আপনি তা পালন করে এসেছেন। জনসাধারণ গণআন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবি আদায় করলেও আপনার আগমনেই জনগণের ভোটাধিকার স্বীকার করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইউনিট বাতিল করা হয়েছে। আশা করি, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সরকার গঠনের প্রশ্নেও আপনি জনগণের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করবেন।

পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আমার সাথে বৈঠকের পর জানান যে, তিনি খুশিও নন, অখুশিও নন। আমিও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্টও নই, অসন্তুষ্টও নই। তবে আমি তাঁকে বলেছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যা চায় তা মেনে নেয়া উচিত। অবশ্য আমি কাউন্সিল লীগ নেতা শওকত হায়াত খান, মওলানা নূরানী, বেলুচিস্তানের নওয়াব বুগতি ও বাহওয়ালপুরের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্ট হয়েছি। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে আমি ৬-দফার ব্যাপারে কি আলোচনা করবো? তাঁরা কি এতদিনে ৬-দফার কর্মসূচি বুঝতে পারেন নি? নাকি তাঁরা ৬-দফা বুঝতে চান না?

যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনারা সমগ্র পাকিস্তানে দুঃখী-দরিদ্র জনগণের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করুন। কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না করার জন্যে আমি অনুরোধ করছি।

সহকর্মী ভাইয়েরা আমার, আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। জনগণ অনেক আশা, অনেক আস্থা নিয়ে আপনাদের নির্বাচন করেছে। চরম মূল্যের বিনিময়ে হলেও সেই আশা ও আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। যেদিন আপনারা বাংলার মানুষের এই ভালোবাসা ও আস্থার অমর্যাদা করবেন, সেদিনই আপনাদের মুজিব ভাইয়ের, আপনাদের এবং আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের মৃত্যু হবে। আর সেই সঙ্গে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে বাঙালির ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ।

[সূত্র : ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, আজাদ, দৈনিক সংগ্রাম ও সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১]

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমী

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। একাডেমীর সভাপতি সৈয়দ মুর্তাজা আলী এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষণ দেন একাডেমীর পরিচালক প্রফেসর কবীর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, মূল শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। এই দিনই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একমাত্র কুমিল্লার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ করেন এবং উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। কোনো বাঙালি মুসলমান প্রতিবাদ করেন নি। এটা লজ্জাজনক ইতিহাস।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করবো না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আচরণ করা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দালাল বলা হয়েছে। এমন কি ভাষা আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করা হয়েছে বলা হতো। বাঙালি হিসেবে আমরা অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছি। তা না হলে বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে পারতাম। কিন্তু সেদিন আমরা উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলাম।

বাঙালির স্বাজাত্যবোধকে টুঁটি চেপে হত্যার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বারবার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিতে প্রতিহত করেছে এ দেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিবীজী সম্প্রদায় ক'জন আছেন? বিবেকের কাছেই তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনী দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এদেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্যসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁর কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এঁদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই। একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য। একে রোধ করতে পারে এমন কোনো ক্ষমতা নাই। এই প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই বাংলা একাডেমী। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলির আদেশ দিয়েছিলেন। তাই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় এসে এখানে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে। এই বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারী সরকার কত খেলাই না খেলেছে, তা এ দেশের মানুষের জানা আছে। বাংলা একাডেমীর মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মাত্র ৩ লাখ টাকা সরকার বার্ষিক বরাদ্দ করেছে। এর জন্যে কাকে দোষ দেব! যারা এসব করছে, সে আমলারা তো এ দেশেরই ছেলে। বাংলা একাডেমীর ভিতরের সব কথাই আমি জানি। লোক বদল করে নতুন নতুন লোক এনে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চালানো হয়েছে তাও জানি।

স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা একাডেমী যে সপ্তাহ পালন করছে সে সপ্তাহ বাংলাদেশের জীবনে এক কঠিন সপ্তাহ। ফেব্রুয়ারির এই দিনেই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা, এই সপ্তাহেই কুর্মিটোলার বন্দিশিবিরে হত্যা করা হয়েছে সার্জেন্ট জহুরুল হককে, এই সপ্তাহেই শহীদ হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহা, আর এই সপ্তাহেই

কারফিউ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আত্মাহুতি দিয়েছে এ দেশের অসংখ্য মায়ের অসংখ্য নাম না জানা সন্তান। স্বৈরাচারী চক্র সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে কোনো প্রফেসরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক তো সে স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ করেন নাই। তখন অধ্যাপকরা একযোগে পদত্যাগ করলে আন্দোলনে এত রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হতো না।

মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।

আমরা জনগণের দাবি আদায়ের জন্যে রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই না যে আমরা ক্ষমতা চাই না। আমরা দাবি আদায়ের জন্যেই ক্ষমতায় যেতে চাই। ক্ষমতা পেলে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করবো। আমাদের 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যেই এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবি আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসবো।

জয় বাংলা!

[সূত্র : আজাদ, সংগ্রাম, ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠারও আন্দোলন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শেখ মুজিব ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির সর্বাত্মক সমর্থন লাভ করেন। বায়ান্নোর পথ ধরে জনগণের বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭১ সালের ২০-২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। বঙ্গবন্ধু শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে মিছিলের আগে মিনার চত্বরে এক বিরাট ছাত্র-জনসমাবেশের ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আরো রক্তদানের জন্যে ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকুন। বাঙালি শহীদ হবে না। এবার তারা গাজী হয়ে বাঁচবে। যারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা নিজের রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করে এনেছে, মধ্যরাতে এই শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, তাঁদের রক্তের ঋণ আমি শোধ করবোই।

শহীদের আত্মা আজ বাংলার ঘরে ঘরে ফরিয়াদ করে ফিরছে, বাঙালি তুমি কাপুরুষ হয়ো না, স্বাধিকার আদায় করো। আমিও আজ এই শহীদ বেদী থেকে বাংলার জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, প্রস্তুত হও, দরকার হয় রক্ত দিব। নির্বাচনে আমরা বিপুল সাফল্য অর্জনের পরও বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আজো চলছে। যে ষড়যন্ত্রের পরিণতি এই ২১ ফেব্রুয়ারি, যে ষড়যন্ত্রের পরিণামে বাঙালিকে বারবার রক্ত দিতে হয়েছে, সে ষড়যন্ত্র আজো শেষ হয় নি। কিন্তু শোষকদের জানা উচিত, ৫২ সালে বাঙালির যে রূপ ছিল, তার সাথে ৭১ সালের বাঙালির অনেক পার্থক্য রয়েছে।

কারোরে উপর আমাদের কোনো আক্রোশ নাই। আমরা স্বাধিকার চাই। আমরা চাই আমাদের মতোই পাঞ্জাবি, সিন্ধু, বেলুচ, পাঠানরা নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুক। কিন্তু তার মানে এই না যে ৭ কোটি বাঙালি কারো গোলাম হয়ে থাকবে। ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়–সম্প্রীতির, সংহতির নামে বাংলাকে আর কলোনি বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে না। শুধু

গুলি খেয়ে নয়, না খেয়েও শহীদ হচ্ছে। যারা বাঙালির স্বাধিকারের দাবি বানচালের ষড়যন্ত্র করছে, বাঙালিদের ভিখিরী বানিয়ে, ক্রীতদাস করে রাখতে চাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেয়া হবে।

সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হোন। বাঙালি যেন আর অপমানিত-লাঞ্ছিত না হয়। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

[সূত্র : পূর্বদেশ, ইত্তেফাক ও দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

বাংলাদেশের মাটি থেকে গণবিরোধী শক্তিকে উৎপাটিত করুন

পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মুলতানে এক জনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্বের জন্যে সরকারের সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তার আগের দিনই জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বানে দেরির জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ৩ মার্চ ঢাকায় শুরু হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বলেন যে, ৬-দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করলে তাঁর দল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে না। ১৯ ফেব্রুয়ারি পিন্ডিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রাদেশিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের সাথে বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু এসব ঘটনার মধ্যে একটা চক্রান্ত দেখতে পান। তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে তিনি ইংরেজিতে যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন, নিচে বাংলায় তা উদ্ধৃত হলো।

কোটি কোটি লোকের ভাগ্য এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাকে তাচ্ছিল্য করা চলে না। গত সপ্তাহে জাতি যে ধরনের রাজনৈতিক নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করেছে তা বন্ধ হওয়া দরকার। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণের প্রতি দায়িত্ব-সচেতন আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ তিক্ত বিরোধের দ্বারা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চায় না। গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলে আওয়ামী লীগ এই মত পোষণ করেছে যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলো জাতীয় পরিষদে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং তা বাস্তবিকই করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের আশু বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিল। এছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও নেতার সাথে

আলোচনার জন্যে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত রয়েছে।

আমি আমার দলের নেতাদের সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং ৬-দফা শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা, যার পক্ষে পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে, ব্যাখ্যা করি।

তারপর আমি পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড. এ. ভুট্টোর সাথে বৈঠকে মিলিত হই এবং জনাব ভুট্টোর সহকর্মীদের সাথে আমার সহকর্মীদেরও বেশ ক'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমরা তাঁদের এ কথা বুঝিয়ে দেই যে, ৬-দফা ফেডারেল স্কিমের পক্ষে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ঐতিহাসিক রায়ের পর এই পরিকল্পনা জনগণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে এই ৬-দফা ফর্মুলার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ম্যান্ডেট দিয়েছে এবং পার্টি এই ম্যান্ডেট পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা অবশ্য পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কোনো ন্যায্য স্বার্থের উপর বা ফেডারেল সরকারের কার্যকারিতার উপর ৬-দফা স্কিমের প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের যে কোনো সম্ভাব্য ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করেছি।

পিপল্‌স পার্টি নিজেই এই বলে ৬-দফা স্কিম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রেখেছে যে, তাঁরা প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করবেন এবং তারপর আরো আলোচনার জন্যে ফিরে আসবেন।

আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে পুনরায় বলেছে যে, ৬-দফা স্কিমের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দেশকে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র দেয়ার উদ্দেশ্যে সব দলের সহযোগিতা কামনা করে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা মারকাজি জমিয়াতুল ওলেমায়ে ইসলামের মওলানা নূরানী, নওয়াব আকবর খান বুগতি, মওলানা গোলাম গউস হাজারভী ও জমিয়াতে ওলেমায়ে ইসলামের মওলানা মুফতি মাহমুদ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে বৈঠকে মিলিত হই।

একই সাথে আমরা জাতীয় পরিষদের আশু অধিবেশনের জন্যে চাপ দিতে থাকি। কারণ আমাদের মতে অধিবেশন আহ্বান অযথা বিলম্বিত হচ্ছিল।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। যখন নোটিশ ইস্যু করা হলো তখন ক্ষণিকের জন্যে অনুভূত হলো যে, অন্ধকারের ষড়যন্ত্রকারী শক্তির উপর যৌক্তিকতার শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে। পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণে

উদ্যত হয়েছে তখনই এই অন্ধকারের শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই গণবিরোধী শক্তি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, ১৯৫৫ সালে আইন পরিষদ ভেঙে দেয়, ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করে এবং তারপর প্রতিটি গণআন্দোলন ব্যর্থ করার জন্যে হস্তক্ষেপ করে।

এই ষড়যন্ত্রকারী শক্তি যে আবার আঘাত হানার জন্যে তৈরি হচ্ছে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণার পর যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো থেকেই সেটা প্রতীয়মান হয়। জনাব জেড. এ. ভুট্টো ও পিপল্‌স পার্টি আকস্মিকভাবে এমন সব ভঙ্গিমা ও উক্তি করতে শুরু করেছে যা জাতীয় পরিষদের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি বানচালের প্রবণতাই উদ্‌ঘাটন করে। এভাবে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালেরও চেষ্টা করা হচ্ছে।

পিপল্‌স পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল নিম্নলিখিত উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন :

"আমরা দেখেছি যে, এটা ক্ষুব্ধ ভাবাবেগের বিষয় নয়, বরং একটা কঠিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সত্য ঘটনা যে, পূর্ব পাকিস্তান বাস্তবিকই একটি উপনিবেশ" (জেড. এ. রহিম প্রণীত 'আউটলাইন অব এ ফেডারেল কনস্টিটিউশন ফর পাকিস্তান', পৃ: ৭১)।

এ সত্ত্বেও ৬-দফা কর্মসূচির ব্যাপারে কতিপয় মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এগুলো বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক মর্যাদা চিরস্থায়ী করার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কায়েমি স্বার্থবাদীদের কল্যাণের জন্যে এ দেশের সম্পদ অন্য অংশে স্থানান্তর প্রধানত কেন্দ্র কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়েছে। এভাবে বিদেশ থেকে পাওয়া সরকারি সাহায্যে শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীদের কল্যাণের কাজে লাগানো হয়েছে। গত ২৩ বছর যে আমদানি করা হয়েছে তার দু-তৃতীয়াংশেরও বেশি পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্জিত ৫ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শিল্পপতির কল্যাণের জন্যে ৭ কোটি লোকের রক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দুর্ভিক্ষ-কবলিত ও জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন-বঞ্চিত বাংলাদেশের জনগণকে পুরোপুরি দারিদ্র্যের কবলে ফেলা হয়েছে। আমরা কোনোভাবেই এ অবস্থা চলতে দিতে পারি না।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকলে এ ধরনের শোষণ সম্ভব হতো না। এই পটভূমিকায়, বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্য কেন্দ্রের হাতে রাখার পীড়াপীড়ি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এর উদ্দেশ্য জাতীয় সংহতির স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রধান যন্ত্রগুলো কেন্দ্রের হাতে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা।

পিপল্‌স পার্টির আর একটি প্রস্তাব এই লক্ষ্য সমর্থন করে সত্যিকার ফেডারেশনের নীতি একটি দ্বিতীয় পরিষদের দাবির সমর্থনে দাঁড় করানো হয়েছে। এই পরিষদে সব ইউনিট থেকে সমান প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্য কথায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যদি ১০০ সদস্যের একটি দ্বিতীয় পরিষদ হয় তবে বাংলা থেকে প্রতিনিধির সংখ্যা হবে মাত্র ২০ জন। এভাবে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশকে নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিপূর্বে কখনো বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ২০ ভাগে হ্রাস করার প্রস্তাব করতে সাহস করে নি, প্রতিনিধিত্বের সমতাই দাবি করেছে। দ্বিতীয় পরিষদে সমান প্রতিনিধিত্বের বর্তমান প্রস্তাব যদি গৃহীত হতো তাহলে বাংলাদেশ অন্য পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব পাওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। কেন্দ্র এভাবে দেশের সংখ্যালঘুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। এভাবে গঠিত কেন্দ্রের হাতে যদি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষমতা রাখা হতো তাহলে ঔপনিবেশিক শোষণের অতীত ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা সম্ভব হতো।

কাজেই দ্বিতীয় পরিষদের এই প্রস্তাব পাকিস্তানের সত্যিকার ফেডারেশনের কার্যকরী মডেল হতে পারে না, বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক শোষণ চিরস্থায়ী করারই এটা একটা দুরভিসন্ধি।

৬-দফা কর্মসূচির ব্যাপারে অন্যান্য যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো সত্যের অপলাপ মাত্র। বাংলাদেশে জনসাধারণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত জনতার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিই এর লক্ষ্য। ৬-দফা স্কিম কোনোভাবেই ফেডারেল সরকারকে ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর দয়ার ওপর ছেড়ে দেয় নি। পরোক্ষভাবে একথা উল্লেখও করা হয়েছে। ৬-দফার মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, দেশের কর এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পদের উপর ফেডারেল সরকারের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা থাকবে

এবং এ ক্ষমতা-বলে ফেডারেল আইন পরিষদ ফেডারেল ইউনিটের উপর ফেডারেল লেভি বসাতে পারতেন। ইউনিটের সম্পদের উপর আরোপিত এ ধরনের লেভি প্রথম খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে। ঠিক একইভাবে ফেডারেল ইউনিটের হাতে বহির্বাণিজ্য এবং সাহায্য থাকলে বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের অসুবিধায় পড়তে হবে বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাও ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আবারও জোর দিয়ে বলছি যে, দেশের বৈদেশিক নীতি মোতাবেকই ফেডারেল ইউনিটগুলো বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং দেশের পশ্চিম অংশের শোষিত জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির প্রচেষ্টা বর্তমানে চরমে পৌঁছেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাঙালিদের 'শত্রু' নামে অভিহিত করা হচ্ছে– যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান সদস্যরা নিজেদেরকে 'জিম্মি' স্বরূপ মনে করবেন। জাতীয় পরিষদের বাঙালি সদস্যদের নামে মিথ্যা দুর্নাম রটানো হয়েছে। পরিষদকে 'কসাইখানা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করা হয়েছে বলেই এ ধরনের অযৌক্তিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অশোভন, অযৌক্তিকও। কারণ গত ২৩ বছর যাবৎ বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলো পশ্চিম পাকিস্তানেই অবস্থিত। এভাবে যদি পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করে তোলা হয় তবে বাঙালিরা কি আইনত প্রশ্ন করতে পারে না যে, তাহলে বাঙালিদেরকেই পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্যে বলা হবে?

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো কতিপয় অনুকূল মতামতের দ্বারা উপরোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ পিপল্‌স পার্টির জনৈক সদস্যের একটি লেখা 'পাকিস্তান টাইমসে' প্রকাশিত হয়। উক্ত লেখায় লেখকের আবেদন নিম্নরূপ :

"দেশের সংহতির প্রশ্নে জনগণকে নিজেদের সত্যিকার অবস্থার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা হবে এবং মৌলিক বিষয়ে আপোস নিষ্পত্তির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সাংঘাতিক ধরনের দুর্যোগ থেকে সমস্ত দেশকে রক্ষা করা সম্ভব না হলেও অন্তত যে অংশটুকু তাদের পক্ষে সম্ভব সে অংশটুকু রক্ষার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সত্যিকারের রাজনৈতিক আবেদন হচ্ছে–যেটুকু রক্ষা করা সম্ভব সেটুকুই রক্ষা করা উচিত। দেশের সংহতি বিনষ্টের প্রস্তাব দেয়া ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগকে ৬-দফা থেকে বিরত থাকার জন্যে আবেদন জানানো আমাদের উচিত এবং যদি আওয়ামী লীগ আমাদের কথা

না শোনে তবে পশ্চিম পাকিস্তানে ৬-দফা বাস্তবায়নকে ঠেকাবার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আমাদের উচিত হবে।"

এর মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানীদের ওপর ৬-দফা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে বলে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। ৬-দফা কর্মসূচি হচ্ছে ফেডারেল ইউনিটগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি কার্যকরী কর্মসূচি। পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেল ইউনিটগুলো যদি বাংলাদেশের মতো সার্বভৌমত্ব ভোগ করতে না চায় বা কেন্দ্রের হাতে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে চায় কিংবা কোনো আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গড়তে চায় তবে ৬-দফা কর্মসূচি তাদের কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না।

তবুও আওয়ামী লীগ কখনো এমন মনোভাব গ্রহণ করে নি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটগুলোর উপর ৬-দফা চাপিয়ে দিতে হবে। অপর যেসব বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো, যদি বাংলাদেশ অতীতের অবস্থায় থাকতে না চায় অথবা অন্য অংশের সংখ্যালঘুদের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে না হয়, অর্থাৎ এ প্রদেশকে যদি উপনিবেশ হিসেবে থাকতে না হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যদি তার আইনসম্মত ভূমিকা পালন করতে হয় তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'রক্ষা করতে হবে'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই রক্ষা করা 'কাদের থেকে' রক্ষা করা এবং 'কাদের জন্যে' রক্ষা করা? স্বভাবতই লেখক তা গণতন্ত্রের সোচ্চার প্রবক্তা বাঙালিদের কাছ থেকে রক্ষার কথা বলতে চেয়েছেন। আর তা রক্ষা করতে চেয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের সেই কায়েমি স্বার্থবাদীদের জন্যে, যারা তেমন গণতন্ত্রের জন্যে আর টিকে থাকতে পারবে না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি শোষণের অধিকার হারাতেও হয় তবু পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণকে শোষণ করার জন্যে তাদের সেই অধিকার রক্ষা করতেই হবে।

ষড়যন্ত্রকারী তথা কায়েমী স্বার্থবাদী এবং তাদের লেজুড়রা যে শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে যাতে করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব না হয়। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণের মনে আজ আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলে চলবে না।

তাদের এই বেপরোয়া মনোভাব এমন এক চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, জাতীয় সংহতির জন্যে উদ্বেগ প্রকাশের ভান করে তারা আজ পাকিস্তানের অস্তিত্ব বাজি রাখতেও প্রস্তুত।

গণতান্ত্রিক এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের মিলেমিশে থাকার জন্যে একটি ভিত্তিমূল রচনার যে শেষ সুযোগ পাকিস্তানের জনগণ পেয়েছেন, তা বানচাল করে দিয়ে আজ পাকিস্তানের সংহতির উপর মরণ আঘাত হানতে চলেছে। কেননা, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে সেটাই হবে মিলেমিশে থাকার সেই ভিত্তি মূল। তবে আমরা এই পরিষদের মাধ্যমেই সতর্কভাবে আমাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাব। কেননা দেশের জন্যে একটি কার্য-উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সেটাই হচ্ছে একমাত্র 'ফোরাম'।

এই দায়িত্ব পালনে আমরা পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রতিটি সদস্যের সহযোগিতা কামনা করি।

আজ পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণ, কৃষক, মজুর এবং বাংলাদেশের ছাত্রসমাজকে জনগণের বিজয়ের পথ যারা রুদ্ধ করতে চায় তাদের সেই ষড়যন্ত্র রোখার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব' ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'স্বেচ্ছাচার'-এর অবাঞ্ছনীয়তার প্রশ্নে যারা উদ্বিগ্ন তাদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, তাদের সামনে শক্তির যত বড় দুর্গ-প্রাচীরই থাকুক না কেন, পাকিস্তানের জনগণ কখনোই সংখ্যালঘুদের একনায়কত্ব বরদাস্ত করবেন না বা অন্য কোনো রকমের স্বৈরাচার মেনে নেবেন না। একমাত্র যে শক্তিতে আমরা বিশ্বাসী তা হলো–জনগণের শক্তি। জনগণ সবরকম স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে–জাগ্রত জনগণের সুদৃঢ় সংগ্রামের মুখে তাদের ক্ষমতার দুর্গ-প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। যদি কেউ স্বৈরাচারী হতে চান–তিনি যেন ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আমরা সুস্পষ্টভাবে ষড়যন্ত্রের সেইসব অশুভ শক্তিকে জানিয়ে দিতে চাই যে, তারা যেন কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে ওঠার চেষ্টা না করেন। যদি কেউ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যর্থ করতে বা বাধা দিতে চায় তা হলে প্রতিরোধ করাই হচ্ছে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জাগ্রত জনগণের পবিত্র কর্তব্য। সকল গণবিরোধী শক্তিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎপাটিত করতে প্রস্তুত থাকার জন্যে আমি বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের আগামী বংশধরদের যাতে উপনিবেশে বাস করতে না হয়, যাতে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে সে জন্যে প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন দেয়ার প্রতিজ্ঞা আমরা আবার নতুন করে গ্রহণ করছি।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবে

বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যদের সম্মানে ঢাকা শিল্প বণিক সমিতি আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু পিপল্‌স পার্টির জাতীয় সংসদের অধিবেশন বর্জন করার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ অবতারণা করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ ঢাকার তেজগাঁও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনের চত্বরে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। বিদেশী কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্প ও বাণিজ্য মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের ঢাকায় এসে দেশের জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে আমি যোগ দেয়ার আহ্বান জানাই। শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন, কাজেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সবার পরিষদের অধিবেশন যোগদান করা উচিত। জাতীয় পরিষদের সদস্য একটি দলের প্রধান অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আশ্বাস দাবি করেছেন। আমি কোনো আশ্বাস দিতে পারি না, কারণ ৬-দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিন-রাত আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ও ন্যায্য সুপারিশ করেন, তা মেনে নেয়া হবে। আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই, ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ৬-দফা কর্মসূচি শুধু বাংলার মানুষের জন্যে নয়। আমরা সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পক্ষপাতী। তাই পাকিস্তানও থাকবে, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তান থাকবে। যা থাকবে না তা হচ্ছে মানুষে-মানুষে শোষণ।

যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিক্টেটরশিপের কথা বলছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিক্টেটরশিপ করছেন। যেসব মন্তব্য শোনা যাচ্ছে তা কেবল দুঃখজনকই নয়, ভবিষ্যতের জন্যে ভীতিজনকও বটে। জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। বাংলাদেশ বলে যদি আপনি মাত্র ৮৩ জন সদস্য নিয়ে আসতে না চান, তাহলে আওয়ামী লীগ ১৬০ জন সদস্য নিয়ে বলতে পারে– 'আমরাও যাব না'। তাহলে কি হবে?

জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র নির্বাচনের পরও অব্যাহত আছে। এ ধরনের বাধাবিঘ্ন চলতে থাকলে এসবের পরিণতির জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরাই দায়ী হবে। আমরা মরতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কিছুতেই নতি স্বীকার করবো না।

আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৭ কোটি লোক কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না।

স্বাধীনতার সময় বাংলা সোনার দেশ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ২৩ বছরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণে সোনার বাংলার সর্বত্র বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদে ভরে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের বর্তমান অবস্থা দেখার জন্যে স্বাধীনতা চান নাই। পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহ্ সাহেব বেঁচে থাকলে বলতেন, তিনি এ পাকিস্তান চান নাই।

উন্নত জীবনের আশাতেই জনগণ সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল। কিন্তু তার জায়গায় এ পর্যন্ত তারা এমনভাবে শোষিত হয়েছে যে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙে গেছে।

এ প্রদেশ থেকে এক সর্বাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে ৭০ লাখ লোক আজ বেকার। তাই কর্ম ও খাদ্যসংস্থানের তাগিদে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে সমানে লোক চলে আসছে। ২৪ বছরকালে এমনকি বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় ও সশস্ত্রবাহিনীতে শতকরা ১৫ জন লোকও স্থান পায় নি। ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাঙালিদের নিয়োগ করা হবে। তবে রাতারাতি এই পন্থা কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। ক্রমে ক্রমে করা হবে। আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা একজন লোককেও অনাহারে মরতে দেব না।

স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সত্ত্বেও তার শতকরা ৮০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী মিলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিকাশমান তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং এর ফলে ২০ লাখ লোক বেকার হয়েছে। শিল্প সংরক্ষণের অজুহাতে বাংলাদেশের জনসাধারণকে জাপান ও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্যের চেয়ে ছয় গুণ বেশি দাম দিয়ে কাপড় কিনতে হয়েছে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এক ভ্রান্তনীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ড পাটের রপ্তানি বাজার হারাতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আর চা

রপ্তানি করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের চা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে। তামাক ফসলও আজ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী লবণ উৎপাদকদের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের উপর কর আরোপ করে হাজার হাজার লোককে বেকার করা হয়েছে।

আমি আবারো ঘোষণা করছি, দরিদ্র জনগণের স্বার্থে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসমূহ জাতীয়করণ করা হবে। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে পুঁজি সংগ্রহ করে ২২ পরিবার গড়ে উঠেছে। আজ ব্যাংক তাদের হাতে, বীমা কোম্পানি তাদের নিয়ন্ত্রণে। ২২ পরিবার টেলিফোনে কোটি কোটি টাকার 'এলসি' খুলে ফেলে আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শতকরা ৪৫ ভাগ টাকা জমা দিয়েও 'এলসি' খোলার জন্যে হয়রান হয়।

বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লাখ টাকা ছিল তারা এখন ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এই টাকা আসমান থেকে আসে নি। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে এই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের জন্যে হাসপাতালে বেড সংখ্যা ৬ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তানের হাসপাতালের বেড সংখ্যা ২৬ হাজার।

ব্যবসায়ীদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অতীতে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের সংগ্রামে শরিক হন নাই। তবে ভবিষ্যতে এরকম যে কোনো সংগ্রামে তাঁরা শরিক হবেন আশা করি। অন্যথায় আপনাদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। আর তা টিকে থাকলেও আপনাদের দাসের মতোই জীবনযাপন করতে হবে।

বাংলার এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বণিকদের বিরুদ্ধে নয়। যেসব ব্যবসায়ী বাংলার মাটিকে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আমাদের ভাই। আমরা তাদের তাড়াতে চাই, এ কথাটা আদৌ সত্য নয়। আপনারা এখানে ব্যবসা করুন। আমরা কখনো আপনাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বলবো না। তবে দয়া করে পুঁজি পাচার বন্ধ করুন।

জয় বাংলা আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক। এই আন্দোলন চলবেই। সেই সঙ্গে চলবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন।

[সূত্র : আজাদ, সংগ্রাম, পূর্বদেশ ও দৈনিক পাকিস্তান, ১ মার্চ, ১৯৭১]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা দুর্ভাগ্যজনক

১ মার্চ, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পিপল্‌স পার্টিসহ আরও কয়েকটি দল ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার সংকল্প প্রকাশ করায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে বলে কারণ দেখানো হয়। বাংলাদেশে জনসাধারণ এ ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ঢাকায় শত শত স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে যায়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, আইনজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন। মিছিলকারীরা ভুট্টোবিরোধী এবং বাংলার স্বাধিকারের দাবিতে শ্লোগান দেয়। সে সময়ে ঢাকায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক চলছিল। হাজার হাজার বিক্ষোভকারী বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের জন্যে হোটেলের সামনে সমবেত হয়। হিংসাত্মক ঘটনার আশঙ্কায় তিনি জনগণকে শান্ত করতে চাইলেন।

হোটেলে সমবেত সাংবাদিকদের কাছে তিনি তাঁর কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারাদেশে তিনি হরতাল পালনের আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের সামনে দেয়া ঘোষণার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

আপনারা সম্ভব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত বিবৃতি শুনেছেন। সাধারণত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ তাঁর কণ্ঠেই শোনা যেত। অথচ এ ক্ষেত্রে বিবৃতিটি অন্য কারো কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সকল এম.এন.এ এখন ঢাকায়, ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর বাকি সব পশ্চিম পাকিস্তানী এম.এন.এ অধিবেশনে যোগদান করে শাসনতন্ত্র রচনায় সহায়তা করতে প্রস্তুত। এই মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

আমি আগে থেকেই বলেছি, ষড়যন্ত্র চলছে। এই ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এর কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। একটি সংখ্যালঘু দলের একগুঁয়ে দাবির ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে–এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই আমরা একে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে পারি না।

এর প্রতিবাদে কাল মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় এবং পরশু সারাদেশে সাধারণ হরতাল পালিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি শিগগিরই মওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমিন, প্রফেসর মুজাফফর আহমদ এবং জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে আলোচনা করবো। আগামী ৭ মার্চ রেসকোর্সে এক গণসমাবেশে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

আমরা যে কোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা নির্বাচিত হয়েছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরোনো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ এবং বাজার হিসাবে শোষণ করার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমরা আমাদের সম্মিলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আপনারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তবে সব রকম হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের দল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাব।

জনগণ আমাদের নির্বাচিত করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরাই জনগণের কাছে দায়ী। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরা সবার সহযোগিতা চাই। পশ্চিম পাকিস্তানেরও জনাব ভুট্টো-কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর সব দলের সদস্যরাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ঢাকা আসতে আগ্রহী ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর পর তার একটা নিজস্ব কার্যধারা রয়েছে। শাসনতান্ত্রিক বিল পেশের পর সেভাবেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেত। কিন্তু একটি দলের আবেগে সাড়া দিতে গিয়ে তা বানচাল করা হয়েছে। জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পরিষদ সদস্যকে হুমকি দিয়েছেন। তিনি আইন নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তো আইন প্রয়োগ হচ্ছে না? তবে কি আইন সব দরিদ্র বাঙালিদের জন্যে?

আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আহ্বানের দাবি করেছিলাম। সেই সময়ে জনাব ভুট্টো মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আহ্বানের দাবি জানান এবং ৩ মার্চ পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ধার্য করা হয়েছিল। আমি পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে আমার মত ঘোষণা সত্ত্বেও

জনাব ভুট্টো স্থগিত রাখার দাবি জানান এবং সেটাই করা হচ্ছে। এর অর্থ কি এই নয়, কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করছেন? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগুলোর মতই গৃহীত হয় এবং আমরা সংখ্যাগুরু।

বাঙালিদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা ন্যায় ও সত্যের জন্যে সংগ্রাম করছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করবো। প্রদেশে বসবাসকারী অবাঙালিরা এদেশেরই সন্তান। জনগণের সংগ্রামে তাঁদেরও অবশ্যই যোগ দিতে হবে। জনগণ ৬-দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। দাবি আদায়ের জন্য এগিয়ে গেলে কেউ যদি আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার পরিণতির জন্য তাঁরাই দায়ী থাকবেন।

[সূত্র : পূর্বদেশ, আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক সংগ্রাম; ২ মার্চ, ১৯৭১]

৩ মার্চ শোক দিবস হিসেবে পালিত হবে

১৯৭১ সালের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঢাকা বিক্ষোভ মিছিলে সয়লাব হয়ে যায়। রাত্রে সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে অন্তহীন মানুষের ঢল নামে। জনগণের 'জয়বাংলা' ধ্বনি ঢাকাকে প্রকম্পিত করে তোলে। সেনাবাহিনী জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি ছোঁড়ে। এতে কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষ নিহত ও অসংখ্য আহত হয়। মধ্যরাত পর্যন্ত অন্তত তিনজনের লাশ এবং আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে আনা হয়। ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু গুলিবর্ষণের ঘটনার নিন্দা করেন। তাঁর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো।

আজ এখানে নিরস্ত্র বালকের উপর গুলি চালানো হয়েছে। এতে কমপক্ষে ২ ব্যক্তি নিহত ও আরো কয়েকজন আহত হয়। তাদের উপর গুলি চালানো হয়েছে, কারণ তারা বাংলাদেশেরই প্রতি এক চরম অবমাননার বিরুদ্ধে সারা বাংলারই অপরাপর জনমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সে যে কোনো অবমাননা করুক না কেন।

আমি এই গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানাই এবং যারা শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করতে চান, তাদের এই ধরনের বেপরোয়া পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যার শামিল এবং সেটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধও বটে।

তাদের জানা উচিত, বাংলাদেশে যদি আগুন জ্বলে ওঠে তবে তারা এর শিখা এড়াতে পারবেন না। এই ধরনের সংঘাত অব্যাহত থাকলে আগুন জ্বলবেও। আমরা বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সাথে ৩ মার্চ অধিবেশনে বসতে রাজি ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু প্রতিনিধি এর মধ্যেই এ ব্যাপারে ঢাকা এসে পৌঁছেছিলেন।

কিন্তু এক আকস্মিক হস্তক্ষেপের ফলে এই অধিবেশন স্থগিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী দলের ত্রাণকারীরূপে একটি সংখ্যালঘু দল এই হস্তক্ষেপে উৎসাহ দেয়। তারা জানায় যে, একমাত্র তাদের আরোপিত শর্ত ছাড়া অধিবেশন হতে পারবে না। এমন কি তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখায়।

একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশক্রমে সংখ্যাগুরু প্রতিনিধিদলের অধিকার অস্বীকার জনগণের প্রতি দুঃসহ অপমান ছাড়া আর কিছুই না।

বাংলাদেশের মানুষ এই ধরনের নির্দেশ কিংবা ভীতির কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয় বলে বর্তমানে শক্তি দিয়ে তাদের মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এটা মর্মান্তিক যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বহনের জন্য যে বিমানগুলো ব্যবহার হতে পারত তা এখন সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীর লোকদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাত কোটি বাঙালিকে দমনের উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে জনগণ গতকাল থেকে সারা বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাঙালিরা আর নির্যাতিত হতে রাজি নয় এবং তারা একটি স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক হতে প্রস্তুত নয়। এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে সরকারি কর্মচারীসহ সব শ্রেণীর বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে গণবিরোধী শক্তিকে কোনোভাবে সহযোগিতা না করা এবং বস্তুত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এখন যেহেতু প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন–তাঁরাই সব কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস। সব কর্তৃপক্ষই এই সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন আশা করি।

এরকম পরিস্থিতিতে সামরিক শাসন বা সামরিক আইন আর অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আমি তাই অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সংঘাতের আশু অবসান ও জনপ্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতা প্রয়োগের বাধা অপসারণের দাবি জানাচ্ছি।

উপরোক্ত দাবি পূরণ না হওয়া এবং বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

আমি আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করছি এবং আমাদের জনগণকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিচ্ছি :

(ক) কাল ৩ মার্চ থেকে আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাছারি, স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন, পিআইএ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ সংস্থা, পরিবহন, সরকারি ও বেসরকারি কল-

কারখানা, ফ্যাক্টরি, শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা ও বাজারসহ সর্বত্র হরতাল। যা যা হরতালের আওতার বাইরে থাকবে সেগুলো হলো : এম্বুলেন্স, সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সংস্থা।

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে হরতাল পালন এবং লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে। বিশেষ করে জনগণকে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে বাংলাদশে বসবাসকারী প্রত্যেকে, তা তাঁরা যেখানকারই হোন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলুন না কেন, তাঁরা আমাদের কাছে বাঙালি। তাঁরা নিজেরা, তাঁদের সম্পত্তি ও ইজ্জত আমাদের পবিত্র আমানত এবং এসব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

(খ) ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা ছিল। এই দিন এখন জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে বিকেল ৪টায় ছাত্রলীগের জনসভার অব্যবহিত পর পল্টন ময়দান থেকে এক মিছিলের আমি নেতৃত্ব করবো।

(গ) রেডিও, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রসমূহ ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বা বিবৃতি পেশ না করলে এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকল বাঙালি বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন।

(ঘ) ৭ মার্চ বিকেল দুইটায় রেসকোর্স ময়দানে এক জনসমাবেশে আমি বক্তৃতা করবো। তখন পরবর্তী কর্মপন্থা জানানো হবে।

(ঙ) আমি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের সাধারণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কোনো প্রকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ আমাদের আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং উস্কানিদাতা ও গণবিরোধী চক্রের স্বার্থের অনুকূল হবে।

[সূত্র : আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তান, ৩ মার্চ, ১৯৭১]

হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না

১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকায় ১০ ঘণ্টার জন্যে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। জনগণ তা অগ্রাহ্য করে রাস্তায় অসংখ্য মিছিল বের করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান দেয়। সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীদের লক্ষ্য করে সেনাবাহিনী গুলি ছোড়ে। এতে বহু হতাহত হয়। সংবাদপত্রে এতদসংক্রান্ত সংবাদ ও ছবি ছাপার ওপর সেন্সরশিপ ও সামরিক আইন বিধি জারি করা হয়। তেসরা মার্চ সারা বাংলাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় আয়োজন করে। এ জনসভা ছিল তৎকালের এক জঙ্গি সমাবেশ। মিছিল-সমাবেশের অগণিত নারী-পুরুষের হাতে বাঁশের লাঠি, বল্লম, লোহার রড, টেটা আর তলোয়ার ছিল। উল্লেখ্য, ছাত্রসমাজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

গতকাল আর আজ এই শহরের অলিতে-গলিতে শত শত নিরপরাধ মানুষকে গুলি করা হয়েছে। অনেকে আহত এবং নিহত হয়েছে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড যাঁরা করছেন, তাঁদের সতর্ক করে দিতে চাই, হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নাই, কারণ আমরা প্রাণ দিতে জানি। আমরা মারা গেলেও বাংলার মানুষের স্বাধিকার অর্জিত হবে।

সেনাবাহিনীর কাজ বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করা, ভাইকে হত্যা করা নয়। গুলি করার জন্যই আমাদের করের পয়সায় আপনাদের অস্ত্র দেয়া হয়। মেহেরবানি করে আপনারা ব্যারাকে ফিরে যান। আমার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

বাঙালির উপর গতরাতে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তারপর আর স্থির থাকা যায় না। নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, এটা কাপুরুষতা। গতকাল রাতে নিজ কানে আমি মেশিনগানের গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছি।

দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য বাংলার মানুষ বা আওয়ামী লীগ দায়ী নয়। এ অবস্থা আমরা সৃষ্টি করি নি। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কথা শোনা হয় নি। জনগণের নির্বাচিত

প্রতিনিধি হিসেবে আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানাই। কিন্তু জনাব ভুট্টো তাতে অসম্মতি জানিয়ে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন আহ্বানের কথা বলেন। তাঁর কথামতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। আমরা প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু জনাব ভুট্টো আবার এই অধিবেশন পিছিয়ে দেবার দাবি তোলেন। আমরা অধিবেশন বাতিল না করার জন্য বলি। জনাব ভুট্টো তখন শুধু অস্বীকৃতিই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানে আগুন জ্বালাবেন বলে হুমকি দিলেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে ৭ কোটি বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হলো। এর থেকে বড় লজ্জার আর কিছু নাই।

যারা বাংলার স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায়, তারাই হরতালের সুযোগে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গা করছে। যদি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, যদি সংগ্রামে জয়ী হতে চান, তাহলে আপনারা এসব লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গুণ্ডামিকে দৃঢ়তার সাথে বাধা দেবেন। বাঙালি হোক, বিহারী হোক, স্থানীয় হোক আর বহিরাগত হোক–সবাই আমাদের জিম্মায়, এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। তাই শান্তিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলার সাথে গণআন্দোলনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। শৃঙ্খলার সাথে আন্দোলন না করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। আপনারা হলেন একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাবাহিনী। যে নির্দেশ দেব তা তালিম করবেন।

আমি আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জনতার সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। ইচ্ছা ছিল ৭ মার্চ সব কথা বলবো। কিন্তু পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আবার ছাত্রলীগের সভায় এসেছি। জানি না আপনাদের সামনে আর বক্তৃতা করতে পারবো কি পারবো না। তাই আজ স্পষ্টভাবে আমি আমার কর্মসূচি জানিয়ে দিতে এসেছি।

যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং ভোট দিয়েছে–আমি মরে গেলেও আমার আত্মা তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি যখন দেখতে পাবে, তখন শান্তি পাবে। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত, সাধারণ মানুষ আমাদের ভাই, আমরা তাদের সাথে থাকতে চাই। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা তা চান না। গত

২৩ বছরে বাংলাদেশকে শোষণ করে ছোবড়া বানিয়ে ফেলা হয়েছে, তাই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ বাংলার মানুষের সাথে থাকতে চান না।

সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের সাংবাদিকরা নির্ভীকবাবে সকল খবর পরিবেশন করবেন। যদি আপনাদের কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, আপনারা তা মানবেন না। সংবাদপত্র মালিক যদি এতে বাধা দেয় তাহলে চাকা বন্ধ করে দেবেন।

আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হবে। এই সময়ে কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত, সরকারি অফিস, কল-কারখানা, রেল, স্টিমার, বিমানসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। সরকারি কর্মচারীবৃন্দ অফিস-আদালতে যোগ দেবেন না। সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান থেকে প্রত্যেকে বিরত থাকুন। আমি সংবাদপত্র, এম্বুলেন্স, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছি। এই কয়দিনের মধ্যে যদি সরকারি মনোভাব পরিবর্তন না হয়, তাহলে ৭ মার্চ আমি আমার যা বলার তা বলবো। হরতাল চলাকালে সকলে গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করবেন এবং বেলা ২টার পর রিকশাওয়ালাদের বেশি পয়সা দিবেন। হাসপাতালে গুলির আঘাতে আহত ব্যক্তিদের জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানেরও আমি জরুরি আহ্বান জানাই।

আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে দাবি আদায় করতে চাই। মনে রাখবেন, আমি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। রক্তের বিনিময়ে হলেও দুঃখী জনগণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখবো। যদি আমার মৃত্যু হয়, তবুও বেঈমানী করবো না।

[সূত্র : সংগ্রাম, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ; ৪ মার্চ, ১৯৭১]

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাহায্য করতে প্রেসিডেন্ট তাঁর সাধ্যানুযায়ী সবকিছুই করবেন বলে গত ১ মার্চ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্যে জাতীয় পরিষদের সকল পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতাদের কাছে জরুরি ব্যক্তিগত আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন। আগামী ৮ মার্চ পবিত্র আশুরার দিন হওয়ায় আগামী ১০ মার্চ এ সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না, প্রেসিডেন্ট তার কোনো কারণ দেখাচ্ছেন না। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ আমন্ত্রণকে 'নিষ্ঠুর তামাশা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতির মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত হলো।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যে মুহূর্তে ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা হচ্ছে, সে সময় আগামী ১০ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে মিলিত হবার প্রস্তাবিত আমন্ত্রণ বেতারে ঘোষণা করা হয়। এখনো যখন বিভিন্ন সড়কে শহীদদের রক্ত শুকিয়ে যায় নি, এখনো যখন কিছু কিছু লাশ কবর না দেয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং শত শত ব্যক্তি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে, সে সময় একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এমন কিছু ব্যক্তির সাথে মিলিত হবার জন্য এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাদের দুরভিসন্ধিই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

সেনাবাহিনী মোতায়েনসহ আমাদের কানে এখনো যে অস্ত্রের কর্কশ ভাষা শোনা যাচ্ছে, তাতে এই আমন্ত্রণ কার্যত বন্দুকে উঁচিয়েই জানানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই আমি এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম।

[সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ৪ মার্চ, ১৯৭১]

বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ রাতে ঢাকাসহ কয়েকটি শহরে পুনরায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। জনগণ আবার সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে এবং সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করে। গুলিবর্ষণে ঢাকায় অন্তত ২৩ জন নিহত ও ৩০০ জনেরও বেশি আহত হয়। চট্টগ্রামে ১২১ জন নিহত ও অগণিত মানুষ আহত হয়। ৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু জনগণকে আহ্বান জানান। তাঁর অভিনন্দন বার্তার বর্ণনা নিম্নরূপ ছিল।

শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আমাদের আহ্বানে বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশু যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমি আমাদের বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ, যেমন- শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা তাদের অধিকার কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে বুলেটের সামনে যে সাহস ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, বিশ্বের জনগণের তা জানা দরকার।

ক্রমাগত হরতালের ফলে জনগণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা সহ্য করার জন্যও আমি আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে চরম আত্মত্যাগ ব্যতীত কোনো জনগণই মুক্তি পায় নি। কাজেই জনগণকে যে কোনও মূল্যে মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

পাঁচ ও ৬ মার্চ তারিখেও সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল অব্যাহত থাকবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে :

১. যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মচারীদের এখনো বেতন দেয়া হয় নি, সে সমস্ত অফিস কেবল কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বেতনের চেকের টাকা প্রদান এবং বাংলাদেশের মধ্যে নগদ অর্থ আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো উক্ত সময় (বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা) খোলা থাকবে।

স্টেট ব্যাংকের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেতনের ব্যাপারে বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব দেড় হাজার টাকার চেক স্টেট ব্যাংক থেকে ভাঙানো যাবে তবে স্টেট ব্যাংকের মারফত বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে কোনও টাকা পাঠানো যাবে না। রেশনের দোকান বা খাবার সরবরাহকারীদেরও তাদের ব্যবসার জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

২. নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলোকে হরতালের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে :

(ক) হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান, (খ) এম্বুলেন্স গাড়ি, (গ) চিকিৎসকদের গাড়ি, (ঘ) ডাক্তারদের গাড়ি, (ঙ) সংবাদপত্র, (চ) পানি সরবরাহ, (ছ) গ্যাস সরবরাহ, (জ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (ঝ) স্থানীয় টেলিফোন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মধ্যে ট্রাঙ্কল টেলিফোন, (ঞ) দমকল, (ট) ঝাড়ুদার ও ময়লাবাহী ট্রাক।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান; ৫ মার্চ, ১৯৭১]

৭ মার্চ ১৯৭১-এ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

১৯৭১ সালের ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেন যে, একমাত্র ঢাকা ও আশপাশেই সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ৩০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২০০ জন আহত হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে ক্রুদ্ধ জনতা পাকিস্তানী পতাকা ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবিতে অগ্নিসংযোগ করে। ৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সেনা কর্তৃপক্ষ বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক শান্তি বজায় রাখার আহ্বানের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদ ২৫ মার্চ '৭১ তারিখে অধিবেশনে মিলিত হবে। তিনি উক্ত ঘোষণার সঙ্গে আরো বলেন, সশস্ত্রবাহিনী যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে। জুলফিকার আলী ভুট্টোও ঘোষণা করেন তাঁর দল এ অধিবেশনে যোগ দেবে। ঐ দিনই কুখ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৬ মার্চ এক অধিবেশনে মিলিত হয়। অধিবেশন সারা রাত ধরে চলে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। অন্যূন ১০ লাখ মানুষ তাদের নেতার কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণের জন্যে জনসভায় জমায়েত হয়। উপস্থিত জনতার প্রায় সকলেই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাশা করেছিল। বঙ্গবন্ধু দেরিতে সভাস্থলে পৌঁছেন। তিনি প্রায় ১৮ মিনিট বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তৃতায় বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্বাধীনতার পর তাঁর ঐ বক্তৃতার মূল্যায়নে প্রমাণিত হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হলো ৭ মার্চের ভাষণ। ঢাকা বেতার থেকে তাঁর এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার কথা থাকলেও তা শেষপর্যন্ত হতে পারে নি। তবে ঢাকা বেতার ভাষণটি সভায় ধারণ করে পরদিন প্রচার করে।

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায়

করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন–গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো–এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম–আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা

হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল

করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতার কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো–কেউ দেবে না। শুনুন,

মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়–হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!

[সূত্র : ভাষণের টেপ রেকর্ডিং]

আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে

১৯৭১ সালের ৬ ও ৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। দুপুরে সামান্য বিরতি ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে বৈঠক চলে। রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে যাবার পূর্বে এই বৈঠক শেষ হয়। ছাত্র-জনতার দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সভায় চারটি দাবি উত্থাপন করবেন বলে স্থির হয়। সাতই মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে উত্থাপিত দাবি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে এবং সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত উক্ত বিবৃতির পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত হলো।

পহেলা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পর থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণকে সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ (শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র) যারা জাতীয় পরিষদ স্থগিত রাখার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়েই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। সত্যিকারের ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য যারা দায়ী বস্তুতপক্ষে তারাই হচ্ছে আসল দুষ্কৃতকারী। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম হন নি। প্রেসিডেন্ট যাকে 'ক্ষমতার ন্যূনতম প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন, তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমাদের এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'পর্যাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ' বলবেন, তার লক্ষ্য হবে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া? বাংলাদেশের নিরস্ত্র

বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতার এই নগ্ন হুমকির আমি নিন্দা করছি। জাতি অনেক অর্থব্যয়ে সশস্ত্রবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে বিদেশী হামলা প্রতিহত করার জন্য, বেসামরিক নাগরিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নয়। অপর অঞ্চলের উর্দি পরা সৈনিকরা যে বাড়াবাড়ি করছে, তারা দখলকারী বাহিনীর মতো যে ভূমিকা পালন করছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের আজ রক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন।

বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখাকে 'ভুল বোঝা হয়েছে'। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য এবং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঘোষিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একটি সংখ্যালঘু দলের একক খেয়ালের প্রতি সাড়া দিয়েই কি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় নাই?

আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেছিলাম। অপরদিকে উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপটি চেয়েছিল মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন হোক। এই সংখ্যালঘু গ্রুপটির মতের কাছেই নতি স্বীকার করা হয়েছে এবং ৩ মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও সেই সংখ্যালঘু গ্রুপটি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আপত্তি উত্থপন করেছে। প্রথমত এই সংখ্যালঘু গ্রুপ একটি অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্য উত্থাপন করে বলেছে যে, ঢাকা এলে এর সদস্যরা বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং তাঁরা 'ডবল জিম্মি' হয়ে যাবে। এরপর এই দল থেকে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, তাঁরা যেসব শর্ত আরোপ করবে তা মেনে নিলেই শুধু তারা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। এরপর আরেক পর্যায়ে এই সংখ্যালঘু গ্রুপের সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হলো এই যে, উক্ত গ্রুপের পদত্যগের সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথেই আইনগত কাঠামো আদেশে আনা হলো একটি সংশোধনী। এতে বলা হলো পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই সদস্যরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু এরপর উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলেন পদত্যাগ না করার। এই দলের এই এলোপাতাড়ি ইচ্ছা-অনিচ্ছা চরমে পৌছলো ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিন এই দল থেকে ঘোষণা করা হলো যে, এই দলটির অংশগ্রহণ ছাড়া যদি পরিষদের অধিবেশন বসে তাহলে এই দল এক গণআন্দোলন শুরু করবে। এই দল এতদূর পর্যন্ত বলতে পারল যে, পরিষদের অধিবেশনে যারা যোগদান করবে, তাদের ওপর জনগণ পূর্ণ

প্রতিশোধ নেবে এবং জনগণ যদি প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই দলটিই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই দলটি থেকে আরো হুমকি দেয়া হয় যে, এই দলের কোনো সদস্য যদি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে তাহলে দলীয় কর্মীরাই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের পার্লামেন্টারি পার্টি ঢাকায় সমবেত হন এবং পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও পরিষদ সদস্যরা ঢাকা আসতে শুরু করেন।

প্রধান নির্বাচনী কমিশনারও ঢাকা এসে পৌঁছেন এবং ২ মার্চ পরিষদের মহিলা সদস্যদের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিজেরও ১ মার্চ ঢাকা আসার সম্ভাবনা ছিল।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের অবস্থানও আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃতি করেছিলাম ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত আমাদের বিবৃতিতে। এতে আমরা পাকিস্তানের প্রত্যেক অংশ থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত প্রতিটি সদস্যকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এই ঐতিহাসিক কাজে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আমরা এই পর্যন্তও বলেছিলাম যে, কোনো সদস্য ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কিছু পরিষদে উত্থাপন করলে আমরা তা মেনে নেবো। কিন্তু সে প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয় এবং তা করা হয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে।

পহেলা মার্চ এক বেতার বিবৃতিতে আকস্মিক ও অহেতুকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এজন্য অজুহাত দেখানো হয়, সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ কথা বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে। বাংলাদেশের মানুষ কি এর থেকে মনে করতে পারে না যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে? তারা কি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে? দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে এসব সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণ হয় 'রাজনৈতিক বিরোধ' অচিরেই 'সামরিক বিরোধের' রূপ নিচ্ছে, যদি না সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর নির্দেশের কাছে মাথা নত করে।

কার্যত ২৪ ফেব্রুয়ারির বিবৃতিতে আরো হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম,

যখনই আমাদের দেশে জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে গেছে, তখনই জঘন্য চক্রান্তকারীরা তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ গোটা কয় ব্যক্তি গণতন্ত্রকে বানচাল করে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষকে বঞ্চনা করেছে, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষকেও তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ১৯৫৩ সালে ক্ষমতাসীন পাঞ্জাবি জোটের চক্রান্তে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত হন। একই চক্র ১৯৫৪ সালে বাংলার নির্বাচিত সরকার এবং খোদ গণপরিষদকেই ভেঙে দেয়। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা ছিল, পাঞ্জাবের কায়েমি স্বার্থ সেখানেও আবার আঘাত হানে এবং ক্ষমতা জবরদখল করে নেয়। কিন্তু তাদের এ কথা জেনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের জাগ্রত জনসাধারণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের নির্যাতিত জনতা সম্ভাব্য সব উপায়ে তাদের এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ করবেই।

সত্যের খাতিরে আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক, এ ধরনের কোনো ধারণাই আমি দিই নাই। আমি প্রেসিডেন্টকে কেবল এই কথাই জানিয়ে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশে কি মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা দেখা এবং যথেচ্ছাভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঢাকা আসা উচিত। প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত পূর্ববর্তী বৈঠকের ব্যাপারে ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই কার্যনির্বাহী কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তখন আমাদের পক্ষে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়া সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু, আমরা এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যাদি গোপন আলোচনার বদলে জাতীয় পরিষদ ও তার কমিটিসমূহের মাঝেই সমাধান করা উচিত এবং একবার জাতীয় পরিষদ গঠিত হবার পর গোলটেবিল কিংবা গোপন বৈঠকের কোনেবা যুক্তিই নাই।

আওয়ামী লীগ কোনোভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এ অভিযোগের জবাবেই আমি এসব কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম। এ ধরনের বাধা সৃষ্টি থেকে যাদের ফায়দা হতে পারে সংখ্যাগুরু দল তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। দেশের জনসাধারণ এবং কার্যত সারা বিশ্বের কাছেই আজ একথা পরিষ্কার যে, পশ্চিমাঞ্চলের একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং করে চলেছে। দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট

নিজে এই সংখ্যালঘু চক্রটির নির্দেশে নতি স্বীকার করাকেই তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। একটি সংখ্যালঘু চক্র যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই বানচাল করার জন্য কায়েমি স্বার্থের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তবে গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা কায়েম কিংবা জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অসম্ভব। শেষপর্যন্ত যদি গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাই বানচাল এবং প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ হয় তবে তার দায়িত্ব এই সংখ্যালঘু চক্র এবং তার সাথে চক্রান্তকারীদেরই বইতে হবে।

এসব মহলই কি সেই 'গুটিকয় লোক' নয়, যারা একত্রে বসবাসের ভিত্তি উদ্ভাবনের জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টার উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে? প্রতিটি সুস্থমনা ব্যক্তিই আজ যে প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন তা হচ্ছে : বাংলাদেশের সর্বত্র নিরস্ত্র জনতাকে গুলি করে সেনাবাহিনী 'পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেছে, না অন্য কিছু? এ ভূমিকা নিয়ে তারা কি কার্যত বিচ্ছিন্নতার প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে না? নির্বাচন হয়ে যাবার পর এখন দেশে ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কোনো ব্যক্তিবিশেষই নিজেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবি করতে পারেন না।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশে আমরাই একমাত্র বৈধ উৎস। গত সাত দিনের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারের সমস্ত শাখা আমাদেরকে বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের নির্দেশাবলী মেনে চলেছে।

প্রেসিডেন্ট ও ইসলামাবাদস্থ সরকারকে এই মূল সত্য মেনে নিতে হবে। কাজেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ না করা বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এরপর আমাদের আসতে হয় আগামী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথায়। আমরা বহুবার এ অধিবেশন আহ্বানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছি। কিন্তু আজ এক অস্বাভাবিক এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণকে সামরিক শক্তির সাহায্যে মোকাবিলা করার নীতির অনুসরণে প্রকৃতপক্ষে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে

বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও বিশ্বের সর্বত্র সুবিবেচক জনগণসহ সবদিক থেকে এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে বলে আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভীতিপ্রদ পরিবেশে কাজ করবেন এটা আশা করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আমদানিসহ এই মোকাবিলাজনিত অবস্থা বজায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নির্যাতনের পরিবেশ অব্যাহত থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বেসামরিক জনতার উপর প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর আসতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা বন্দুকের মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন, এটা আশা করা যায় না।

যদি প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম পরিষদ হিসেবে কাজ করবে, তাহলে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে।

(খ) বেসামরিক জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, যাতে এখন থেকে একটা বুলেটও ছোঁড়া না হয়।

(গ) সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশের পশ্চিম অংশ থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানি অবিলম্বে বন্ধ করত হবে।

(ঘ) বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন শাখায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চলবে না এবং সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে।

(ঙ) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কেবলমাত্র পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যখনই প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁদের উক্ত কাজে সহায়তা করবেন।

(চ) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

(ছ) অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

যদি সামরিক মোকাবিলা চলতে থাকে এবং আমাদের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বুলেট নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে, তবে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রেখে আমি বলতে চাই যে, সে অবস্থায় কোনো জাতীয় পরিষদই কাজ করতে পারবে না।

আমাদের জনগণ ইতিমধ্যেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদেরকে আর উপনিবেশ অথবা বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেবেন না। তাঁরা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হবার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেছেন। আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মেহনতী জনগণকে অনাহার, রোগ ও বেকারত্ব থেকে বাঁচাতে হবে। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার লাখ লাখ লোকের পুনর্বাসনের কাজ এখনো বাকি রয়েছে। যদি শাসকগোষ্ঠী এ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তাহলে মুক্তির জন্যে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে জনগণও প্রস্তুত। যে মুক্তির জন্যে অনেক শহীদের রক্ত ঝরেছে এবং যার জন্য বহু লোক আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, জনগণের সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যাবে না।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের বীর জনগণ অদম্য সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বীরত্বের সাথে বুলেটের মোকাবিলা করেছেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বাঙালি ও তথাকথিত অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দালাল, উস্কানিদাতা ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আমি আমাদের জনগণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি যে, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোকই বাঙালি এবং তার শারীরিক নিরাপত্তা, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব এবং যে কোনো মূল্যে তা করতে হবে। আমাদের সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত না হয়, আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

আগামী এক সপ্তাহের কর্মসূচি :

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ থেকে এক সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

(১) খাজনা-ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

(২) সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে কোনো কোনো অংশকে হরতালের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হবে।

(৩) রেলওয়ে ও বন্দরগুলো চালু থাকতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশের জন্য রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাহলে রেলওয়ে শ্রমিকরা সহযোগিতা করবেন না।

(৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোকে আমাদের বিবৃতিসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে এবং তারা জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে খবর গোপন করতে পারবে না, অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত বাঙালিরা সহযোগিতা করবেন না।

(৫) কেবল স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।

(৬) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

(৭) ব্যাংকগুলো স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে দেশের পশ্চিম অংশে অর্থ পাচার করতে পারবে না।

(৮) প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(৯) অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে যে কোনো সময় উপরোক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে।

(১০) প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ৮ মার্চ, ১৯৭১]

উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন

১১ মার্চ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি মি. উলফ বঙ্গবন্ধুর সাথে ৩২ নম্বরের বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গবন্ধু আগের দিন যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। ১১ মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা দিয়ে এবং সংগ্রামের পাশাপাশি অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অধ্যাপক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় চলমান অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানায়। স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের চার ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ.স.ম. আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বন্দরে সমরাস্ত্রবহনকারী জাহাজ 'সোয়াত' এর আগমন সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

১২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবর্গ এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি খেতাব বর্জন এবং সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে 'পাকিস্তান' শব্দ থাকলে তা পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ' রাখার আহ্বান জানান। বাংলার মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষে বাস্তবমুখী প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণের জন্যে এদিন হাসান হাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' গঠন করা হয়।

১৩ মার্চ শনিবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করা হয়–যাতে বলা হয় : যে সকল বেসামরিক কর্মচারীকে প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন দেওয়া হয় এবং এম. ই-এস., কম্বাইন্ড ওয়ার্কশপ, অর্ডিন্যান্স ডিপো, সি.এম.এ, এলএও সিএমডি পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ন্যায় বিভিন্ন প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে হিসাবেই তাহারা নিয়োজিত থাকুক না কেন, তাহাদের সকলকেই ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব বিভাগে কর্তব্যকার্যে যোগদান করিতে হইবে। যদি কেহ উপরোল্লিখিত সময়ে তাহার কর্মস্থলে যোগদান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হইতে পারে। এই জাতীয় ব্যক্তিকে ফেরারি গণ্য করা হইবে এবং সেইহেতু একটি সামরিক আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে। এই আদেশ না মানা হইলে তাহা ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধির আওতায় পড়িবে, যাহাতে সর্বোচ্চ দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রহিয়াছে।'

বঙ্গবন্ধু এ ধরনের সামরিক আইন নির্দেশ জারিকে উস্কানিমূলক অভিহিত করে ১৩ মার্চ রাতে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

সামরিক আইনের আরেকটি আদেশ জারি হয়েছে জানতে পেরে আমি বিস্মিত হয়েছি। আজ যখন খোদ সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্যে ইতোমধ্যেই বাংলার সমস্ত গণমানুষের প্রচণ্ড দাবির কথা আমরা ঘোষণা করেছি, তখন নতুন করে এ ধরনের আদেশ জারি করা জনসাধারণকে উস্কানিদানেরই শামিল। এই ধরনের আদেশ যারা জারি করেছেন তাদের এই সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, আজ জনসাধারণ তাদের ইস্পাত কঠিন সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনের মুখে তারা কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি এই ধরনের উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের এই ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কারণ তারা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের এই শক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুরই প্রতিবন্ধকরতা সৃষ্টির ক্ষমতা নেই।

[সূত্র : ইত্তেফাক, ১৪ই মার্চ ১৯৭১]

হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের পর ৮ মার্চ থেকে সারা বাংলাদেশে এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সরকারি-বেসরকারি সকল ভবন, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি যানবাহনে ছোট ছোট কালো পতাকা লাগানো হয়। বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য সব নির্দেশ পালিত হয়। লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ সব বিচারপতি অস্বীকৃতি জানান। প্রেসিডেন্ট ১০ মার্চ টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবাঙালি সামরিক অফিসারদের পরিবারবর্গকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো শুরু হয়। বিদেশী নাগরিকগণও বাংলাদেশ থেকে সরে যেতে থাকেন। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নির্দেশ জারি করে এক অর্থে বাংলাদেশের প্রশাসনের ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু নির্দেশাবলী যখন সংবাদপত্রে বিতরণ করা হয়, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকার পথে ১৫ মার্চ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন। এর আগের দিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ টিক্কা খান একটি সামরিক আইন আদেশ জারির মাধ্যমে সকল সরকারি প্রতিরক্ষা কর্মচারীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ দেয়ার জন্যে বলা হয়। তাদের চাকরি করার এবং সামরিক আদালতে বিচারের হুমকিও দেয়া হয়। বাঙালি কর্মচারীরা এ নির্দেশ উপেক্ষা করেন। বঙ্গবন্ধুর ১৪ মার্চের বিবৃতি এখানে উদ্ধৃত হলো। এ বিবৃতির সাথে আলাদাভাবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ হিসেবে বিশদ ব্যাখ্যাসহ ৩৫টি নির্দেশ সংবাদপত্রে প্রেরিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশও এতদসহ দেয়া হলো।

জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যাঁরা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকেও তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহায্যে যারা শাসনের চক্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে।

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমন কি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তারা নিশ্চতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কল-কারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে– তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।

এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়ে কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এ দেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তাদের ও তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাৎ হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীনতা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোনো ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে কোনো শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচি শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে তা বিশদভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী কার্যকরি হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

আগামী কর্মসূচি ঘোষণা

১নং নির্দেশ

সরকারি সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবে এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা সবই মেনে চলবেন।

২নং নির্দেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

সমগ্র বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা

(ক) ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোনো দপ্তর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন।
ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

(খ) পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

(গ) জেলের দপ্তরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪নং নির্দেশ

বন্দর (অভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলো জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্য সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা নেয়ার কাজে কোনোভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। অভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে

পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে ও ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাস্টম কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন, কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোনোমতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই অফিসই খোলা থাকবে যেগুলো রেল চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোনো কাজে কোনোভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবে।

৭নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহন

সারা বাংলাদেশে ইপিআরটিসি চালু থাকবে।

৮নং নির্দেশ

অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ইপিএসসি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আইডব্লিউটিএ'র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণনির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেয়ার ব্যাপারে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবেন না।

৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি শুধু অপরাহ্ন ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা আন্তঃআঞ্চলিক টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫নং নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃআঞ্চলিক প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।

১০নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় আন্তঃজেলা ট্রাক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলি কাজ করে যাবে।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁরা গণআন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশান সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

১৩নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১৪নং নির্দেশ

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

১৫নং নির্দেশ

ব্রিক ফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬নং নির্দেশ

আমদানি, বণ্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এ সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু থাকবে।

১৭নং নির্দেশ

(ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়, চলাচল ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এর সকল প্রকল্পগুলো যথারীতি কাজ করবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতির চলাচল, বণ্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া তেল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও এসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

(গ) নলকূপ খনন, খাল খনন ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলোকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কাজ সুচারুভাবে পরিচালনার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(চ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্যে সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া বলবৎ থাকবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্যে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

১৮নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা নেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরি কাজ সুচারুভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি এজেন্সি কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্য

বৈদেশিক সাহায্য তৈরি রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

২০নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকাররি এজেন্সি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি, ইপসিক ফ্যাক্টরি ও ইস্টার্ণ রিফাইনারি

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যে সকল শাখা খোলা রাখা প্রয়োজন তবে তা খুলে রাখতে হবে। ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে, তাদের সেভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি আধা-সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

২৩নং নির্দেশ

পেনসন

সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এ.জি. (ইপি) ও ট্রেজারী

এই নির্দেশে যে সকল কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেয়া-নেয়া ও সরকারি কর্মচারীদের বিল তৈরি করার জন্যে সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এ.জি. (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫নং নির্দেশ

১৬ (ক) ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্যে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে) কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাংকিং কাজের জন্যে সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্সসহ অন্যান্য কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চলবে।

(খ) কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাংকগুলো যে কোনো পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যে কোনো পরিমাণ আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাংক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেইল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছে :

১. যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মজুরি পরিশোধ করা।

২. সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

৩. চিনিকলের জন্য আখ ও পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থ দান।

৪. বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যে কোনো বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ঐ অংক ক্যাশ অথবা ড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত ৩ ও ৪ নম্বর

শর্তে কোনো অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাংককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার এক বছরে সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে বেশি না হয়।

৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্যে প্রয়োজনীয়।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোনো একাউন্টে ক্রস চেক ও ক্রস ডিম্যান্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

(ঘ) স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টিটি পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাংকগুলোর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করতে পারবে।

(ঙ) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্যে সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত এক ঘন্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

১. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খবর।

২. প্রত্যেক ব্যাংক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

(জ) অনুমোদিত ডিলারের সাহায্যে ফরেন ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো যাবে।

(ঝ) কূটনীতিকগণ অবাধে তাঁদের একাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশী নাগরিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঞ) লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

(ট) স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

(ঠ) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানির জন্যে লেটার অব ক্রেডিট খোলা যাবে।

(ড) পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্য ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যের ছাড় করতে হবে।

(ঢ) ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডের মারফত বকেয়া রপ্তানি বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর প্রতি নির্দেশ মোতাবেক কাজ পরিচালিত হবে।

২৬নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার জন্যে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধি নিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্যে বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭নং নির্দেশ

বাংলাদেশের জন্যে আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি-ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে আমদানি রফতানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮নং নির্দেশ

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০নং নির্দেশ

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ

. কোনো খাজনা কর আদায় করা যাবে না। (ক) পুনঃনির্দেশ দেয়া পর্যন্ত–(১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ ও কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশের কোথাও কোনেবা তামাক কর আদায় করা যাবে না, (৪) তাঁতীরা আবগারী শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

(খ) এছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর– যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অক্ট্রয়সহ স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ কর– যেমন আবগারী কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টার লাইফ ইন্সুরেন্সসহ সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবেন।

৩৩নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪নং নির্দেশ

সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।

৩৫নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ, ১৫ মার্চ ১৯৭১]

আমরা এ কমিশন অনুমোদন করি না

বাংলাদেশে নিরস্ত্র জনগণকে যেভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত বলে উল্লেখ করায় ১৭ মার্চ, ১৯৭১ 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসন কি পরিস্থিতিতে ২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছিল তা তদন্তের জন্যে একটি কমিশন গঠন করেন। নির্দেশে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হবে। শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার তদন্ত দাবি করেছিলেন, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ কি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী তলব করা হলো তা নিরূপণের জন্যে তদন্ত কমিশন গঠন করলেন। সঙ্গতভাবেই বঙ্গবন্ধু এই কমিশন প্রত্যাখ্যান করলেন। কমিশনের কাজে কোনোভাবে সহায়তা না করার জন্যে তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহমদ এবং চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ আবিদুর রেজা খানকে সদস্য করে বঙ্গবন্ধু একটি পাল্টা তদন্ত কমিশন গঠন করেন এবং তাঁদের সরজমিন তদন্তের জন্যে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ যে বিবৃতি দেন, এখানে তার বয়ান উদ্ধৃত হলো।

আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি যে দাবি জানিয়েছিলাম, ঘোষিত "তদন্ত কমিশন" সে দাবি পূরণ করতে পারবে না। সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশবলে এ তদন্ত কমিশন গঠন এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। কারণ এর শর্তাবলী পূর্বাহ্নে বিবেচ্য প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়গুলো নস্যাৎ এবং প্রকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করার পথ রুদ্ধ করে দেবে।

এ তদন্ত কমিশনের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো– ২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত কি পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছিল। সুতরাং মৌলিক বিষয়টি এভাবেই স্থির করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তদন্তের বিষয় ছিল বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্যে নিয়োগ না করে সেনাবাহিনীর

নিয়োগ ও শক্তি প্রয়োগ রাজনৈতিক স্বার্থেই করা হয়েছিল কিনা? তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতপক্ষে যেসব জোর-জুলুম করা হয়েছে এবং হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে 'কমিশন'-এর সে ব্যাপারে তদন্তের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে এমন কি হতাহতের সংখ্যা কত এবং কোন পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র জনগণের প্রতি গুলিবর্ষণ করা হয়েছে তারও তদন্ত করা যাবে না।

সুতরাং 'কমিশন' কোনো সত্যিকার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না। ফলে, সত্যি ঘটনার মূল উদঘাটনের ব্যাপারে তদন্ত হবে না এবং এটা জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটি ফন্দিমাত্র।

সুতরাং আমরা এরূপ 'কমিশন' অনুমোদন করতে পারি না। বাংলাদেশের জনগণ কোনোক্রমেই এরূপ 'কমিশনের' সাথে সহযোগিতা করতে পারে না। এ 'কমিশনে' কারো কোনো সদস্য মনোনীত কিংবা কারো এর সদস্য হিসেবে কাজ করা উচিত নয়।

জনগণের পক্ষ থেকে আমরা ৭ মার্চ ৪-দফা শর্ত উপস্থিত করেছি। তার মধ্যে একটি দাবি ছিল যথাযথ শর্ত সম্বলিত ন্যায্য, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত। সেগুলোর মধ্যে কেবল নামমাত্র এবং খণ্ড খণ্ড দাবি গ্রহণ এবং যেভাবে এ দাবি গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে আমরা যে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি সে সমস্যার সমাধান হবে না।

[সূত্র : পূর্বদেশ, ১৯ মার্চ ১৯৭১]

আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ পালনের জন্যে অভিনন্দন জানাই

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রশাসন চলার দিনগুলোতে ১৭ মার্চ শেখ মুজিবের ৫২তম জন্মদিন সমুপস্থিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, 'আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বা কি আর মৃত্যুদিনই বা কি? ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ও বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণকে নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, প্রবীণ সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নাট্যকার মুনীর চৌধুরীসহ কয়েকজন পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জন করেন। ১৯৭১ সালের ২০ মার্চ বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আন্দোলনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান জানান। নিচে বিবৃতিটি উদ্ধৃত হলো।

একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য জনগণ যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে আমি বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

এবারের সংগ্রামে প্রতিটি শহর, নগর, বন্দর ও গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বাংলাদেশের দাবির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বের স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। একটি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প জাতি কিভাবে স্বীয় লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারে, বিশ্বের সামনে বাংলার মানুষ আজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আওয়ামী লীগের নির্দেশের আওতা থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার কাজে নিরলস পরিশ্রম করার জন্য সর্বস্তরের জনগণ–ক্ষেতের চাষি, কারখানার শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য যাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করছেন, সেইসব ছাত্র, শ্রমিক এবং কর্মচারী সংগঠনগুলোর সদস্যদের আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের জনগণ প্রমাণ করেছে তাঁরা সুচারুভাবেই তাদের নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিদের আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। জনসাধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজন মিটানো অব্যাহত রাখার স্বার্থেই অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জনগণকে কঠোর শৃঙ্খলা পালন করতে হবে।

[সূত্র : দৈনিক আজাদ, ২১ মার্চ, ১৯৭১]

সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত

২১ শে মার্চ, ১৯৭১ ঢাকার প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে 'বাংলার স্বাধিকার' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিটপী অ্যাডভার্টাইজার্স এ সময়োপযোগী ক্রোড়পত্রটি পরিকল্পনা করে। প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি নেতা জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন অবজারভার গ্রুপের পত্রিকাসমূহ 'বাংলার স্বাধিকার' শিরোনামে ক্রোড়পত্রটি প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরদিন অবশ্য শিরোনামটি বদলে 'বাংলাদেশ' করে ক্রোড়পত্রটি প্রকাশ করে। ক্রোড়পত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলোর লেখক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধুর অন্যতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রেহমান সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান। অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোর চেতনার সাথে তাল মিলিয়ে সব সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও চিত্রায়ণ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। এ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলোতে বিজ্ঞাপনদাতাদের উদ্দীপনা বিশেষ লক্ষণীয়।

বর্তমান সম্পাদক এ ক্রোড়পত্র পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিলেন। ক্রোড়পত্রের জন্যে বঙ্গবন্ধুর একটি বাণী নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সে মতে বর্তমান সম্পাদক একটি বাণীর খসড়া তৈরি করেন। তা তাঁর (সম্পাদকের) হাতের লেখায় লিপিবদ্ধ করে ১৯শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে, বঙ্গবন্ধু তাতে সম্মতি দেন এবং স্বাক্ষর করেন।

ক্রোড়পত্রের প্রথম পাতায় বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম ব্যাপী ছবির সাথে বাণীটি প্রকাশিত হয়। পরের পাতায় বাণীটির ফটোকপি দেয়া হল।

বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট বন্দুক বেয়নট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবি ন্যায়সংগত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন দৃঢ়তর করার অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা।

দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই

১৯৭১ এর ১৬ থেকে ২২ মার্চের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ৬ দফা বৈঠকে মিলিত হন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবার প্রস্তুতির জন্যে সময় নিচ্ছিলেন। প্রথম দফা বৈঠকের দিন চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিকরা চীন থেকে আনা অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান জাহাজ থেকে খালাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯শে মার্চ যখন বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন সেনাবাহিনী ঢাকার কাছে জয়দেবপুরে বেসামরিক লোকদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই ২০ জন লোক নিহত হয়। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু এতই বিচলিত হন যে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরের দিন প্রেসিডেন্টের সাথে নির্ধারিত বৈঠকে তিনি নাও যেতে পারেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ ১৯শে মার্চ ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি করলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ওদিকে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন বলে হুমকি দেন। অবশ্যি প্রেসিডেন্টের জরুরি বার্তা পেয়ে ২১শে মার্চ ভুট্টো ঢাকা আসেন। ক্রুদ্ধ জনতা বিমানবন্দর ও হোটেলের সামনে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরের দিন তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় মিলিত হন।

২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে 'রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টির' কথা বলা হয়। পাকিস্তান দিবসের প্রাক্কালে পৃথক এক বাণীতে ইয়াহিয়া খান 'আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একযোগে কাজ করার জন্যে এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত' বলে উল্লেখ করেন। ২৩শে মার্চ, ১৯৭১ সারা বাংলাদেশে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছাত্রলীগ প্রতিরোধ বাহিনী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গেয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রায় সব বিদেশী দূতাবাসেও বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়। কেবল চীনা দূতাবাসে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা হলে, ছাত্ররা পরে তা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায়।

পল্টন ময়দানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ছাত্ররা প্যারেড করে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডি বাসভবনের দিকে যায়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়ির সামনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনীর সালাম গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল।

এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমরা দাবি আদায় করবোই। জনগণের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলতেই থাকবে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি আত্মার একটা আত্মাও বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকবো।

আমরা নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চাই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে কোনো আক্রমণ আমরা সহ্য করবো। গত ২২ দিনের অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন চক্রের মাজা ভেঙে দিয়েছি। অধিকার যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ, তাই বিশ্বের কোনো শক্তিই তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। মা-বোনেরাও আজ সংগ্রামে রাস্তায় নেমে এসেছেন। বাংলাদেশে যাতে একটিও শোষণকারী থাকতে না পারে, সেজন্য ব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে।

আমাদের সংগ্রামে ঐক্য ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকি তবে কোনো শক্তিই আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, কোনো শক্তিই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করতে হবে। মনে রাখবেন, সেই ভালো সিপাহসালার, যিনি কম রক্তপাতে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

[সূত্র : আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে মার্চ, ১৯৭১]

বাংলার মুক্তির জন্যে শেষ সংগ্রাম

নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকে সারা দেশে ব্যাপক নির্বাচনী সফর করতে হয়েছিল। প্রতিদিন বহু ছোট-বড় নির্ধারিত-অনির্ধারিত জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন তিনি। ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭০ ঢাকা থেকে ২৭ মাইল দূরে জয়দেবপুরে তিনি এমনি এক বিশাল জনসভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল

আসন্ন ডিসেম্বরের নির্বাচন ক্ষমতা লাভের নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে শোষিত ও অবহেলিত বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় বাঙালিরাই হবে তাদের নিজেদের সম্পদের মালিক।

বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়। একইভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার জন্যে দায়ী। এসব রাজনৈতিক পরগাছা সামান্য লাভ ও মন্ত্রিত্বের লোভে বাংলার মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে শোষকদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে।

আসন্ন নির্বাচনে এইসব রাজনৈতিক পরগাছাদের শুধু উৎপাটিতই করা হবে না, তাদেরকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে এই বাংলার মাটি থেকে।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের আহ্বানেই ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই হক সাহেবকেই দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম সেনানী, তাঁর উপরও নেমে এসেছিল জেল-জুলুম ও অত্যাচারের খড়্গ। বাংলার দুর্ভাগ্য ছাড়া এটা আর কি হতে পারে?

কিন্তু আমি সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, আমি শেরে বাংলার মত তেমন বৃদ্ধ হয়ে পড়িনি। নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহলে আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্যে আমি গণ-আন্দোলনের

ডাক দেব। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্যে এটা আমার শেষ সংগ্রাম। গত গণ-অভ্যুত্থানের সময় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ঋণ শোধ করতে প্রয়োজন হলে যাতে আমি জীবনও বিসর্জন দিতে পারি তার জন্যে আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। কারণ বীর শহীদদের সংগ্রামেরই ফলেই আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছি। নির্বাচনের পর জনগণের বিজয়ের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের যে কোন ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর জন্যে প্রয়োজন হলে গণ-আন্দোলন শুরুর যে পরিকল্পনা আমার রয়েছে তাতে অংশগ্রহণে প্রস্তুত থাকার জন্যে আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার আওয়ামী লীগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রদত্ত কর মওকুফের সুযোগ প্রত্যাহারও আমরা প্রস্তাব করেছি।

কিছু সংখ্যক লোক জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব লোক সমান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানি যে কোন নাগরিকের মতোই সমান নাগরিক এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার জন্যে আমি সংখ্যাগুরু নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাই।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ১লা নভেম্বর, ১৮৭০]

অশুভ শক্তির চক্রান্ত সফল হবে না

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ কোনো কারণ না দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর নির্ধারিত বেতার ও টিভি ভাষণ বাতিল করেন। ২৩ ও ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠক করেন। ২৪ মার্চ ভুট্টোর দলের নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ ঢাকা ত্যাগ করেন। বাংলাদেশে একটি চক্রান্তের আভাস পাওয়া যায়। পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ১১০ জন নিহত হন। চট্টগ্রাম বন্দরে একটি জাহাজ থেকে মাল খালাসের সময় জনসাধারণ বাধা দিলে সেনাবাহিনীর গুলিতে অনেকে প্রাণ হারায়। শেখ মুজিবুর রহমান এসব গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ২৭ মার্চ বাংলাদেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনীর অপারেশনের কারণে ২৬ মার্চ বাংলাদেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় বিবৃতিটি কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। সেনাবাহিনীর অভিযানের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দেয়া বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো।

প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমন ও তাঁর পরবর্তী আলোচনা থেকে জনগণের একটা ধারণা হয়েছিল যে, দেশে বিরাজমান গভীর সঙ্কট সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তা সমাধান সম্ভব। এ কারণেই আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, সঙ্কট কেবল রাজনৈতিকভাবেই সমাধান সম্ভব। সে আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট যেসব মৌলিক নীতির ভিত্তিতে সঙ্কটের সমাধান হতে পারে তা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে আমার সহকর্মীরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে সেসব নীতি নির্ধারণের জন্য বৈঠকে মিলিত হন।

এভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের পূর্ণ বাস্তবায়নে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েছি। বিলম্বের কোন কারণ বা যৌক্তিকতা নাই। সংশ্লিষ্টরা যদি রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেন, তবে তাঁদের এটা বোঝা উচিত যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে নতুবা এ ব্যাপারে কোনো বিলম্ব দেশ ও দেশের মানুষকে গভীর সঙ্কটে নিপতিত করবে।

তাই সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানে অনভিপ্রেত বিলম্ব দুঃখজনক। ইতোমধ্যে বিরাজমান পরিস্থিতি একের পর এক সেনাবাহিনীর তৎপরতায়

আরো জটিল করে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এ তৎপরতা জোরদার করা হচ্ছে।

সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুর সেনাবাহিনীর তৎপরতার সংবাদে আমি মর্মাহত। বেসামরিক লোকদের উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ ও তাদের উপর অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের খবর আসছে।

এটা আরো দুঃখজনক এজন্যে যে, সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের ঘোষিত উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ঢাকা উপস্থিতির কালে এসব ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এসব সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তাঁর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে, এভাবে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা এবং অত্যাচার বিনা চ্যালেঞ্জে পার পাবে না। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির যে চরম লক্ষ্য তা অর্জনে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রয়েছে। যেটা আরো নিন্দনীয় তা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে গণবিরোধী শক্তি একটি মহলকে নিয়োজিত করেছে। আমি একাধিকবার বলেছি, যাঁরা বাংলাদেশে বাস করেন তাঁরা যে জায়গা থেকেই এসে থাকুন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলেন না কেন--তাঁরা সবাই আমাদের লোক এবং তাঁরাও তা মনে করবেন এবং বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁদের জান-মাল-সম্মান আমাদের পবিত্র আমানত।

এটা তাই স্পষ্ট যে যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে তারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা বানচাল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে এবং নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ চালাবার অজুহাত সৃষ্টি করার জন্যেই তা করছি। বিশ্ববাসী আজ দেখুক, একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে আমরা যখন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তখন জোর করে একটি সমাধান চাপিয়ে দিতে একটি অশুভ চক্র শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের সেসব অশুভ শক্তিকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, তাদের চক্রান্ত সফল হবে না, কারণ জোর করিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে গুলিবর্ষণ ও নির্যাতন চালানো হয়েছে আমি তার নিন্দা করি। এ ধরনের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সারা বাংলাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।

সামরিক বাহিনী ও নিরস্ত্র বেসামরিক লোকের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি না করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরা যদি এতে কর্ণপাত না করেন- সামরিক সংঘর্ষের পথ বেছে নেন, তবে একটি রাজনৈতিক সমাধান বানচাল করা এবং তার মারাত্মক পরিণতির জন্যে তাঁরাই পুরোপুরি দায়ী থাকবেন।

আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে আমি আমাদের বীর জনগণকে আহ্বান জানাই। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবে চালু রাখতে হবে। সর্বাধিক দক্ষতার সাথে যাতে অর্থনীতি চালু থাকে- তা নিশ্চিত করা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব মনে করতে হবে। এ ব্যাপারে কল-কারখানায় আমাদের শ্রমিকদের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। সর্বাধিক উৎপাদনের জন্যে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে তাদেরকে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমাদের আন্দোলন এগিয়ে যাবে। সময়ে সময়ে ব্যাখ্যা দেয়া সাপেক্ষে ১৪ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে জারিকৃত নির্দেশাবলী বলবৎ থাকবে।

[সূত্র : ডন, করাচী, ২৬ মার্চ, ১৯৭১]

স্বাধীনতার ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ বিকেল ৫টার দিকে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ খবর পান। তিনি তাঁর নেতৃস্থানীয় সহকর্মীদের গোপন আশ্রয়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকেও নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেও তিনি তা করেন নি। সন্ধ্যার পরপর ঢাকায় সামরিক অপারেশন শুরু হতে পারে, এ মর্মে একটি খবর ঢাকা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনগণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধক তৈরি করতে শুরু করে। রাত সাড়ে ১০টা থেকে সেনাবাহিনী শহরে ঢুকতে আরম্ভ করে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পিত অভিযান শুরু করে। কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরই ফোন অচল হয়ে যায়। রাত দেড়টায় পাকিস্তানী বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। সেনা-অভিযান শুরু হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারের জন্যে চট্টগ্রামে একটি বার্তা পাঠান। স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা উদ্ধৃত হলো।

এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা।
আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

[সূত্র ; বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা– বঙ্গবন্ধু স্পিক্স, ১৯৭২]

এই মুহূর্তেই আমি জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই

বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে নৃশংস অত্যাচার চালায়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান করে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বিমান কয়েকটি ভারতীয় শহরে বোমা বর্ষণ করে। ভারতও পাল্টা আক্রমণ করে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। পরদিন ভুটানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ পাক দখলদার বাহিনীর হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়। ইয়াহিয়া খান বাধ্য হলেন ভুট্টোকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ করাচীর এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হবে। ৬ জানুয়ারি ভুট্টো জানালেন, শেখ সাহেবকে ঢাকায় ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পান। পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেনকে লন্ডন পাঠানো হয়। ভুট্টো বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় জানান। ৮ জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু লন্ডন পৌঁছে সাংবাদিকদের কাছে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁর হোটেলে সমবেত জনাকীর্ণ সাংবাকিদের সামনে তিনি ইংরেজিতে বিবৃতিটি পাঠ করেন। বিবৃতির বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো।

জয় বাংলা!
বাংলার মুক্তির সংগ্রাম আজ আমি স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। এই মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবে ঘোষণা করেছে তখন আমি 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এর দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছি।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতা দানের জন্যে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন দানকারী মার্কিন জনগণ ও অন্যান্য জনসাধারণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এ দেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্যে অনুরোধ জানাবে।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুনানি অর্ধেক সমাপ্ত হবার পর পাক কর্তৃপক্ষ আমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে। আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে 'বিশ্বাসঘাতক'-এর কলঙ্ক নিয়ে মৃত্যুদণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমার বিচারের জন্যে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল তার রায় কখনো প্রকাশ করা হবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠান করে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অস্বীকার করেন।

জনাব ভুট্টো আমাকে না বলা পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। জেলখানা এলাকায় বিমান আক্রমণের জন্যে নিষ্প্রদীপ জারি করার পর আমি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা জানতে পারি। জেলখানায় আমাকে এক নিঃসঙ্গ ও নিকৃষ্টতম কামরায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল যেখানে আমাকে তারা কোনো রেডিও, কোনো চিঠিপত্র দেয় নাই। এমনকি বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে, তা জানতে দেয়া হয় নাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এত উচ্চমূল্য, এত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোনো দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই। বাংলাদেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্যে পাকিস্তানী সৈন্যরা দায়ী। হিটলার যদি আজ বেঁচে থাকতো, বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে সেও লজ্জা পেতো।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যে কোনো একটি সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি তাঁকে বলেছি, আমার দেশবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা না করে আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না।

আমি আর এই মুহূর্তে এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা ও পূর্বদেশ; ৯ জানুয়ারি, ১৯৭২]

অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে

[১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সকালে ব্রিটেনের রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছুলে রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানালেন। বিমানবন্দরে ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বঙ্গানুবাদ]

আমার জন্যে এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশ যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী–যিনি কেবল মানুষের নয় মানবতারও নেতা, তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল; আমাকে যখন বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে। জয় বাংলা! জয় হিন্দ!

[সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২]

ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ অপরাহ্নে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দর জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। বিমানবন্দর থেকে সারা পথ প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়ে রেসকোর্স ময়দানের দিকে তিনি অগ্রসর হন। জাতির জনকের একটি খোলা ট্রাকে অপেক্ষমান জনসমুদ্রে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। রেসকোর্সে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

ভাইয়েরা আমার, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও।

আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটিশ, জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দুর্গ গড়ে তোল।' আজ আবার বলছি 'আপনারা একতা বজায় রাখুন'। আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো।' বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই।

গত ১০ মাসে সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্যে মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি–বাংলাকে স্বীকৃতি দিন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় অত্যন্ত ভালোবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।' কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে। এমন কাজ তারা এবার করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি–আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের তাই এখন অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা, আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্যে। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।

তোমরা বাংলায় যারা কথা বলো না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভাইরা, তাদের গায়ে হাত দিও না; তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই; বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যেই আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে।

অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।

মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যান্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারবো না। আমি

তাদের বলেছিলাম, তোমরা নির্দেশমতো সংগ্রাম চালিয়ো। তারা সে ওয়াদা পালন করেছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরাই সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা– আপনারা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারবো না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নাই, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নাই। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এত বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত বেসামরিক লোক মরে নাই।

সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্টভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে আমি চিনি। তাঁকে আমি জানাই আমার শ্রদ্ধা। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনী। তার রক্তে মিশে রয়েছে রাজনীতি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আমার মুক্তির জন্যে আবেদন করছেন। আমার সাথে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ হয়েছে। আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

প্রায় ১ কোটি লোক যাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যাঁরা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণীর জনতাকে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই–মুক্তিবাহিনীকে, গেরিলাবাহিনীকে, কর্মীবাহিনীকে। আমি সালাম জানাই–সংগ্রামী শ্রেণীকে, কৃষককুলকে, বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না। সকল রকমের ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে।

আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই– ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আমরা স্বাধীন, এটা মেনে নিন। আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন।

গত ২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। জাতিসংঘেরও উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশকে আসন দিয়ে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করা।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ-ভারত ভাই-ভাই।

আসুন সমবেতভাবে সোনার বাংলা গড়ি

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দান করেন, তার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হলো।

আমার প্রাণপ্রিয় বীর বাঙালি ভাই-বোনেরা, আমরা আজ স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। এই মহান দিনে স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে লক্ষ লক্ষ বীর শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য গভীর বেদনাপ্লুত মন নিয়ে আমার শোকাতুর দেশবাসীর সাথে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ও অন্যান্য ভূমিকা পালনের জন্যে আমি মুক্তিবাহিনীর সকল অঙ্গ দল তথা বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ, নির্ভীক যুবক, ছাত্র-কৃষক-মজদুর-বুদ্ধিজীবী আর আমার সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও একনিষ্ঠ আত্মদান অনাগতকালের ভাবী বাঙালিদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত মুক্তিপাগল জনতার চেতনাকে উদ্ভাসিত করবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত ২৫ বছর ধরে আপনারা ক্ষুধা, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটা নিকৃষ্টতম উপনিবেশে পরিণত করেছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। পিষ্ট হচ্ছিলাম শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাষ্পে যখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত ও হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায়বিচার দাবি করায় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আমাদের উপর নেমে এসেছিল। সমসাময়িককালের নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, আর প্রায় ৩ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত। এ সবকিছুই ঘটেছে আমাদের

স্বাধীনতার জন্য। আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তা'হলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্ত মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আজ আমাদের সামনে পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। মহাসঙ্কটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছিল। বিদেশফেরত ১ কোটি উদ্বাস্তু, স্বদেশের বুকে ২ কোটি গৃহহারা মানুষ, বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা-চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়, নিশ্চল কারখানা, নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অসংখ্য বেকার, অপরিমিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খল বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা, ভগ্ন সড়ক, সেতু ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অকর্ষিত ভূমি–এ সবকিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। জনগণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস ও অতুলনীয় ঐক্য–এগুলোকে সম্বল করেই আমার সরকার এই মহাসঙ্কট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

আমি আশা করবো, অতীতে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিক যন্ত্রকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সঙ্কটের মোকাবিলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলবো।

ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের বাংলাদেশ রাইফেলস্ ও পুলিশের বিপুল সংখ্যক সদস্যকে হত্যা করেছে। আইনের শাসন কায়েম ও শান্তিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন নিযুক্তির মাধ্যমে আমরা পুলিশ বিভাগকে সংগঠিত করেছি এবং

ইতোমধ্যে যে সকল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী স্বাধীনতাউত্তর সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের দমন করে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনো বনেদী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের জন্যে উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের সমগ্র মহকুমাগুলোকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা তৈরি করছি।

বিশেষজ্ঞরা খসড়া শাসনতন্ত্র কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং খসড়া শানসতন্ত্র গণপরিষদের সামনে পেশ করা হবে। এই শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৫৪টি বন্ধুরাষ্ট্র এ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক বন্ধুরাষ্ট্রের এই স্বীকৃতিদান রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্যে আমরা বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। বিশেষ করে ভারত আমাদের সুদিন ও দুর্দিনের প্রতিবেশী। সম্প্রতি মহান ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। এই শুভেচ্ছা সফরের প্রাক্কালে আমরা শান্তি, বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এই চুক্তি দুই দেশের মেহনতি মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং সংহতির বন্ধনকে মজবুত করবে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে এসেছি। সেখানে তাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের

পুনর্গঠনের কাজে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ যাঁরা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোটবহির্ভূত ও সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত। বৃহৎশক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাইরে আমরা শান্তিকামী। আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী। দেশ গড়ার কাজে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করবেন না এটাই আমাদের কামনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা ৫ লাখ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটকে রেখেছেন। আমি বিশ্বব্যাপী বিবেকসম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে মি. ভুট্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই ইস্যুকে কোনোক্রমেই যুদ্ধবন্দিদের সমপর্যায়ে ভাবা চলবে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যা অপরাধে অপরাধী। তারা মানবিকতাকে লঙ্ঘন করছে এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের বিচার হবে। পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন–নুরেমবার্গ মামলার আসামীদের থেকেও নিকৃষ্ট ধরনের এই অপরাধীদেরকে তারা স্বজাতি বলে ডাকবেন না।

যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে এসেছে। সাহায্য, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্যে আমরা কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বিনামূল্যে ও ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্যে কিছুটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেয়ার জন্যে অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়েছে। বিধবা, অনাথ ও নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে গেছে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ১০ বছর সময় দরকার।

আমাদের বিপ্লবী সরকার আশা করছে ৩ বছর সময়ের মধ্যে এ কাজ সমাধা করবে।

বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্যে এক দুঃসহ অভিশাপ। কিন্তু আমি কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চাই না। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আশা করি ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনতে পারবো। ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ১০ লাখ টন আমদানি করা যেতে পারে। সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্যে ঘোর দুর্দিন। আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী–আপনারা ধৈর্যধারণ করুন, উচ্চতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্য ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজব বিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে–তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্তি নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলব। এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করেছে।

১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশী ব্যাংকের শাখাগুলো বাদে),
২. সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানিসহ (বিদেশী বীমা কোম্পানির শাখাসমূহ বাদে),
৩. সকল পাটকল,
৪. সকল বস্ত্র ও সূতাকল,
৫. সকল চিনিকল,
৬. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-যানের বৃহদংশ,
৭. ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি,
৮. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং

৯. সমগ্র বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আমি দেশগড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সরকারি সেক্টরে কাজ করার জন্যে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। শিগগিরই যে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হচ্ছে, তাতে এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হবে। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে বাঙালিদের মালিকানার স্বার্থ সরাসরি জড়িত, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক মালিক অথবা প্রধান কর্মকর্তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নেন, আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেগুলো সবদিক থেকে বিপ্লবাত্মক এবং জনসাধারণকে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে মাঝারি ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের নীতির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরকারি নীতির কাঠামোর মধ্য থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ ন্যায্যভাবে চালানোর জন্যে উৎসাহ দেয়া হবে।

আমি এমন এক নীতি নির্ধারণ করতে চাই, যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। এই বলিষ্ঠ শ্রেণীর কর্তব্যবোধের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে, তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সাথে বিরোধে লিপ্ত থাকতে হবে না। কেননা, বর্তমানে তাদের মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে।

আমি খুব শিগগিরই শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করছি। সেই সভায় শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি নীতি এবং আমাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করতে তাদের যে পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছানোর পরে আমি আশা করবো যে,

শ্রমিক নেতারা আমার সরকার ও আমার সাথে একযোগে কাজ করবেন এবং এই বিপ্লবী নীতিসমূহ সরাসরি শিল্প এলাকায় কার্যকরী করবেন। তদুপরি শ্রমিকদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

আমার ছাত্র ভায়েরা, যারা মুক্তি সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তাদের কাজ করে যেতে থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশসহ আমি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চলেছি।

আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও আমরা চাষিদের স্বল্পমেয়াদি সাহায্য দানের জন্যে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্যে মওকুফ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাকাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এবং ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। লবণের উপর থেকে কর তুলে দেয়া হয়েছে।

সারা বছর ধরে সেচের কাজ চালানো, উন্নতমানের বীজ বপন, সার, কীটনাশক এবং প্রতিটি চাষিকে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ-মালিকানার ক্ষেত্রে পশ্চাতের বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবার পিছু ১০০ বিঘায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উচ্চসীমা আরো কমিয়ে আনা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। ছোট ছোট চাষিদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষিরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থায় সুফলই পাবে না, বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন স্বল্প জমির অধিকারী চাষিদের জন্যে ব্যাপক পল্লী পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করা। 'কাজ করলে খাদ্য' এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১ লাখ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের অধীনে পল্লী কর্মসংস্থানের জন্যে নগদ ১৬ কোটি টাকা দেয়া হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে বেকার সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে এটা গড়ে তোলা হবে। আমাদের কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের এটা হবে সহায়ক। এই সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন। সেই সব ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যাঁরা পাটচাষিদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মানুষ হয়েছেন তাঁদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। আমি ইতোমধ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামে কাজ করার জন্যে ৫০০ ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছি। বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে। এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বি বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাদি উদ্ভাবনের জন্যে আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্ব সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি– আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুস্তর পথ। এ পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের লাল আস্তরণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না। আমি জীবনেও কোনো দিন কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই নাই। শত্রুরা বাংলাদেশের সব কিছু ধ্বংস করে গেছে। কিছুই রেখে যায় নি। কি করে যে এ দেশ চলবে, সত্যিই চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া উঠি।

শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে– শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন, সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বসবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক দিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে ৩০ লাখ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই তাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করব এবং মনে রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সে রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এদেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে এ দেশের জনগণ, রক্ত দিয়েছে সামরিক বাহিনীর ভায়েরা, রক্ত দিয়েছে পুলিশ, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ইপিআর, রক্ত দিয়েছে আনসার মোজাহেদরা। রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খান সেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায় নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই পুলিশ-সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই।

আজ তাঁদের কথা আমরা স্মরণ করছি, স্মরণ করতে হয় আমার সহকর্মী সভ্যবৃন্দের কথা, যাঁরা সেই গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের

অনেককেই বন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে– তাঁদের নামও ঐ প্রস্তাবে রয়েছে; যে প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদে পেশ করছি।

তাছাড়া এই দেশের জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ লোক, আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ কর্মী স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন। সাথে সাথে অন্যান্য যাঁরা আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে যাঁরা স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সাথে সাথে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেবো, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তাঁরা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। জনাব স্পিকার সাহেব, জাতির কাছে আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে, একটা বিরাট কর্তব্য আছে। আমি আমার বক্তৃতা বড় করতে চাই না। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের সেই ইতিহাস আজ এখানে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন নেতার কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন; যেমন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নিহত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর কলম দ্বারা সংগ্রাম করেছেন সেই জনাব তফাজ্জল হোসেন– আমাদের মানিক ভাই। এঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করতে চাই। স্মরণ করি ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁরা কারাগারে জীবন দিয়েছেন। গণতন্ত্রকে এ দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাঁদের ইতিহাস যদি না লেখা হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা জানতে পারবে না এই সংগ্রামের পিছনে কারা ছিলেন।

গত বছর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের কলোনি এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত করছিল। আমাদের নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত করে আমাদের কলোনি করে রাখতে চেয়েছিল। আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫ মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোনো আইন-কানুন মানে নাই। কোনো সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনোরূপ ওয়ার্নিং না দিয়েই অতর্কিতে কাপুরুষের মতো বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে, দুধের বাচ্চা পর্যন্ত হত্যা করে তারা জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক যাকে পাও তাকেই হত্যা করো, কোনোরূপ দয়ামায়া নাই। তাদের জঘন্য কাজ-কারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দরখাস্ত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে লুটপাট করো। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথাও আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র ৭ কোটি বাঙালির উপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করতো, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫ মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করলো। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি অয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকতো, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো? এখন যদি আমি ভারত সরকারের বিষয়ে না বলি, তাহলে অন্যায়

করা হবে। আমাদের দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে, ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদেরকে বুকে টেনে নেয়। ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ করে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তাঁরা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছেন। স্মরণ করি ভারতের সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত জোয়ানদের, যারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছে। আমি স্মরণ করি রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারকে, যাঁরা নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে আমার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। স্মরণ করি গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণকে, পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণকে, জাপানের জনসাধারণকে, এমনকি আমেরিকার জনসাধারণকে, যাঁরা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। যাঁরা যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সকলকে আমাদের এ গণপরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এমনকি জাতিসংঘে রাশিয়া তিনটি ভেটো দিয়েছিল, তা না হলে সেখানে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা কি হতো তা বলতে পারি না। যে সমস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ আমাদের সমর্থন দিয়েছিল, বিশেষ করে পোল্যান্ড, তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের জনসাধারণকে আমি এই পরিষদের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। সে জন্যে এগুলো বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর। কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের বাংলার গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমাদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, আমাদের কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরকম কত নির্যাতনই না আমাদের লোককে সহ্য করতে হয়েছে এবং তাঁরা যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন সেজন্যে তাঁদেরকে যদি আমরা মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। আর যে সমস্ত দল আমাকে সমর্থন করেছে তাদেরকেও আপনার

মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো জাতিকে একটা সংবিধান দেয়া এবং যত তাড়াতাড়ি হয়, সেই সংবিধান দেবার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনার মাধ্যমে তাঁদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায় বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমাদের সহকর্মীদের আত্মীয়স্বজনের উপর অত্যাচার করা হয়েছে; তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সে অধিকার পুরোপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগতো, অনেক দেরি হয়ে যেত। এই এসেম্বলি-ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বার বসার জায়গা ছিল; আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই এসেম্বলি-ভবনও না থাকতো, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন–এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই, আমরা কিছু দিতে পারছি না, মানুষ কষ্ট করছে। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন–আপনার কাছে আবার বলছি যে, আমাদের সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসবো। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করবো তা নয়; দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে,জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইবো। এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। আমরা গত ২৩ বছরে কী দেখেছি–শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে 'মার্শাল ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলে 'হিন্দুস্থানের দালাল'–এই ধরনের কথা সারা জীবন শুনে আসছি। সেসব যাতে এ দেশ থেকে উঠে যায়, সে জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পিকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটা গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারী কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন এই আশা করি। আপনি কোন দল বড়, কোন দল ছোট তা দেখবেন না; কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইনসাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জানাবো।

এখানে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সাহেব তা পড়েছিলেন, আবার সংশোধন করে তা পেশ করা হবে। আপনার মাধ্যমে আমার সদস্য ভাইদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তারপর অ্যাসেম্বলি কর্মচারীরা রাতদিন পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি যে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন, সে জন্যে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি জানি তাঁরা মাত্র কয়েক দিনের নোটিশে খুব পরিশ্রম করে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাই এই রিপোর্টারদেরকে, এখানে যাঁরা কাজ করেছেন। তাঁরা যেন পরিষ্কার, সুন্দর করে রিপোর্ট তৈরি করেন, তাতে ভুল-ভ্রান্তি যেন না হয়; কারণ এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে; এই ইতিহাস যেন নষ্ট না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[জনাব স্পিকার : এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব ছিল তা সংশোধনের পরে যে আকারের হয়েছে, আমি তা পড়ে শোনাচ্ছি। সংশোধিত প্রস্তাব হচ্ছে :

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ই.পি.আর., পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথাযথভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃতি ও সমর্থিত হয়েছিল একই সাথে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতার সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সাথেও এই পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেই সব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্যে একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন, তারা 'হ্যাঁ' বলবেন।

সদস্যগণ : (সমস্বরে) : 'হ্যাঁ'।

('না' কেউই বলেন নাই)

জনাব স্পিকার : এই প্রস্তাব গৃহীত হলো।]

১৯৭২ সালের মহান মে দিবসে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু

আমার প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতি মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার অধিকার অর্জন করেছে, এজন্যে দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক জ্বলন্ত প্রতীক। সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের জন্যে আজকের এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মেহনতি মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জুলুম এবং ঔপনিবেশিক জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখে গেলেন, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। তাঁরা আর কোনোদিন আমাদের কাছে কোনো দাবি-দাওয়া নিয়া আসবেন না। কিন্তু এই লাখ লাখ শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এ দেশের ইতিহাসে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষ দেশ গড়ার সংগ্রামে তাঁদের কাছ থেকে পাবে প্রেরণা। তাই আজকের এই মহান দিনে আমার দেশের শ্রমজীবী মানুষদেরকে আমি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্যে বলিষ্ঠ ভূমিকায় নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনারা অতীতে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনেপ্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোনো শ্রেণীবিশেষের ভোগ-লালসার জন্যে এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে

সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই, তবু লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে ৭ কোটি দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ এবং বিদেশীদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশীরা দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলে নি। এর পরে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাবমোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্যে আমাদের সাধ্যমতো আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্যে বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদককে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথম বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ১৬ কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষিদের ১০ কোটি টাকার তাকাভি ঋণ, ১ লাখ ৯০ হাজার টন সার, ২ লাখ মণ বীজধান দেয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে ৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্কুলঘর পুনর্নির্মাণ ও ছাত্র-শিক্ষকদের সাহায্যের জন্যে প্রায় ১০ কোটি টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭টি রেল সেতুর মধ্যে ২৬২টির এবং ২৭৪টি সড়ক সেতুর মধ্যে ১৭০টির মেরামত কাজ ইতোমধ্যেই শেষ করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ বর্ষার আগে শেষ করার জন্যে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাংক, বীমা এবং শিল্প-ব্যবসায়ে চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। কারখানার উৎপাদন প্রায় থেমে গিয়েছিল। দক্ষ পরিচালকের অভাব, খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টানাটানি শিল্পজীবনে নিশ্চলতা এনে দিয়েছিল। শূন্য হাতে সরকার ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবিনিয়োগ সংস্থা এবং শিল্প কারখানাগুলোকে সক্রিয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত

নিয়েছি। অতীতে কতিপয় সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করতো। বর্তমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেন। এই জন্যই সরকারের উপর অত্যন্ত গুরুভার সত্ত্বেও আমরা চলতি বৎসরের ছাব্বিশে মার্চ আমাদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন ব্যাংক-বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্প, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প কারখানার একটা বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরাপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে, তাঁদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের ভোগের জন্যে সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না। এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গির ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদের অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষি ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া দেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। এক কথায়, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয়।

শ্রমিকরা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য আমি ইতোমধ্যেই শ্রমিক নেতাদের সাথে শিল্পকারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি স্কিম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের যেমন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হচ্ছে, তেমনি সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির

মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় বেতন কমিশন' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি চাকুরির এই নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরা জাতীয় পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দুর্মূল্য আমাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।

জনগণের জানা আছে, আমদানি কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব হয়েছে। যুদ্ধে বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিছু সংখ্যক এজেন্ট অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীরা পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে বেশ খানিকটা কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। মে মাস নাগাদ আরো তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টন খাদ্যশস্য আসছে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত সাড়ে সাত লক্ষ টন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আমাদের প্রায় সাত লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেবার আশ্বাস দিয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্যের দাম ক্রমান্বয়ে কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। খাবার, তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম আরো কমে যাবে।

আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান

খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সাথে সাথে কম বেতনের লোকদের জন্য আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন, জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলেই জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা ইতোপূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি। সেই সাথে আমরা মনে করি এই দুর্মূল্যের বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নিম্ন আয়ের মানুষদের কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া দরকার। আপনাদের সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশের গরিব সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। স্বায়ত্তশাসিত ও অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পুলিশ, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, দেশরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও শ্রমিকরা এই বাড়তি সাহায্য পাবেন। আজ থেকে এটা কার্যকরী হবে এবং আগামী পহেলা জুনের বেতনের সাথে আপনারা এই বাড়তি টাকা পেয়ে যাবেন। যে সকল সরকারি কর্মচারী প্রতি মাসে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতন পান তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে সরকার এই হারে সাহায্যদান মঞ্জুর করেছে :

১. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২৫ টাকা।
২. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।
৩. মাসিক বেতন ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ৯৫ টাকা :
   ক. এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।
   খ. যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে।

যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হতে বেতন পান বা যাঁরা ওয়ার্ক চার্জড্ এবং কনটিনজেন্ট কর্মচারী, তাঁদের বেলায়ও এই আদেশ প্রযোজ্য হবে। এই সাময়িক সুবিধার কোনো অংশই বেতন হিসেবে গণ্য হবে না।

যে সকল শ্রমিক সরকারি মালিকানাধীন কর্পোরেশন, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি তত্ত্বাবধানের অধীন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন ও মাসিক ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে এই হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে :

১. মাসিক মজুরি ১২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২৫ টাকা।

২. মাসিক মজুরি ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।

৩. মাসিক মজুরি ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ১৫ টাকা :

ক. এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।

খ. যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে।

এই সুবিধা স্থায়ী, অস্থায়ী, বদলী ও ওয়ার্কচার্জড্ শ্রমিকরাও পাবেন।

সরকারের মালিকানাধীন বা তত্ত্বাবধানাধীন চা বাগানের শ্রমিকরা এই হারে এসব সাময়িক সুবিধা ভোগ করবেন :

ক. দুই সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ২০ টাকা পাবেন।

খ. এক সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ১০ টাকা পাবেন।

আমি বিশ্বাস করি, এই পদক্ষেপগুলো আপনাদের বর্তমান দুর্দশার কিছুটা লাঘব করবে। অবশ্য জনগণের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন এই বেতন বৃদ্ধির উপর কোনোক্রমেই নির্ভরশীল নয়। সেটা তখনি সম্ভব হয়ে উঠবে, যখন আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত এবং কারখানাগুলো পুরোমাত্রায় চালু হবে। আমরা এ পর্যন্ত কোনো নতুন কর, খাজনা ধার্য করি নাই। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এই বেতন বাড়াবার জন্যে সরকারকে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধাণের সুবিধা দেবার জন্যে ইতোপূর্বে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বকেয়া সুদ-খাজনা ও কর মাফ করে দেয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি।

আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাব। এ দেশের চাষি, তাঁতী, কামার, কুমার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব। আমার পার্টির সহকর্মীগণ এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে। ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুজবার জন্যে নেই এতটুকু ঠাঁই। ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সবকিছু নাই করে দিয়ে গেছে। তবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্যে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক বিদেশী এজেন্ট ও দুষ্কৃতকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ, আপনারা এই সাম্রাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী জায়গায় জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করছে। আপনারা তাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমি আপনাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবো না। আপনারা জানেন আমি একবার কোনো অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও পালন করতে চেষ্টা করি। আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করি নি যে, রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবো। সমৃদ্ধির পথে কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার নেই। শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরো আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারবে। খোদ আমাদের সহায় আছেন।

জয় বাংলা।

আমার কর্তব্য আমি করব

১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস, ডাকাতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। উক্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।

আমি জানি, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন। আমি জানি, রৌদ্রের মধ্যে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আপনারা শান্ত হোন। আপনারা জানেন, ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে। আজ প্রথম আপনাদের কাছে জেল থেকে বেরোবার পর আমি রাজশাহীতে এসেছি। আমি বক্তৃতা শুরু করবার আগে আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করবেন। আসুন, প্রথমে বক্তৃতা শুরু করার আগে তাঁদের আত্মার জন্যে দোয়া করি আমরা।

আমার ভায়েরা ও বোনেরা, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু বড় ত্যাগের বিনিময়ে। এতো রক্ত কোনো দেশের জন্য কোনোদিন কোনো জাতি দেয় নি, যা আজ আমার বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে। আজ ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। জালেমরা রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। চালের গুদাম ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার সরকারি কর্মচারীদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার পুলিশ ভাইদের, বিডিআর, সামরিক বাহিনীর ছেলেদের গুলি করে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে আমার ছাত্র, আমার যুবক, আমার কৃষক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার সাংবাদিকদের।

আপনারা রাজশাহীর জনসাধারণ, আপনারা তা জানেন। আপনারা নিজেরা ভুক্তভোগী। এই রাজশাহীর উপর দিয়ে তাণ্ডবলীলা চলেছে। বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় এই তাণ্ডবলীলা চলেছে।

আমি জানতাম না যে, আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমাকে ২৫ তারিখে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আমার ভাইদের ওপর মেশিনগান চালানো হয়। আমি মরে গেলেও আমার দুঃখ হতো না, কেননা আমার বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়েছে। আমার আত্মা দেখতো। বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না যে, আপনাদের

সাথে আমার আর জীবনে দেখা হবে। আমি জানতাম না যে, বাংলার মাটিতে আমি আবার ফিরে আসবো। আমি জানতাম না যে, আপনাদের মুখ আমি আর দেখতে পাবো। আমি জানতাম না যে, জীবনে কোনোদিন আর এই সোনার দেশে সোনার বাংলায় আমি ফিরে আসতে পারবো। আপনারা দোয়া করেছেন, আপনারা রক্ত দিয়েছেন, আপনারা সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামের ফল হিসেবে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে মাত্র ৪ মাস পূর্বে বাংলার মাটিতে এসেছি। এসে কি দেখলাম! দেখলাম চারদিকে হাহাকার। এসে দেখলাম গৃহহারা, সর্বহারার আর্তনাদ। এসে দেখলাম লাখ লাখ লোক বেকার। এসে দেখলাম আমার মা-বোন কাঁদছে। হত্যা করা হয়েছে কারো স্বামীকে, কারো ছেলেকে, জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঘর, ধ্বংস করে দিয়েছে বাজার, গ্রাম-কে-গ্রাম। রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে, স্টিমার ভেঙ্গে দিয়েছে, অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে। লুট করেছে বৈদেশিক মুদ্রা। কিছু রেখে যায় নি, ভস্মীভূত একটা দেশ ছাড়া।

আপনারা আমাকে ভালোবাসেন–আমি আপনাদের ভালোবাসি। আমি যাবার বেলায় বলেছিলাম, আমি যদি মরে যাই, আমি যে ডাক দিয়ে যাব–আমার বাংলার মানুষ অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে। আপনারা তা করেছেন। আপনারা বিনা অস্ত্রে জালেমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলার মাটি থেকে বর্বরের দল চলে গেছে। কিন্তু ধ্বংস করে দিয়েছে আমার সব কিছু। ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলা একদিন হাসবে। ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলার মানুষ একদিন পেট ভরে ভাত খাবে। ইন্‌শাল্লাহ্ বাংলার মানুষ আবার সুখী হবে। শোষণ বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। ভাইয়েরা আমার, আজ আপনাদের আমি কিছুই দিতে পারি না। আমি কিছুই দিতে পারবো না। যারা আপনাদের ধোঁকা দেয় তারা দিতে পারে, আমি ধোঁকা দিতে পারি না।

আপনারা জানেন, জীবনে আমি কোনো দিন মিথ্যা ওয়াদা করি নাই। আমি জীবনে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্যে রাজনীতি করি নি। একদিকে ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন, আর একদিকে ছিল আমার ফাঁসির ঘর। আমার বাংলার জনগণকে মাথা নত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসিকাষ্ঠ বেছে নিয়েছিলাম।

আমি কি চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। আমি কি

চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক। কিন্তু বড় দুঃখ পাই, জালেমরা কিছুই রেখে যায় নি। সমস্ত নোটগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা, বিশ্বাস করুন, যেদিন আমি এসে সরকার নিলাম–এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রাও পাই নি।

১ কোটি লোক–১ লাখ, ১০ লাখ, ৫০ লাখ নয়; ১ কোটি লোক বাংলাদেশে তাদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে, মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। মহীয়সী নারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের জনসাধারণ আমার দেশের লোককে ভাত দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। আমার মুক্তিবাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল, যে অস্ত্র দিয়ে পাষণ্ড ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা। কত ছেলে যে আজ মারা গেছে। ৩০ লাখ, ১ লাখ-২ লাখ নয়। আজ যখন আমি এখানে এলাম; আমার বোনেরা আমার কাছে এল– তাদের স্বামীকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আমি যখন গ্রামে যাই, আমি দেখতে পাই চারদিকে শুধু চোখের পানি। মানুষ এতোবড় নির্দয় হতে পারে, মানুষ এতো বড় পাষণ্ড হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় নি। শুনেছি নমরুদের নাম, শুনেছি ফেরাউনের নাম, শুনেছি হিটলারের নাম, শুনেছি চেঙ্গিস খাঁর নাম। কিন্তু সব খানদেরকে পরাজিত করেছে ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যবাহিনী। তারা এসেছিল ইসলামের নামে, তারা এসেছিল মুসলমানের নামে।

শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, ২ লাখ মা-বোনকে আমি উদ্ধার করেছি, যাদের উপর ইয়াহিয়ার সৈন্যরা পাশবিক অত্যাচার করেছে। আপনারা কি বিনা অস্ত্রে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি? বলছেন পারবেন না, এই গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে?

ওরা আমার শতকরা ৬০ ভাগ পুলিশকে হত্যা করেছে। শতকরা ৫০/৬০ ভাগ বিডিআরকে হত্যা করেছে। অর্ধেকের মতো বাঙালি সৈন্য হত্যা করেছে।

পুলিশরা আপনাদের ভাই। আপনারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এবারও তারা অস্ত্র ধরবে। আমি চাই যে, জনগণ তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার দুশমনদের সঙ্গে আমার আপোস নেই। ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এসেছে, সে স্বাধীনতা আমি নষ্ট করতে দিতে পারি না।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি ১৬ কোটি টাকা দিয়েছি টেস্ট রিলিফের কাজে। আপনারা গ্রামে গ্রামে টেস্ট রিলিফের কাজ করেন এবং কেউ যেন এই টাকা চুরি করতে না পারে। ২ লাখ মা-বোন! বলুন, এদের আমি কোথায় কি করবো? কি করে আমি বাঁচাবো? কি করে আমি খাবার দেবো? আমার গুদামে চাল নাই। আমার তহবিলে পয়সা নাই। কিন্তু আমি মানুষের দুঃখ সহ্য করতে পারি না। তাই প্রথমে আমি বলে দিলাম, টাকা নাই ঠিক, কিন্তু গরিবকে অত্যাচার করে খাজনা আদায় করা চলবে না। তাই যত বকেয়া খাজনা ছিল আমি চিরদিনের জন্যে মাফ করে দিয়েছি। লবণের ওপর কর থাকতে পারে না। আমি তা তুলে নিয়েছি।

এই ময়দানে একবার আমি একটা কথা বলেছিলাম, আপনাদের তা মনে আছে কিনা জানি না। আমি যদি বেঁচে থাকি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ হয়ে যাবে।

আমি মাফ করে দিয়েছি। প্রায় ৭০ কোটি টাকা আমি মাফ করে দিয়েছি। বলুন, আমি টাকা পাবো কোথায়? আমার গুদামে চাল নেই। গত বছর মানুষ কৃষিকাজ করতে পারে নি। সাড়ে ৭ লাখ টন চাল ভারত সরকার এবং মিসেস গান্ধী দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন এবং পাঠাচ্ছেন। জাতিসংঘ থেকে আমরা খাবার পাচ্ছি। বিভিন্ন দেশ থেকে খাবার আমি কিনছি। আনবো কি করে? জাহাজ কোথায়? বর্বররা জাহাজ পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে গেছে, যাতে অন্য জাহাজ না আসতে পারে। রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে জাহাজগুলো তুলছি। জাতিসংঘ আমাকে ৬ লাখ টন চাল দেবে। এছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশকে বলছি, আমার লোককে বাঁচাও, আমার লোককে খাবার দাও। আমার দেশের লোক মরে গেল। খাবার দাও। দুঃখ হয় কি জানেন? আমি ভিক্ষা করে চাল নিয়ে আসি, আমি গ্রামে গ্রামে পাঠাই, আর চোরাকারবারী সে মাল চুরি করে খায়। ইচ্ছে হয়, ওদের পেটের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে আমি কালোবাজারীর পয়সা বের করে আনি। বাংলার জনগণ বিনা অস্ত্রে মোকাবিলা করেছে ইয়াহিয়ার সৈন্যদের। পারবেন না শেষ করতে? আমি তো অস্ত্র দিয়ে যাই নি, আমি তো পয়সা দিতে পারি নি। আমি তো দিয়েছিলাম শুধু আদর্শ, দিয়েছিলাম স্বাধীনতার ডাক।

বাংলা আজ স্বাধীন হয়েছে। আজ বাংলার পতাকা উড়ছে। দুনিয়ার প্রায় ৭০টা দেশ আমার বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে। আজ এই পতাকা দুনিয়ার দেশে দেশে ওড়ে। আজ আমি মনে শান্তি পাই যে, আমি আপনাদেরকে দেখতে পাই। কিন্তু শান্তি আমার নাই। আমার পয়সা নাই। গরিব কর্মচারী না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি কি করবো? আমি বললাম, ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দাও। তাতে আমার ৪০ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। পাবো কোথায়? ট্যাক্স কোথায়? খাজনা কোথায়? কোথা থেকে আসবে? কার কাছ থেকে আনবো? কিভাবে দেবো? রাস্তা নেই। আনতে সময় তো লাগে। স্কুল-কলেজ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছে। কেমন করে ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে? বই পর্যন্ত নেই। ল্যাবরেটরি নেই। টেবিল-চেয়ার নেই। কি করে ছেলেরা লেখাপড়া করবে? ১০ কোটি টাকা দিয়েছি আমি তাদের জন্যে। আমি কোথায় পাবো? কি করে দেবো? আমার তো কিছু নেই। আমি গরিব মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারি না। আজ পর্যন্ত তো আমি এক পয়সা ট্যাক্স বাড়াই নি। তাহলে চলবে কি করে? আপনাদের কাজ করতে হবে। ছেলেদের কাজ করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। দুশমনরা বসে নেই। দুশমনরা খেলছে। দুশমনরা পয়সা লুটছে।

বাংলাদেশে দালাল ছিল, রাজাকার ছিল। ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে ওরা আমার লোককে হত্যা করেছে। কিছু ধরেছি। আরো কিছু ধরার চেষ্টায় আছি। আপনারা খবর দেবেন–তাদের ধরা হবে। আমি বলেছি, অমুক তারিখের মধ্যে অস্ত্র জমা দিয়েছে। এখনো দু'চারজন যারা অনেকে নিজেকে মুক্তিবাহিনী বলেন, অথচ তারা মুক্তিবাহিনীর লোক নন, তারা অস্ত্র জমা দেন নি। তারা ১৬ তারিখের পরে আচকান বদলিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গিয়েছেন। রাতে তারা সেই অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে, মানুষকে খুন করে। আমি দিয়েছি ১০ কোটি টাকার ঋণ, যাতে মানুষ গরু কিনতে পারে এবং হালচাষ করতে পারে। আমরা তো আল্লাহ্‌র মর্জি কম নই– সাড়ে ৭ কোটি। ঐ ১০ কোটি, ৫ কোটি কিছু না। কিন্তু দেবো কোত্থেকে আমি? পাবো কোথায়? কার কাছ থেকে আনবো? টাকা আমি পেতে পারি। টাকা আমি আনতে পারি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বংশধরকে গোলাম করে সেই পয়সা আমি মানুষের কাছ থেকে আনতে চাই না। আমি চাই না যে বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধর গোলাম হয়ে যাক। যে যা বলুক না কেন, আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমি

আপনাদের ধোঁকা দিতে পারবো না। কারণ আমি গদির জন্যে রাজনীতি করি নি। আমি মরবার জন্যে রাজনীতি করেছিলাম। আমি আপনাদের ১০০ কোটি টাকার মতো রিলিফ দিয়েছি। তবুও আমি বলেছি, আমি তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারবো না। আপনারা যদি রাজি থাকেন, তবে হাত তুলে দেখিয়ে দেন। হাত তুলুন, দু'হাত তুলুন। (উপস্থিত জনসাধারণ দু'হাত তুলে সায় দিলো।) আমি বলছি, ইনশাল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনাদের আমি এনে দেবো–মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু কষ্ট করতে হবে। কষ্টে থাকতে হবে। এই ধ্বংসস্তূপকে যদি একবার খাড়া করতে পারি, ইনশাল্লাহ্ বাংলাদেশের মানুষ কষ্টে থাকবে না। কিন্তু সময় লাগবে। একটা গাছ লাগালে পাঁচ বছরের আগে ফল হয় না।

শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, কাজ করতে হবে। আমি ছাত্র ভাইদেরকে বলি, একটু লেখাপড়া কর। বাবার হোটেলে আর কতো খাবে? পয়সাকড়ি নেই। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে জানি। কিন্তু লেখাপড়া একটু করো। আন্দোলন করো আমার আপত্তি নেই। আমার জন্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তোমাদের একটু মানুষ হতে হবে। মানুষ না হলে দেশ গড়তে আমি পারবো না। ভবিষ্যতে তোমাদের এ দেশের শাসনভার হাতে নিতে হবে। চুঙ্গা ফুঁকাও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মেহেরবানি করে একটু কাজ করো।

কৃষক ভাইয়েরা, চেষ্টা করবো, দুনিয়ার থেকে বীজ ও পাম্প এনে আপনাদের দেবার জন্যে। কিন্তু আপনাদের কাজ করতে হবে। কাজ করে ফসল উৎপাদন করতে হবে। জানেন, কতো লাখ টন বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব? আমি কোথা থেকে দেবো? কেমন করে বাঁচবো? আমার ঘুম হয় না। ৪ মাস হলো আমি জেল থেকে এসেছি–কিন্তু কেমন করে একটা দিন বিশ্রাম করতে হয় তা আমি জানি না। কিন্তু করবো কি? কি করে চালাব? এই রাজশাহী আসলাম। রাস্তাঘাট নেই। মানুষের খাবার নেই। পানি নেই। বন্যায় সব নষ্ট হয়ে যায়। কি করে আমি চালাবো? আমি তো বুঝতে পারি না। আমি তো পাগল হয়ে যাই। আমি কি করে কি করবো? আমার তো চিন্তায় ঘুম হয় না। ভাইয়েরা আমার, আপনাদের কাজ করতে হবে। কাজ না করলে কোনো কিছুই হবে না।

একটা কথা আমি বলে দেবার চাই। একদল লোক এখন বেরিয়েছে যারা মাঝে মাঝে এটা বলে, ওটা বলে। যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল, তাদের চেহারা দেখা যায় নি। তারা পালিয়ে ইয়াহিয়ার দালালি করেছে। এরা মনে

করেছে শেখ মুজিবুর কিছু বলে না। বড় দয়ালু লোক। আমি সত্যিই দয়ালু লোক। কিন্তু গরিবকে যদি কেউ শোষণ করে, তখন আমি দয়ালু নই।

আর একদল লোক বের হয়েছে। তারাও এটা-ওটা বলছে। কোথায় ছিলেন? ঘুমিয়ে ছিলেন আরামে। এখন এ-কথা সে-কথা বলেন। জীবনে কোনো কাজ করতে পারে নি। মরবার আগে করতেও পারবে না। খালি মাঝে মাঝে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে হা হা এটা হলো না, ওটা হলো না। এসো কাজ করো। তোমাকে মানা করছে কে? একটা গ্রামে যাও। গ্রামের লোককে পেট ভরে খাবার দাও। আমি তো মানা করছি না, তবু কেন বলো কিছু হলো না। এ কারণেই বলতে হয় মার পোড়ে না, পোড়ে ডাইনীর।

ভাইয়েরা আমার, আমার এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা আর থাকতে পারবে না। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি জানি। আমি জানি আপনারা আমার কথা রাখবেন। আমরা বাঙালি। আমরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছি। আমরা বাঙালি। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা আর পাকিস্তানী নই। আমরা আর কোনো দেশের মানুষ নই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ–আমরা বাঙালি।

সমাজতন্ত্র ছাড়া বাংলার মানুষ বাঁচতে পারবে না। সেই জন্যে সমাজতন্ত্র কায়েম করার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বড় বড় ব্যাংক ছিল। ভুঁড়িওয়ালাদের ব্যাংক। আল্লাহ্‌র মর্জি ঐ ব্যাংক এখন সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ব্যাংক। বীমা কোম্পানি আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়–সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ব্যাংক। সেই আইন আমি পাস করে দিয়েছি।

বড় বড় কাপড়ের কল। বড় বড় চটকল। বড় বড় চিনির কল। আমি জাতীয়করণ করে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সম্পত্তি করে দিয়েছি। আপনাদের এর সুফল ভোগ করতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু এ সম্পত্তি আর ২/৫ জনের নয়। এই সম্পত্তি আমার বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি। কোনো লোক ১শ' বিঘার ওপর জমি রাখতে পারবে না। এতে যে জমি উদ্বৃত্ত হবে, তা ভূমিহীন গরিবের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে। খাসমহলের জমি গরিবকে ছাড়া কাকেও দেওয়া হবে না।

আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্ম-কর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্ম-কর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেয়া হবে না।

পশ্চিমারা ২৩ বছর ইসলামিক ট্যাবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে। আপনারা জানেন? খবর রাখেন? এই বাংলা থেকে ২৩ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা পশ্চিমারা আমার কৃষকের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে।

আজ ৪ লাখ লোক পশ্চিম পাকিস্তানে আটক রয়েছে। আমি বললাম, ওদের ছেড়ে দাও। ভুট্টো সাহেব ছাড়ছেন না। ভুট্টো সাহেব! ছাড়তে হবে। ওদের আমি ইনশাল্লাহ্‌ আনবো বাংলার মাটিতে। ওরা ফিরে আসবে এই মাটিতে। আপনি ছাড়বেন না? আপনি তো মুজিবুর রহমানকেও ছাড়তেন না। আপনি মনে করেছেন আপনার সেন্যরা আমার মা-বোনের উপর অত্যাচার করেছে, আমার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার ছেলেদের হত্যা করেছে, পশুর মতো গ্রাম-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে–আমি তাদের মাফ করে দেবো? আমি যদি বেঁচে থাকি, ভুট্টো সাহেব, এই বাংলার মাটিতে তাদের বিচার হবে, কেউ রুখতে পারবে না। আমি কারো কথা শুনবো না। তুমি যতই দুনিয়া ভরে চিৎকার করে বেড়াও না কেন–যারা আমার মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার দুধের বাচ্চাকে গুলি করে হত্যা করেছে, যারা আমার গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা আমার সেপাই-পুলিশকে হত্যা করেছে–এই বাংলার মাটিতে ওদের বিচার হবে, যদি শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকে। মনে করেছো তোমাদের কথায় ভয় পাই। আমার সাথে খেলবার চেষ্টা করো না। দরকার যদি হয়, আমি আমার বাংলার মানুষকে ডাক দিয়ে অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করবো। কিন্তু বেঈমানের কাছে মাথা নত করবো না।

ভাইয়েরা আমার, আমি কিছুই দিতে পারবো না। ধোঁকা আমি দিই না। ধোঁকা আমি দেবো না। মিথ্যা ওয়াদা আমি করি না। আমার হাতে কিছুই নেই। ভাইয়েরা, আমি পেয়েছি, আমার যা পাবার। আমার চেয়ে বেশি কোনো দেশের কোনো নেতা কোনো দিন পান নি। সেটা হলো আপনাদের ভালোবাসা। যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা আমাকে দোয়া করুন, আমি যেন সেই ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। আমার পাবার মতো আর কিছুই নেই। প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কিছুই না। ওটা নিতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে স্বাধীনতা আন্দোলন করি নি। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে যাই নি। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসতাম। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমি বাংলার আকাশকে ভালোবাসি। আমি বাংলার বাতাসকে

ভালোবাসি। আমি বাংলার নদ-নদীকে ভালোবাসি। আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে। কিন্তু আমার হাতে তো কিছুই নেই। আমার হাতে তো আলাদিনের প্রদীপ নেই। আমি আপনাদেরকে কোথা থেকে এনে দেবো। আমাকে চেষ্টা করতে হবে। ধ্বংসপ্রায় একটা দেশের মধ্যে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। একে গড়তে হবে। চাই ত্যাগ ও সাধনা। ত্যাগ এবং সাধনা ছাড়া এ দেশকে গড়া যাবে না। সবুর করতে হবে। সহ্য করতে হবে। কাজ করতে হবে। যুবক ভাইয়েরা, তোমরা আমার গরিব ভাইদেরকে লুট করে খাবার চেষ্টা করো না। তোমরা চেষ্টা করো, যাতে ওরা সুখী হয়। কিছু কিছু যুবক অস্ত্র নিয়ে রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করে। মনে করো না যে, আমরা খবর রাখি না। খবর আমাদের কাছে আসবে ঠিকই, সময়মতো আসবে। তোমাদেরকে আমরা ধরে ফেলবো। এমন ধরা ধরবো যেদিন দুনিয়ায় আর মুখ দেখাতে পারবে না। তোমরা অনেকে ভদ্রলোকের ছেলে বলে দাবি করো। অনেকে শিক্ষিত বলে দাবি করো। কিন্তু আমি জানি ২/১টা পিস্তল আছে। বের করে ফেলবো। আপনারা খবর দেবেন থানায় থানায়। খবর দিবেন? (জনতার হাঁ-সূচক জবাব) আমিও পুলিশদের বলে দিচ্ছি, গুণ্ডাপাণ্ডা যদি বন্দুক নিয়ে কোনো লোককে আক্রমণ করে–এক মিনিট দেরি করো না, জনগণের সহযোগিতায় এদের ধরবে। আমার হুকুম, গুলি করে এদের নিশ্চিহ্ন করবে। আমি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা চাই। আমি চাই, মানুষ আরামে ঘুমাক। পেটে ভাত না থাকলেও আরামে ঘুমাতে হবে। এরা বন্দুক নিয়ে গ্রামে যায়। একটা গরিবের ঘরে গিয়ে লুটপাট করে নিয়ে আসে। এটা 'ফ্যাশন' হয়ে গেছে? না। ফ্যাশন! মনে করেছে বুঝি আমি খুব দয়ালু? বেশি দিন দয়ালু থাকবো না ভাই। একবার যদি নেমে পড়ি জীবনে আর ফিরি না। তাই তোমাদের কাছে আবেদন করি, বন্দুকখানা আর ব্যবহার করো না। পানিতে ফেলে দিও না, আমার কাছে ফেলে দাও। তা না হলে বিপদ আছে। আমার রাজশাহীর ভাইয়েরা, আপনারা অনেক কষ্ট করে এসেছেন। আমার ভাই কামরুজ্জামান বক্তৃতা করার কথা ছিল। তিনি বক্তৃতা করতে পারলেন না। আপনারা অনেক জায়গা থেকে কষ্ট করে এসেছেন। আর আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগের মতো আর বক্তৃতা করতে পারি না। আর যখন আপনাদের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে ১ কোটি মানুষের কথা, যাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ইয়াহিয়া খাঁ, তখন আমার বুক ভেঙ্গে যায়। গত চার মাসে

এরা ফিরে এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। এই ১ কোটি মানুষের ঘরবাড়ি নেই। আর ২ কোটি মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে পশুরা। বলুন তো, আমি কি করে এদের ঘরবাড়ি দেবো? কোথায় পয়সা পাবো? যার ঘর নেই, তার ঘর আপনারা চেষ্টা করে তৈরি করে দেবেন। যার খাবার নেই, নিজে একবেলা খেয়ে তাকে খাবার দেবেন। এটাই হলো মনুষ্যত্ব, এটা হলো মানবতা। এটা হলো ভ্রাতৃত্ব। আমি আশা করি, তাই আপনারা করবেন।

আপনারা গরমের মধ্যে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ্ আবার দেখা হবে। আপনারা কাজ করুন। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, আমার সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। আপনারা শান্তি রক্ষা করুন এই কামনা করি। আমার কর্তব্য আমি করবো। আপনাদের কর্তব্য আপনারা পালন করুন। জয় বাংলা।

আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি

১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক ৭ জুন তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্মৃতিচারণ করে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার বিবরণ নিচে উদ্ধৃত হলো।

আজ ৭ জুন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৬৬ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগ ছয় দফা ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণায় সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠী ক্ষেপে গিয়েছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আমরাও তাদের বুঝতে পেরেছি। তারা জানতে পেরেছিল, বাঙালিদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই আইয়ুব খান ও মোনেম খান তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমি তখন কারাগারে বন্দি হয়ে যাই।

আপনাদের নিশ্চয়ই আরো মনে আছে, আমাকে যশোরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তারপর যশোর থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ঢাকা থেকে আমাকে সিলেট নেয়া হয় এবং সেখানেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিলেট থেকে ময়মনসিংহে নেয়া হয় এবং ময়মনসিংহেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনি করে গ্রেপ্তারের পালা চলে। সঙ্গে সঙ্গে ৭ মে তারিখে আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন, জহুর আহমেদ চৌধুরী, খোন্দকার মুশতাক আহমদ প্রমুখ নেতাও গ্রেপ্তার হন। পরে আমার সহকর্মী বন্ধু মিজানুর রহমান চৌধুরী, শামসুল হক, মোল্লা জালালুদ্দিন, মনসুর আলী, মরহুম আব্দুল আজিজ (চট্টগ্রাম), আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্র ও শ্রমিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

শুধু তাই নয়। ৭ জুন তারিখে, তেজগাঁও ভিক্টোরিয়া পার্ক, নারায়ণগঞ্জ, মুক্তাগাছা এবং আরো অনেক জায়গাতে গুলি করে আমার শত শত ভাই-বোনকে হত্যা করা হয়। আইয়ুব খান মনে করেছিলেন, গুলি করে বাঙালিদের দাবিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নাই। সেই দিনেই শুরু হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম। অনেকে হয়ত বুঝতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা জানতাম, এ ব্যাপার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই জন্যে ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়ে নেয়া হয়।

এরপরে আমি যখন গ্রেপ্তার হয়ে চলে যাই, আমার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী সভাপতি হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর যিনিই আওয়ামী লীগের সভাপতি বা সম্পাদক হয়েছেন, তাঁকেই গ্রেপ্তার করে জেলে দেয়া হয়েছে।

তারপরেও ষড়যন্ত্র হয়। আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করে তার মধ্য থেকে একদলকে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সরিয়ে নিয়ে যান। তাতেও আমাদের দাবাতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। আপনাদের সব ইতিহাসই মনে আছে। সেইদিনও আপনারা শুনেছেন, অনেক দল আইয়ুব খানের টাকা খেয়ে ৬ দফা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আপনাদের একথাও জানা আছে যে, ৭ জুন তারিখে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল।

তারপর আসুন ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনাগুলোর কথায়। সে সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগও আন্দোলনে যোগদান করে এবং তাতে নেতৃত্ব দেয়। তারপর আইয়ুব খান আগরতলা মামলা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সেদিনও আমার দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। রক্ত আমাদের অনেক দিতে হয়েছে। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য যত রক্ত দিতে হয়েছে, কোনো দেশ, কোনো জাতি তা দেয় নাই।

আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। লোকে বলে, মানুষের স্মৃতিশক্তি নাকি দুর্বল। সে নাকি অল্প দিনেই সব ভুলে যায়। কিন্তু কেমন করে ভুলবে? ২৩-২৪ বছর আওয়ামী লীগকে নিয়ে আমি সংগ্রাম করেছি। এই সময়ের মধ্যে মাত্র ১২-১৩ মাস সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্ষমতায় ছিলেন। সর্বক্ষণই উজানে আমাদের নৌকা বাইতে হয়েছে এবং বারবার গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে। সে ইতিহাস আজো অম্লান রয়েছে।

তারপর যখন নির্বাচনে আপনারা আমাকে ভোট দিলেন, তখনো একদল লোক নির্বাচন বানচাল করবার চেষ্টা করেছিল। আমি বলেছিলাম, দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, বাংলার মানুষ এক, বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়, বাংলার মানুষ তাদের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার আমাকে দিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে এসব প্রমাণও হয়ে গেল, কিন্তু ষড়যন্ত্র বন্ধ হলো না। ইয়াহিয়া খান সাহেব এসে গদিতে বসলেন। অর্থাৎ এক খান গেলেন আর এক খান এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব এসে শুরু করলেন নির্বাচনের কথা।

মিষ্টি কথা, ফিসফিস কথা, ছোট ছোট কথা, বড় বড় কথা। আর, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাড়াতে লাগলেন বাংলার বুকে, আমার উপর আঘাত হানার জন্যে। আমরা প্রস্তুত হলাম। আমরাও এখানে দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম ৩ জানুয়ারি তারিখে, যে আদর্শে বাংলার মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে তাতে আপোস নাই।

আপনারা জানেন, ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি মনে করেছিলেন, আমাকে প্রধানমন্ত্রী বললেই আমি গলে গদগদ হয়ে যাবো আর আমার দাবি ছেড়ে আমি তাঁর সাথে হাত মেলাবো। কিন্তু তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানতেন না। আওয়ামী লীগকেও জানতেন না। তাঁর এটাও জানা ছিল না যে, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে মুজিবুর রহমান রাজনীতি করে নাই। আমি রাজনীতি করেছি বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্যে, বাংলার মানুষকে বাঁচাবার জন্য, শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্যে। আমি রাজনীতি করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে। বাংলার মানুষ যাতে মানুষের মতো দুনিয়ায় দাঁড়াতে পারে তার জন্যে এবং বাংলার সম্পদ যাতে পশ্চিমারা লুট করে খেতে না পারে তারই জন্যে আমি সংগ্রাম করেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে সংগ্রাম করি নাই।

এরপর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন এবং তার পরের ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। সে সবের আলোচনায় আপনাদের বেশি সময় আজ আমি নেবো না। কারণ আরও অনেক কথা আপনাদের বলতে হবে। জেল থেকে বের হয়ে এখানে এসে আমি সামান্য কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সেদিন আমি বেশি কিছু বলতে পারি নাই। কারণ, মাঝে মাঝে আমার চোখে পানি এসে গেছে। তার পরে ভারতের মহীয়সী নারী মিসেস গান্ধী যখন এখানে আসেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আপনাদের সামনে এসেছিলাম এবং কয়েক মিনিট বক্তৃতা করেছিলাম। তিনি অতিথি। তাঁর সামনে অন্য কথা বেশি বলা যায় না।

আজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের জানা দরকার। ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে। ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী আমার উপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাতে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল সেটা কেবল আমিই জানি। আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু বাংলার মাটিকে আমি ছাড়তে পারি নাই। রাত ১১টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে, আওয়ামী লীগের

নেতাদের হুকুম দিলাম, 'বের হয়ে যাও। যেখানে পার, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। খবরদার, স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেও।'

রাতে আমি চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠালাম। আগে যাকে ই.পি.আর.বলা হতো, তাদের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রাম। পিলখানা হেডকোয়ার্টার তখন শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। ওদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম না তখন আমি চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা বাংলার সব জায়গায় অয়ারলেসে এ খবর দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সেনাবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, ছাত্র হোক, যে যেখানে আছে, পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন। তারা আমার কথা মতো খবর পৌঁছিয়েছিল।

সে রাতে কেবল বাড়িতে নয়, রাজারবাগ, পিলখানা, আওয়ামী লীগের অফিস আর ছাত্রাবাসও আক্রমণ চলে। বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। রাজারবাগের পুলিশরা ৬ ঘন্টা ৩০৩ রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিন-চারটি ব্যাটেলিয়ন ছিল। হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের অর্ধেককে মেরে ফেলা হয়।

এমনি করে সমস্ত বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক-কৃষকদের মেরে ফেলা হয়। আমার সহকর্মীরা পালিয়ে মুজিবনগরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাঁরা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন সরকার কায়েম করে। নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হন আর তাজউদ্দীন হন প্রধানমন্ত্রী। মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খোন্দকার মুশতাক আহমেদকে নিয়ে সরকার গঠিত হয়।

এখন যাঁরা সমালোচনা করে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন তাঁদের কাউকে এসব কাজে দেখা যায় নাই। তাঁদের কেউ যুদ্ধে এগিয়ে আসেন নাই। তাঁরা কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে বেড়াতেন। অথচ আওয়ামী লীগের নেতারা তখন মুজিবনগরে বসে আবার সকলকে একতাবদ্ধ করে যুদ্ধ শুরু করেন। সারা দুনিয়ায় লোক পাঠিয়ে বাংলাদেশের কথা জানিয়ে দেন। সে সময়ে বাংলাদেশ থেকে ১ কোটি লোক পালিয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম আর ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে দেশ ছেড়ে চলে যায়। তখন ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লাশ। সারা বাংলার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লাশ। নদীতে লাশ, ঘরে ঘরে লাশ। মানুষের মা-বোনের আর্তনাদ। চারদিকে হাহাকার, সর্বহারার আর্তনাদ। তবু সেদিন

সমালোচকদের কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নাই। তারা বরং ইয়াহিয়া খানের দালালি করেছে।

তার পরের যুদ্ধের ইতিহাস আপনারা জানেন। পাক বাহিনী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল। লোক দেশত্যাগ করলো। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হলো। শ্রমিক আর ছাত্রদের গুলি করে মারা হলো। আজ অনেকেই সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন আর এমসিএ-দের এবং আওয়ামী লীগকে গালি দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ত্যাগের কথা কারো মুখেই শোনা যায় না। আওয়ামী লীগের এমসিএ আমার সহকর্মী মসিহুর রহমানকে দুই মাস পর্যন্ত মারতে মারতে হত্যা করা হয়েছে। আমার আর একজন এমসিএ আমীনউদ্দিনকে আধমরা করে জিপের পিছনে বেঁধে তিনি মাইল ঘুরিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমার এক চাচাকে ছয় টুকরো করে ছয় রাস্তার মাথায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। সৈয়দপুরের এমসিএ নজমুল হুদা সরকারকে গুলি করে হত্যা করে দুই ভাগ করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এখন যাঁরা বড় বড় কথা বলেন, তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন? সবাই স্বাধীনতা পেয়ে গেছেন। কিন্তু এ কি চোরাকারবারীর স্বাধীনতা, মুনাফাখোরের আর মজুতদারের স্বাধীনতা? রাজাকারের আর আল-বদরের স্বাধীনতা? আমি কিছু বলি না। এজন্যে কি তারা ভেবেছে আমি নরম মানুষ! আমি নরম মানুষ নই। আমি তাদের খেলতে দিয়েছিলাম।

আমাকে আপনারা 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে আসি নাই। আমি সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে ভালোবাসি। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি আমাকে ভালোবাসে। জীবনে কখনো আমি তাদের সাথে বেঈমানি করি নাই। চারবার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা হয়েছে। তবু আমি মাথা নত করি নাই। তা সত্ত্বেও কেন এতো কথা বলা হয়?

জেল থেকে বের হয়ে আসার পর আমি বলেছিলাম, আমার কর্তব্য বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার পতাকা আজ দুনিয়ার আকাশে ওড়ে। আমার দেশ বাংলাদেশ আজ দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। আজ আমি বলতে পারি, আমি বাঙালি। আজ আমি বলতে পারি, বাঙালি একটি জাতি। আজ আমি বলতে পারি, বাংলার মাটি আমার মাটি। এর বেশি তো আমি চাই নাই। আপনারাও আমাকে সব দিয়েছেন। আপনারা তো আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব তো আমার জন্যে বড় জিনিস নয়। যা কোনোদিন কোনো মানুষ পায় নাই, তা আমি পেয়েছি।

আপনারা যা দিয়েছেন, সে হলো আপনাদের ভালোবাসা। আমাকে আপনারা দোয়া করবেন। আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। এর বেশি কিছুই আমি চাই না।

জেল থেকে বের হয়ে এসে আমি দেখেছিলাম রেলওয়ে ভেঙ্গে গেছে, চালের গুদাম নাই, দোকানে মাল নাই। ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছে। আমি আরো দেখেছিলাম মানুষের কাছে বন্দুক। আমার দেশের লোক আমাকে ভালোবাসে। তাই আমার সহকর্মীরা বললেন, তোমাকেই সবকিছুই ভার নিতে হবে। তার ফলে আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে বাধ্য হলাম। বিশেষ করে এই জন্যে যে, আমার বাংলার স্বীকৃতি দরকার। আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালাম, তোমাদের অস্ত্র ফেরত দাও। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ২ লাখ অস্ত্র আমার হাতে দিয়েছে। অস্ত্র সমর্পণের এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

আমাদের গুদামে চাল নাই। পকেটে পয়সা নাই। পোর্ট ভেঙ্গে দিয়েছে। বাস-ট্রাক পুড়িয়ে দিয়েছে। রেলগাড়ি চলে না। রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে না। চট্টগ্রাম ও চালনা পোর্টের মুখে সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে রেখে দিয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে বাঁচাবো কি করে? দস্যুর দল মানুষ হত্যা করে খুশি হয় নাই। আমার সম্পদ ধ্বংস করে লুট করে নিয়ে গেছে। অথচ আজ একদল লোক এসবের জন্যে ভারতকে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ১ কোটি লোককে মিসেস গান্ধী খাবার দিয়েছিলেন, কাপড় দিয়েছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন। এসব কি তারা দেখে আসে নাই?

আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট ব্রিটেন হোক, কারো এমন শক্তি নাই যে, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রকে বন্ধু বলতে লজ্জা করা উচিত নয়। যেদিন আমার সরকার ক্ষমতায় আসে, সেদিন এক ছটাক চাল ছিল না। আমি তাই ভারতের কাছে চাই। ভারত তখন আমাদের সাড়ে সাত লক্ষ টন চাল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই মধ্যে তাদের কাছ থেকে আমি এক কোটি বাষট্টি লক্ষ মণ চাল পেয়েছি। এই চাল গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়েছে। 'আনরড'ও চাল দিয়েছে। রাশিয়াও আমাকে সাহায্য করেছে। রাশিয়া আমার বন্দর সাফ করে না দিলে আমি খাবার আনতে পারতাম না। আমার বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামেও আমাদের সাহায্য করেছে। তবু একদল লোক তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব

নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ বন্ধুত্ব নষ্ট করবার ক্ষমতা কারও নাই।

বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না। আপনাদের কাছে আমি প্রথম দিন বলেছি, তিন বছর আপনাদের কিছুই দিতে পারবো না। পরে সারা বাংলাদেশেই আমি এই কথা বলেছি। কিন্তু পারবো না বললেও আমি দিয়েছি। রিলিফের জন্য, ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য এই ছয় মাসে ঊনত্রিশ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। টেস্ট রিলিফের জন্য গ্রাম অঞ্চলে দেয়া হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। স্কুল-কলেজের জন্য দেয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা। রিলিফ ক্যাম্পের জন্য দেয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা। মোট ৭৫ কোটি টাকা এই ছয় মাসে দেয়া হয়েছে। রিলিফ, কৃষিঋণ এবং সমবায় ঋণ দেয়া হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। এছাড়া, যত বকেয়া খাজনা ছিল সব মাফ করে দেবো। একদিন এই ময়দানে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেবো। তা আমি দিয়েছি। আমাদের বন্দর ঠিক হয়ে গেছে, এখন বিদেশ থেকে মাল আসতে পারবে। আমার তেল ছিল না, ভারত তেল দিয়েছে। আমাকে সব জিনিসই অন্যের কাছ থেকে আনতে হচ্ছে। বাংলাদেশ তো কলোনি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার ছিল। পশ্চিমারা সেখানে মাল তৈরি করতো আর বাংলাদেশে সেই মাল বেচে পকেটে টাকা নিয়ে উড়ে চলে যেত। আজ জিনিসপত্রের ঘাটতি পড়েছে। সব জিনিসই আমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে।

আমার শ্রমিক ভায়েরা, কৃষক ভাইদের জন্য আমি টেস্ট রিলিফ দিচ্ছি, তাকাবি ঋণ দিচ্ছি, খাজনা মাফ করেছি। এই সঙ্গে আমি ব্যাংক জাতীয়করণ করেছি। বড় বড় শিল্প কারখানা আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও জাতীয়করণ করেছি। এসব জাতীয়করণের অর্থ আমাদের বুঝে দেখতে হবে। এগুলো সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পদ। শ্রমিকেরা সারাজীবন শিল্প কারখানা, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন। এগুলো জাতীয়করণের অর্থ হলো শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দেয়া। আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনারা জানেন, পশ্চিমাদের হাতে যে সমস্ত কলকারখানা ছিল তার সব টাকা তারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, কারখানা চালাতে এ গভর্নমেন্টের ১৫৮ কোটি টাকা দিতে হয়েছে।

যদি কারখানা চালিয়ে উৎপাদন না করতে পারেন, আমি বেতন বাড়াবো কোথা থেকে? আপনারা আমার কাছে চান নাই, আমার কাছে দাবি করার দরকারও নাই। আমি আপনাদের জন্য জীবনভর দাবি করেছি। আমার কাছে আপনারা কি দাবি করবেন? আপনারা না বললেও আমি ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ৩৫ কোটি টাকা বেতন বাড়াতে হয়েছে। আপনারা যদি উৎপাদন না করেন, আমি টাকা দেবো কোথা থেকে? আমি কি তবে বাংলাদেশটা বিক্রি করে টাকা দেবো? না, বাংলাদেশকে বিক্রি করতে পারবো না। আমাকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে, আমি ধর্মঘট কেন বন্ধ করলাম! কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করতে চাই নাই। তবে, আমি যদি শ্রমিকদের বেতন দেয়ার জন্য টঙ্গীতে টাকা পাঠাই বা রিলিফের টাকা দিই আর সেখানে সেই টাকা কেড়ে নেয়া হয় এবং তারপর আবার যদি কেউ বেতন নিতে আসে তাহলে সেটা কি ভালো হয়? শ্রমিকদের কর্তব্য হলো উৎপাদন করা।

আমি এখানে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করছি। সরকার যেসব কারখানা জাতীয়করণ করেছেন, এখন থেকে সেগুলোর প্রত্যেকটি ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে দুইজন করে সদস্য থাকবে এবং শ্রমিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে এই সদস্যদের বোর্ডে পাঠাবেন। এছাড়া বোর্ডে সরকারের এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে তিনজন সদস্য থাকবেন এবং এই পাঁচজন বসে কারখানা চালাবেন। যাই আয় হোক না কেন, আদমজী, দাউদ বা আমিনের পকেটে যাবে না। কোথায় যাবে, তা আপনারা জানতে পারবেন। আপনারা হলেন শতকরা একজন বা দেড়জন, আর বাংলার কৃষক হলো শতকরা ৮৫ জন। আয়ের একটা অংশ আপনারা নেবেন। আর বাকি অংশ দেশের কৃষকদের। তাদের টাকা দিয়ে শিল্প-কারখানা চালানো হয়। তাদেরও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। শ্রমিক ভায়েরা, দুধ খান, গরু জবাই করে খেয়ে ফেলবেন না। তাতে দেশ চলবে না। আর, লাল বাহিনীর ভায়েরা, আপনারা হবেন আদর্শকর্মী। আপনাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আর আপনাদের দেখতে হবে যে, ৮ ঘণ্টার জায়গায় লাল বাহিনীর ছেলেরা ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। এবং এই কাজ দেখিয়ে অন্য শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে হবে। আপনারা ১০ ঘণ্টা না পারেন ৯ ঘণ্টা কাজ করুন বা ৮ ঘণ্টা কাজ করুন। উৎপাদন বাড়ান। তাহলেই লাল বাহিনী আপনাদের ইজ্জত থাকবে। লাল টুপি মাথায় দিয়ে বেড়ালে লাল বাহিনীর ইজ্জত পাওয়া যাবে না।

ভায়েরা আমার আজ আপনাদের বেতন বাড়ালেই সুবিধা হবে না। সেই

জন্য বাংলাদেশে ৪২০০টি দোকান খোলা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন একটা করে ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র দেয়ার জন্য খোলা হচ্ছে। শ্রমিক এলাকায়ও এ ধরনের দোকান খোলা হবে। তাতে খরচ হবে ১৯ কোটি টাকা। তবে মজুদদার, চোরাকারবারীরা আর চোরাচালানীরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। তাদের আমি সোজা কথায় বলে দিচ্ছি, পাঁচ মাস আমি তাদের অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, বুঝিয়েছি, অনেক করে বলেছি–এ কাজ করো না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তারা আমার কথা শুনবে। কিন্তু দেখছি, "চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী"। তাই তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই, যারা শহরে সরকারি বাড়ি, গাড়ি দখল করে আছ, যারা দোকান বা অন্যের জমি দখল করে আছ, যারা মজুদ করছো, জিনিসপত্র বিক্রি করছো না, জিনিসের দাম বাড়াবার চেষ্টা করছো, তাদের রেহাই নাই। আমি ভিক্ষা করে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে জিনিসপত্র আনছি আমার গরিব দুঃখীদের জন্য। সেই জিনিস যারা লুটপাট করে খাচ্ছো, তাদেরও রক্ষা নাই। আমি ১৫ দিন সময় দিলাম। ১৫ দিনের মধ্যে যদি সরকারি বাড়ি না ছাড়ো, যদি মজুদ করে রাখো, এক-একটা এলাকায় আমি কারফিউ দেবো আর সমস্ত পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট আর আমার স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে তল্লাশি চালাবেন। এতদিন আমি কিছু বলি নাই। এখন বলে দিলাম, হুকুম দিয়ে দিলাম। এর পরেও বড় বড় বক্তৃতা করবে আর রাত্রিবেলায় চোরা গাড়িতে চড়বে, এটা হবে না। আমার প্রাণ থাকতে নয়। বার বার ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও। আর ঘুঘু খাওয়ার চেষ্টা করো না। আমি পেটের মধ্য হতে ধান বের করে ফেলবো। চিন্তার কারণ নাই।

ভায়েরা আমার, আর একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। আওয়ামী লীগ ২৩ বছর এই বাংলাদেশে রাজনীতি করছে। এখন কিছু লোক এই আওয়ামী লীগের এমসিএ-দের নিন্দা করে। কিন্তু ২৩ জন এমসিএ-কে বহিষ্কার করেছে কোন পার্টি? এমন বহিষ্কারের নজির পৃথিবীর আর কোনো দেশের ইতিহাসে আছে? কিন্তু আমি বহিষ্কার করেছি, আওয়ামী লীগ করেছে। ভবিষ্যতে যদি কোনো এমসিএ বা পার্টি–সে যে পার্টিরই হোক না কেন, কিংবা কোনো শ্রমিকনেতা বা ছাত্রনেতা চুরি করে, তাহলে আমি মাফ করবো না।

এখন এমসিএ-দের সমালোচনা করার অর্থ কি? যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা ভাবেন, আমি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবো। তাঁরা যদি এমসিএ-দের দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, তাহলে নিজেরা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ

করবেন। কিন্তু সব এমসিএ-ই কি চোর? কোনো এমসিএ কি যুদ্ধ করেন নাই? তাঁরা কি গুলি খেয়ে মরে নাই? এমসিএ-দের মধ্যে ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষও আছে। সব দলেই ভালো-মন্দ মানুষ আছে। যারা খারাপ, তারা সবই সময়ই খারাপ। আমার দলের মধ্যে কেউ যদি চুরি করে, বিশ্বাস রাখতে পারেন, তাকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়, আমি জানি। তার পরিষদ সদস্যপদ আমি কেড়ে নেবো। কিন্তু এমসিএ-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা খারাপ। তাঁরা গণপরিষদের সদস্য। তাঁরা নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছেন, তাঁরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। আমি বাংলাদেশে শাসনতন্ত্র দিতে চাই, ইয়াহিয়া খান বা আইয়ুব খানের মতো গভর্নমেন্ট চালাতে চাই না। জনগণকে আমি ভয় করি না। জনগণকে আমি ভালোবাসি। সে জন্যে শাসনতন্ত্র যত শিগগিরই হয় আমি দেবো।

এখন আমাদের একটা স্লোগান। আগে ছিল ৬-দফা, এখন বলি ৪টা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমার বাঙালি জাতি, এ নিয়ে হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হলো আমার এক নম্বর স্তম্ভ।

দ্বিতীয় স্তম্ভ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে ধনীদের আমি আর ধনসম্পদ বাড়াতে দেবো না। বাংলার কৃষক, মজদুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এ দেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।

কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে সে দেশে গণতন্ত্র নাই। দুনিয়ায় আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করবো। আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না। দরকার হলে আবার ভোটে যাবো। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।

চতুর্থত, বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্ম-নিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে

মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। এই হলো চার দফা, চার স্তম্ভ।

আর একটা কথা বলি। ভুট্টো সাহেব নারাজ হয়ে গেছেন। তিনি আবোল-তাবোল বকছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। আমি বলেছি, বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিন। তারপর এসব বিবেচনা করে দেখবো। তিনি এর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন। তিনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন নাকি? যারা আমার মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে, যারা পশুর মতো আমার জনসাধারণকে হত্যা করেছে, যারা নিরপরাধ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার করলে নাকি তিনি বড় অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব, শুনে রাখুন, তাদের বিচার বাংলার বুকে অবশ্যই হবে।

ভুট্টো সাহেব আমার ৪ লাখ বাঙালিকে আটকে রেখেছেন। তারা নিরপরাধ, কিছুই করে নাই। তবু তিনি দরকষাকষি করছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি আমার বাঙালিদের ইনশাল্লাহ্ বাংলার বুকে ফেরত আনবো। তিনি ঠেকাতে পারবেন না।

তবে, একটা অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে। যে সমস্ত বাঙালি এখানে আছে, যারা আলবদর-রাজাকার নয়, যারা বাংলার মাটিতে বাঙালি হিসেবে বাস করতে চায়, আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, তাদের বাংলায় থাকবার অধিকার রয়েছে। যারা যেতে চায়, ভুট্টো সাহেব যেন মেহেরবানি করে তাদের নিয়ে যান। আমার আপত্তি নাই। তিনি বলছেন তিনি তাদের নেবেন না। কেন নেবেন না? তাদের হাতে তো বন্দুক তাঁরাই দিয়েছিলেন। তাদের তো ব্যবহার করেছিলেন। তাদের নিয়ে বাঙালিদের হত্যা করিয়েছিলেন। এখন কেন নেবেন না? যারা যেতে চায়, তাদের নিয়ে যান। আমি ছেড়ে দেবো। আমার ৪ লাখ লোক ফেরত দিন। পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেক লোক আমার কাছে আছে। ভুট্টো সাহেব আমার লোক ফেরত দিন, আমিও তাদের লোক ফেরত দিচ্ছি। যুদ্ধবন্দির সঙ্গে জনসাধারণ কোনো দিন এক হতে পারে না। এমন নজির দুনিয়ায় নাই, কোনোদিন হয় নাই।

একদল লোক দুনিয়ায় চিৎকার করে বেড়াচ্ছেন যে, বিহারীরা বড় কষ্টে আছে। যখন আমার লোক না খেয়ে মরছিল, যখন গুলি খেয়ে মরছিল, যখন এ দেশের মানুষকে ধরে ধরে কুর্মিটোলায় গুলি করেছিল, যখন জাহাজ

ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন কেন মেহেরবানী করে তাঁরা প্রতিবাদ করেন নাই? এখন কেন তাঁরা কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়ছেন?

আমার বাংলার এক কোটি লোক পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে ছ'মাসে ফিরে এসেছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের খাবার দিতে হয়। আমার বাংলাদেশের দেড় কোটি লোক এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, ও গ্রাম থেকে এ গ্রামে পালিয়ে বেড়াত। তাদের জন্য কেউ মায়াকান্না কাঁদে নাই। গ্রামে যান। দেখে আসুন, আমার মানুষ না খেয়ে আছে। আমার মানুষের কাপড় নাই। আমার কৃষকের বীজ নাই। আমার মানুষের চাল নাই।

আমি তো পরিষ্কার বলেছি, দুনিয়ার সমস্ত দেশ থেকে আমি সাহায্য নিতে রাজি আছি। কিন্তু সে সাহায্য হবে শর্তহীন। শর্ত দিয়ে কারো কাছ থেকে আমি ভিক্ষা আনতে পারবো না। শর্ত ছাড়া যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে চায়, দুনিয়ার যে কোনো দেশ থেকে সাহায্য নিতে আমি রাজি আছি। তবে এমন কিছু আনতে চাই না, যাতে ভবিষ্যতে আমার অসুবিধা হতে পারে। সে জন্য আমি একটু আস্তে আস্তে চলি।

শ্রমিক ভায়েরা, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু উৎপাদন করো। আল্লাহর ওয়াস্তে মিল খেয়ে ফেলো না। পয়সা থাকবে না। ব্যাংক থেকে ১৫৭ কেটি টাকা তোমাদের আমি দিয়েছি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য। অনেক মিল বন্ধ। তবু মাইনে দিয়ে চলছি। অনেক মিলে অর্ধেক কাজ হয়। সেখানেও আমি মাইনে দিয়ে চলছি। আমি তাদের ভালোবাসি, এই জন্যই তো আমি বিনা কথায় ২৫ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদের ২/৩ বছর কষ্ট করতে হবে। উৎপাদন করতে হবে। ইনশাল্লাহ, একবার যদি উৎপাদন বেড়ে যায়, তাহলে আর কোনো কষ্ট হবে না। শ্রমিকরা সমস্ত মানুষের সঙ্গে সমানভাবে দেশের সম্পদ ভাগ করে খেতে পারবে। কিন্তু চার সের দুধ হলে তারা এক সের খাবে। বাকি তিন সের গ্রামের লোককে দেবে। চার সেরই যেন নিজেরা না খায়। তাহলে গ্রামের লোক বাঁচবে না। গ্রামে থাকে কারা? আপনার আমার বাবা-মা। যারা গ্রামে বাস করে, তারাই কৃষক। তাদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। তাদের আমি ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা মাফ করেছি। তাদের আমি ঋণ দিচ্ছি। দরকার হলে আরো দেবো। আমি চাই, তারা খাদ্য উৎপাদন করুক। আমি বেশি দিন ভিক্ষা করতে পারবো না। আমার ৩০ লাখ টন খাদ্যের দরকার। ১৭ লাখ টন আমি পেয়েছি। আরো ১০ লাখ টন

ইনশাল্লাহ্ আমি পাবো। খাদ্য সামগ্রীর অভাব হবে না।

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। আবার একটু কমের দিকে আসছে। আমাদের অনেক খবরের কাগজ; যেগুলো দাম বাড়তে দেখলে লাফ দিয়ে কেবল বাড়ায়। যখন কমে তখন আর মেহেরবানী করে কিছু লেখে না। তারা যেন দাম কমলে একটু লেখে। আমার তো ছোট চাদরের অবস্থা। মাথায় দিলে পা খালি, পায়ে দিলে বুক খালি। চাল আনলে ডাল আসে না, ডাল আনলে নুন আসে না। নুন আনলে তেল আসে না, তেল থাকলে লবণ থাকে না। আনতে হয় চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে, চালনা পোর্ট থেকে।

ভায়েরা আমার, আমি জানতে চাই, আপনাদের আমার উপর আস্থা আছে কি নাই? আওয়ামী লীগের উপর আস্থা আছে কি নাই? বাংলাদেশকে গড়বেন কি গড়বেন না? তিন বছর আমি কিছু দিতে পারবো না। দাবিদাওয়া আমার কাছে চলবে না। একদল লোক বলছে, মুজিবুর রহমান লন্ডন যাবে। কিন্তু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষকে পেলে বেহেস্তে গেলেও শান্তি পাবে না। মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষকে সুখী করতে চায়। বাংলাকে সোনার বাংলা করতে চায়। লোকে বলে, মুজিবুর রহমান ল-ন-ডন যাবে। মুজিবুর রহমান সব ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি কেন সব ছাড়বো?

আজ মুনাফাখোর, আড়তদার, চোরাকারবারী সাবধান হয়ে যাও। ভবিষ্যতে যদি জিনিসের দাম আর বাড়ে, আমি তোমাদের শেষ করে দেবো, কারফিউ করে দেবো। আর দরকার যদি হয়, আইন পাস করবো। যদি চোরাকারবারী বা আড়তদাররা আমার কথা না শোনে, তাদের ছাড়বো না। আর যারা অস্ত্র নিয়ে চলে, তারা সোজা পথে না এলে আমি বাধ্য হয়ে আইন পাস করবো তাদের গুলি করে হত্যা করার জন্য। আর সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনারা ঘুষ খাবেন না। আমার লোক আছে। আমি সব খবরই পাচ্ছি। ঘুষখোররা নয় নম্বর ধারায় চাকরি করে, জেলখানায় যাবে। আর চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, ডাকাত, সাবধান হয়ে যাও।

কর্মী ভাইয়েরা, গ্রামে গ্রামে তোমরা পাহারা দাও, যাতে চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে।

আর যারা শুধু সমালোচনা করে বক্তৃতা করে, তাদের কাছে অনুরোধ করি, গ্রামে গিয়ে একটু কাজ করুন, একটু রিলিফের কাজ করুন। তাতে ফল হবে।

আমি এবার তাহলে চলি। খোদা হাফেজ।

সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষা করতে নিজেদেরও আত্মসমালোচনা করুন

জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উদ্ধৃতাংশ।

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সাথে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।

সাংবাদিক ভাইয়ের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশ কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমারা করছি। আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজে কখনো কোনোরকম হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও নতুন বাংলাদেশ, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। বিপ্লবে পূর্বেকার সরকার একটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মতো ছিল। যাঁরা এ দেশে ছিলেন, জাতীয় সরকার কি করে চালাতে হয় সে বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের তাই নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। শুধু মুক্তিবাহিনীর ভায়েরাই অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে নাই। জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। হানাদার বাহিনী যাবার সময় আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর দলিল আছে। শত্রুদের বিচারের সময় আপনারা সেসব দলিল দেখতে পাবেন।

আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রের একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনি একটা নীতিমালা আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সামরিক চক্রের হীন কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁরাই ধরিয়ে দিয়েছেন সেইসব সাংবাদিকদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোনো দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি আল-বদরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন। এমন সাংবাদিকও আছেন, যাঁদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তাঁরা হানাদার বাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাদের গায়ে হাত দিতে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর আঘাত করা হবে?

যিনি একদিন দৈনিক 'পয়গাম' চালাতেন, তিনি যদি আয়-উপার্জনহীন কোনো ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেন, তা হলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এই মালিকের টাকা কোত্থেকে এল? এরপর আবার এই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মালিক-সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোনো সংস্থা যদি এখান থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাদের কি

করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এ দেশে আর কখনো ছিল না। এজন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপান হয়, "এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা", "বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ" ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপান হয়?

আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোনো কোনো খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা সাম্প্রদায়িকতার চরম। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ২৪ বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকরা সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন তাহলে আপনারা কি করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একখানা কাগজে লেখা হয়েছে, "গণহত্যা চলছে।" গণহত্যার কথাই যদি বলেন, তবে আমি আপনাদের বলবো যে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বহু আওয়ামী লীগ আর প্রগতিশীল কর্মী মারা গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে গণহত্যা হয় নাই। এ জন্য দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এত বড় বিপ্লবের পরে, হানাদারদের দ্বারা সংঘটিত এত বড় হত্যাকাণ্ডের পরেও যে আর একটা হত্যাকাণ্ড হয় নাই, তার জন্য বাংলার মানুষ ও প্রগতিশীল কর্মীদের আপনারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবেন।

অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলে থাকেন। যারা আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছে তারা নাকি আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পকেটে ফেলে রাখবার চেষ্টা করছে। এ ধরনের কথা বলা কি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা? এর নাম কি গণতন্ত্র?

যদি কেউ অনাহারে মরে থাকে, আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। তার জন্য আমিও দায়ী হবো। আমি চেষ্টা করছি, যাতে কেউ অনাহারে না মরে। যদিও দেশে খাবার নাই। আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লাখ টন। আমি বিদেশ থেকে ১৭ লাখ টন এনেছি। ভারত সাড়ে সাত লাখ টন খাবার দিয়েছে। এছাড়া "আনরড" এবং ইউএসএ, কানাডা ও রাশিয়া থেকেও খাবার পাওয়া গেছে। সাধ্যমতো সবাই আমাদের সাহায্য করছে। এর ভিতর ভারতীয় চক্রান্ত কোথায়? অথচ কোনো কোনো খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে "৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার", "আমরা কি সত্যিই সার্বভৌম" ইত্যাদি।

অনেক কাগজের শিরোনাম আমার কাছে আছে। এই কাগজগুলো ফরমান আলী খানের দয়ায় ঢাকায় বসে নয় মাস কাজ করেছে, কিন্তু তাদের আজো ছোঁয়া হয় নাই। অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক মা-বোন-বউ ঘরে ফেলে অকূল পাথারে ভেসে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ফরমান আলীর অনুগ্রহভাজনরা এখানে বসে আরামে খবরের কাগজ চালান এবং হানাদারদের সাথে সহযোগিতা করেন। এরপর স্বাধীনতা পেয়ে তাঁরা রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে গেলেন। তাঁরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁদের সরকার ক্ষমা করতে পারে, জনগণ ক্ষমা করবেন কিনা সন্দেহ আছে।

সরকারের যেমন স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আছে, তেমনি নীতি পালনের দায়িত্ব আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও আছে।

আমরা গণতন্ত্র চাই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না। অথচ কোনো কাগজে লেখা হয়েছে, "মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও"। যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তা হলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে কোনো কথা বলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে।

স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে। আপনাদের অনেক দাবি ছিল, সেসব দাবি আমরা সব সময়ই সমর্থন করেছি। আর গত ছয় মাস আমাদের পোর্ট বন্ধ। আমাদের রাস্তা নাই। গুদামে চাল নাই। এক পয়সাও বৈদেশিক মুদ্রা নাই। রাজস্ব আদায় নাই।

তবু আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮০টা দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আমরা জাতিসংঘের এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যও হতে যাচ্ছি। আমাদের বলতে পারবেন না। স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের হাতে কি ছিল? তখন পররাষ্ট্র দপ্তর বলতে কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে দেশরক্ষা দপ্তরও ছিল না। অর্থ দপ্তরটিও একটি নেজারাতের মতো ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। স্কুল-কলেজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। মোট কথা স্কুল-কলেজ ভাঙ্গা ছিল। আমাদের সব কিছুই ছিল বিধ্বস্ত। এমন দেশ নেই যেখানে

বিপ্লবের পরে দু-চারবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত খাবার দিতে না পারলেও বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু খাবার পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা অনেকগুলো কমিশন গঠন করেছি এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। সুষ্ঠু পরিচালনা ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না। আমরা যে সমস্ত কমিশন গঠন করেছি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা কমিশন, বেতন কমিশন। শিগগির বেতন বোর্ড, চাকরি পুনির্বন্যাস কমিশনও গঠন করা হবে।

সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং করার জন্য স্ক্রিনিং কমিটি করা হয়েছে। যারা দালালি করেছে, তাদের বিষয় স্ক্রিনিং কমিটিতে আসবে এবং কমিটির বিচার-বিবেচনার ফলাফল খবরের কাগজে দেয়া হবে। যাঁদের উপর আপনাদের আস্থা আছে সে সমস্ত লোক নিয়েই কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁদের ভিতর হাইকোর্টের জজও রাখা হয়েছে–যাতে কেউ বলতে না পারেন, রাজনৈতিক কারণে আমি আওয়ামী লীগ ও তার বন্ধু দলগুলোর বাদ দিয়ে কেবল অন্যদলের লোকদের স্ক্রিনিং করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়েও স্ক্রিনিং চলছে। তবে, তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। এজন্য স্ক্রিনিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরাই নেবেন। আমাকে বলা হয়েছে, সিন্ডিকেট প্রস্তাব পাস করেছে, সরকার যে হাইকোর্ট জজ দিয়ে স্ক্রিনিং কমিটি করেছে তাঁর কাছেই তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন। আপনারা সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং চান, শিক্ষকদের স্ক্রিনিং চান, বেতারের স্ক্রিনিং চান। অনুগ্রহ করে একটু নিজেদেরও স্ক্রিনিং করুন। একটু বলুন এই লোকগুলো এই কাজ করেছে। আমরা তা মেনে নেবো। আর যদি নিজেরা কিছু না করেন, আমাকে বলবেন। আমি করবো। আমাকে করতেই হবে। কারণ, পাকিস্তানের নামে পয়সা নিয়ে এসে কেউ রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে আর মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সব নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবার চেষ্টা করে, এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, জাতির আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে সেটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সে স্বাধীনতা কোন সরকার, কোন জনগণ, কোন প্রগতিশীল দল কোনদিন সমর্থন করতে পারে না।

আপনারা যেসব দাবি করেছেন সেগুলো ন্যায্য। সেগুলোর জন্য আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমরা যতদূর সম্ভব দাবিগুলো পূরণের

চেষ্টা করছি।

আপনারা বলেছেন, ধর্মঘট বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করি নাই। তবে সমাজতন্ত্রের একটা নীতি আছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের কর্তব্য কি সেটাও বুঝতে হবে। এবং শ্রমিকরাই সমাজতন্ত্র চায় বেশি। কিন্তু যখন সরকারের আয় নাই, তখন ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির পরও যদি এটা-ওটা নিয়ে ঘেরাও বা জোরজবরদস্তি চলে, তাহলে কি হয়? এটা কোন ধরনের সমাজতন্ত্র?

আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন যারা সত্যিকার শ্রমিক, তারা এসব করছে না। কিন্তু কিছু লোক করছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যই ধর্মঘট বন্ধ করা হয়েছে। তাও মাত্র ছ'মাসের জন্য। আপনারা বিশ্বাস করুন, কারো অধিকার কেউ নষ্ট করুক এ আমি কখনো চাই না। আমি জীবনভর আন্দোলন করেছি। এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমি এতদূরে এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। এ সরকারও কারো ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করতে চায় না। যেখানে কাজ জানা লোক নাই, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নাই, সমাজতন্ত্রের জ্ঞান নাই; সেখানে ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসহ সমস্ত মূল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি কেউ পয়সার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেখানে আমি বাধা না দিয়ে কি করতে পারি? আমি কি বলতে পারি যে, সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করুক?

যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারবর্গকে সাধ্যমতো সাহায্য দেয়া হচ্ছে। তা ছাড়া চাঁদা তুলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করে শহীদদের প্রত্যেক পরিবারকে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। শহীদ সরকারি কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনকে পেনশন এবং প্রেসিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং মালিকহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাঁরাও জীবনভর কিছু করে খেতে পারেন। যাঁরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করে পঙ্গু হয়েছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও এসবের একটা অংশ দেয়ার জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। কেউ বাদ পড়বেন না। সবাই সেখান থেকে কিছুটা সাহায্য-সহানুভূতি পাবেন।

আপনাদের দাবি দাওয়ার উত্তরে আমিও কিছু দাবি জানাচ্ছি। আমি চাই আপনারাও স্ক্রিনিং করুন। যারা ন'মাস এখানে ছিল, তাদের কারো কারো

সম্পর্কে দলিলপত্র আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের গায়ে যদি আমি হাত দেই, আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি সরকারি কর্মচারীকে জেলে দিয়েছি, হাইকোর্টের জজকে জেলে দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে জেলে দিয়েছি, এ দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগের এম.সি.এ.কে-ও জেলে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে যাদের অপরাধী পাবো, তাদের নিশ্চয়ই ধরতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারী বাড়াবাড়ি করলেও আপনারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে, দালাল আইনে-হাকিম আছে, কোর্ট আছে, বিচার হচ্ছে। সরকার যদি আসামীর বিরুদ্ধে দলিলপত্র দাখিল করতে না পারে, তা হলে সে খালাস হয়ে যাবে।

স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, তা রক্ষা করা তার চেয়েও কষ্টকর। স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবু বিপ্লবের পরে ছ'মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই। কিন্তু অনেকেই তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। তার জন্য আমাকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন কারফিউ দিয়ে তল্লাশি চালানো। এতে কিছু সৎ লোকের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই অসুবিধা এড়ানোর উপায় নাই। আর অসৎ লোকদের তো আমি আগেই সতর্ক হবার সময় দিয়েছিলাম।

কোনও কোনও কাগজে সমালোচনা করে বলা হয়, এখনকার অবস্থা আইয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকারের আমলের চেয়েও খারাপ। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল-ল জারি হয়েছিল এবং আমাকে বন্দি করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখেন নাই। আবার এরাই এখন লেখেন, "চালের মণ একশো বিশ টাকা"। চাল থাকতেও আমি দিচ্ছি না। কিন্তু আমি তো তা বলি নাই। আমি শুধু চেষ্টা করছি। এবং কিছু কিছু দিচ্ছি। চালের দাম মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে, তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকের স্বাধীনতা?

সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আপনারা লেখেন। আপনারা জানেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জবাব দেয়ার অধিকার নাই। যদি কেউ কারো নাম করে কিছু লেখেন এবং সে যদি কোনও প্রতিবাদ করে তা হলে সেটা প্রকাশ করাও সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে অনেক সরকারি

কর্মচারীর বিরুদ্ধেই তো মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু কারও প্রতিবাদই খবরের কাগজে ছাপা হয় নি। এটা সাংবাদিকতার কোন নীতিমালায় আছে?

আমি আরো একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটা বাংলাদেশে আগে ছিল না। আমি এটা দেখেছি করাচীতে আর দেখেছি পিন্ডিতে। এটা হলো ভীতি প্রদর্শন। কোনো সাপ্তাহিক বা সান্ধ্য দৈনিকে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখে তাকে বলা হতো, টাকা দাও, নইলে আবার তোমার বিরুদ্ধে লেখা হবে। তখন সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে সে কাগজের মুখ বন্ধ করা হতো। আমি লক্ষ্য করছি এখানেও এই ধরনের একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আরো দেখা যাচ্ছে, যার আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? আমি শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি। এর জন্য তাঁরা কেঁদে মরে। তাদের পয়সা আসে কোত্থেকে? আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশীরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তা হলেও কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের উপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে?

আপনারা জানেন, আমি ঢাকা শহরে সাইকেল নিয়ে ঘুরে রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন কিছু কিছু লোক রাতে হাইজ্যাকের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দিনের বেলায় বিপ্লব করে। তারা দুষ্কৃতকারী। তাদের আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই। অথচ প্রচুর টাকা খরচ করে। এ টাকা আসে কোত্থেকে? কে দেয়? আমি যদি এসবের তদন্ত করি, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না আশা করি। এটাও আইন।

আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট

হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজাকার, আলবদররা এখন কিছু কিছু বড় বড় প্রগতিশীল নেতার আশ্রয় নিয়ে "প্রগতিশীল" বনে গেছে। আসলে তারা খুনের মামলার আসামী। তাদের নামে হুলিয়া রয়েছে। এখন তাদের কেউ বলে, আমি ওমুক নেতার সেক্রেটারি, কেউ বলে আমি সম্পাদক। এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কি, আপনারাই বলুন।

আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে সহযোগিতা করবো।

আপনাদের দাবিদাওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি সারা জীবন আপনাদের সাথে সংগ্রামে ছিলাম। এখনো আমি সংগ্রামে আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের ন্যায্য পাওনা যা আছে, তা নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। কিন্তু তার বেশি চাইলে দেয়া সম্ভব নয়। আমি পারবো না। বাংলাদেশের মানুষকে আমি বলেছি, তিন বছর কিছুই দিতে পারবো না। তারা তা মেনে নিয়েছে। আশা করি, আমার সাংবাদিক ভাইয়েরাও বলবেন, তিন বছর কিছুই চাই না। কারণ, আপনারা কোনো পৃথক জাত নন। আপনারা ৭ কোটি লোকের একটা অংশ। তাছাড়া, গণতন্ত্রের একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এ দু'টো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবো।

জয় বাংলা।

সংবিধানের আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার সমাজ গড়ে উঠবে

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশনে বিভিন্ন শোক প্রস্তাব এবং খসড়া সংবিধান সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, তার পূর্ণ বিবরণ।

জনাব ভারপ্রাপ্ত স্পিকার সাহেব, এই গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আপনি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমি এ দেশের প্রথম গণপরিষদের প্রথম স্পিকার মরহুম শাহ্ আবদুল হামিদ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। শাহ্ আবদুল হামিদ সাহেব একজন নেতা ছিলেন, যিনি স্বদেশকে ভালোবাসতেন এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নাই। আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে বহুবার তাঁকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সকল অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার পর বৃদ্ধি বয়সেও তিনি তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রামী জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ বুকভরা আশা নিয়ে এই গণপরিষদের সদস্যরা তাঁকে স্পিকার নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই। আমরা আজ শুধু তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারি। মানুষের মরতে হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। তাঁর মূল্যবান জীবন অবসানে এই পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের কাছে শোক জ্ঞান করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

এ প্রসঙ্গে আমি গণপরিষদ সদস্য মরহুম জনাব কফিল উদ্দিন চৌধুরীর কথা স্মরণ করছি। ১৯৪৭-৪৮ সালে আমরা যখন তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, তখন তিনি আমাদের সাহায্য করেছিলেন, সহযোগিতা জুগিয়েছিলেন। আমরা যখনই বিপদে পড়তাম, তখনই তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দিতেন; আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন জালেম মুসলিম লীগ সরকার বাংলাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার শুরু

করেছিল। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে, শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক এখানে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই মন্ত্রিসভায় তিনি (মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরী) মন্ত্রী ছিলেন এবং আমিও মন্ত্রী ছিলাম। আলোচ্য মন্ত্রিসভায় আমিই সর্বাপেক্ষা অল্প বয়সের মন্ত্রী ছিলাম এবং জনাব কফিল উদ্দিন চৌধুরীর সাথে কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদী। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের ওপর যখন অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন তিনিও মুজিব নগরে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন–যদিও এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর heart operation হয়েছিল। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হলো যে, বাংলার স্বাধীনতা দেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমার ছোট ভাই আবদুল গফুর খুলনার সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন এবং নিজে গ্রামে গ্রামে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস, আততায়ীর হাতে তাঁকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। খুলনার লাখ লাখ একর জমি জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে গিয়ে জনগণকে বলেছিলেন, অর্থের চিন্তা না করে তারা যেন কাজ করতে থাকেন। সে সময় তিনি উপকূলীয় বাঁধের কাজ তদারক করে যখন খুলনা থেকে পাইকগাছা ফিরছিলেন, তখন তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিয়ে রাজনীতিতে সাফল্য লাভ করা যায় না। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই সত্য; কিন্তু তাঁর কথা চিন্তা করলে শরীর শিউরে ওঠে। তিনি ছিলেন যুবক, তাঁর ছিল ভবিষ্যৎ। আমরা অবশ্য আশা করতে পারতাম যে, তিনি এ দেশের কল্যাণের জন্য অনেক চেষ্টা করতে পারতেন, কাজ করতে পারতেন, ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হোক এবং এর সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হোক।

(অতঃপর ভারপ্রাপ্ত স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ মরহুম শাহ আবদুল হামিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য পরিষদের কাজ ২০ (বিশ) মিনিটের জন্য মুলতবি রাখেন। এর পর পরিষদের অধিবেশ পুনরায় শুরু হলে স্পিকারকে সম্বোধন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন),

আমি আপনাকে এই পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমে আপনি এই পরিষদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। পরে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার হিসাবে কাজ করেছেন। আজ এই পরিষদে আপনাকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকার নির্বাচিত করায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি এবং সদস্যগণ আশা

করে যে, আপনি নিরপেক্ষভাবে এই পরিষদের কাজ পরিচালনা করবেন। আপনার কর্মজীবনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে।

বহুদিন থেকে আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল-জুলুম থেকে শুরু করে বহু কষ্ট আপনি স্বীকার করেছেন। আপনাকে স্পিকার নির্বাচিত করতে পেরে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি। আপনি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।

জনাব বায়তুল্লাহ পরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় আমি এ পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। জনাব বায়তুল্লাহ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। একটা ঘটনা (incident) আমার মনে পড়ছে। ১৯৪৮ সালে যখন প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় এবং গ্রেপ্তার হয়ে আমরা জেলে যাই তখন তিনি (বায়তুল্লা) গুরুতরভাবে আহত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন তাঁর অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারেন। এতেই বোঝা যায়, তিনি কতো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। সেদিন থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। এরপর থেকে স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত তিনি দেশের জনগণের জন্য আন্দোলন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নেতাদের সাথে তিনি কাজ করেছেন। আজ তাঁকে আমরা ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত করেছি। পূর্বে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করবো, ডেপুটি স্পিকার হিসেবেও তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন নিরপেক্ষভাবে এবং গণপরিষদের সম্মানকে রক্ষা করে। আমার ভাই পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, স্পিকার ন্যায় ও সত্যের অনুসারী। এই কথা স্মরণ রেখে তিনি গণপরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, গণপরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই।

আমরা যেটা আমাদের খসড়া সংবিধান বিল (Draft Constitution Bill) হিসাবে গ্রহণ করলাম, সেটা বিবেচনার জন্য সদস্য-সদস্যাদের সময় দেয়া হবে। প্রথমেই আমি খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রায় ৭২ দিন আমাদের এই কমিটির সদস্যরা কাজ করেছেন, চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। কমিটি পৃথিবীর সমস্ত সংবিধান যথাসম্ভব পর্যালোচনা করে একটি খসড়া আজ এই গণপরিষদে

পেশ করতে পেরেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি খসড়া পেশ করায় আমি তাঁদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

জনাব স্পিকার সাহেব, সংবিধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার সামনে দুটি জিনিস ভেসে ওঠে। একদিকে দুঃখভারাক্রান্ত মন, অপরদিকে আমার মনে আনন্দ। দুঃখভারাক্রান্ত মন এই জন্য বলি যে, আপনারা জানেন, জনাব স্পিকার সাহেবও জানেন, কারণ আপনি আমার সঙ্গে ২০ বছর রাজনীতি করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস আপনার জানা আছে। ২০ বছর পর্যন্ত এ দেশের জনসাধারণ সংবিধানের জন্য সংগ্রাম করেছে। অনেক উত্থান-পতন হয়েছে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। অনেক রক্তের খেলা হয়েছে এই বাংলার মাটিতে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ মাতৃহারা পুত্রহারার আর্তনাদ। লাখ লাখ বোন আজ বিধবা। কতো রক্ত বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে, সে কথা চিন্তা করলে বক্তৃতা করতে আমি পারি না।

১৯৪৮ সালে এই সংবিধান যখন তথাকথিত পাকিস্তানে পেশ করা হয়, তখন বাংলা ভাষার ওপর আঘাত আসে। বাংলাদেশকে কলোনি করবার ষড়যন্ত্র হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য এ দেশের ছাত্র সমাজ এবং যুব সমাজ আন্দোলন করেছিল, রক্ত দিয়েছিল। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ছাত্রদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। ১৯৫৪ সালে ৯২ (ক) ধারা জারি করে শেরে বাংলা ফজলুল হক সরকারকে খতম করা হয়। আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, সাড়ে ৫ হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাজার হাজার ছেলের রক্তে বাংলাদেশের রাজপথ রঞ্জিত করা হয়।

১৯৫৮ সালে যখন আমরা এই স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছিলাম, বাংলার মানুষের স্বাধিকার দাবি করা হয়েছিল, সেদিন মার্শাল ল' জারি করে হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অনেককে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। ১৯৬২ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলার ছাত্র সমাজ তা রুখে দাঁড়ায়। তারপর আন্দোলন হয়–কতো রক্ত! সে ইতিহাস আপনি জানেন স্পিকার সাহেব।

১৯৬৬ সালে আমরা বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ দিয়েছিলাম। শোষকগোষ্ঠী তখন ক্ষেপে উঠেছিল। সে আন্দোলন আপনাদের জানা আছে। ১৯৬৬ সালের ২৮ মে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আমাদের সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এতে দেশে ঝড় বয়ে যায়। যার পর পৈশাচিক সরকার আমাদের ভাইদের, আমাদের ছেলেদের ওপর গুলি চালিয়ে, মেশিনগান

চালিয়ে হত্যা করে।

তারপর শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হই। পরিণামে শুরু হয় আন্দোলন। কতো রক্ত গিয়েছে। শেষ রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষ স্বাধীন হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে এতো রক্ত দিয়ে কোনো দিন কোনো দেশ স্বাধীন হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশকে তা দিতে হয়েছে। জানি না, কি পাপ বাংলার মানুষ করেছিল। কেন রক্ত দিতে হয়েছে তাদেরকে? শুধু রক্তই দিতে হয় নাই, ঘর-বাড়ির মায়া ছেড়ে, লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি লোক বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের জনসাধারণ, ভারত সরকার যদি বুকে টেনে না নিত, জানি না, বাংলার মানুষের কি অবস্থা হতো। আমাকে গ্রেপ্তারের পর বর্ডার থেকে কিছু অংশ দখল করে নিয়ে মুজিব নগর প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সেখানে প্রভিশন সরকার গঠন করেন এবং সংগ্রাম চালিয়ে যান।

লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়ে, বাংলার সকল মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে যোগদান করে। ইয়াহিয়ার পৈশাচিক সরকার আমার মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, লাখ লাখ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লাখ লাখ মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ লোককে হত্যা করে। হত্যা করে বৃদ্ধাকে, হত্যা করে মেয়ে, হত্যা করে যুবক–যেখানে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। আমি জানি না, আপনাদের Memory short কি না, কিন্তু এমন ইতিহাস আমরা পেয়েছি। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। এক ছেলে আমার কর্মী। মিলিটারি তাকে ধরে বললো : জয় বাংলা বলতে পারবি না। সে বললো : জয় বাংলা বলবোই। তখন তার একটা হাত কাটে। বললো : জয় বাংলা বলবি? সে বললো : জয় বাংলা। তখন তার বাম হাতটি কেটে দেয়া হলো। তার দু'খানা হাত কেটে দেয়া হলেও সে বললো : জয় বাংলা। তার একটা কান কেটে দিল। বললো : বলবি, জয় বাংলা? তার অপর কানটি কেটে দিল। বললো : বলবি, জয় বাংলা? ছেলেটি বললো : জয় বাংলা। তার বাম পা কেটে ফেলে দিল। তখন তার জান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে বললো : বলবি জয় বাংলা? সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বললো : জয় বাংলা।

এদের পাশবিক অত্যাচার পশুর মতো, বর্বরের মতো–যাতে হিটলার লজ্জা পায়, যাতে হালাকু খান লজ্জা পায়, যাতে চেঙ্গিস খান লজ্জা পায়। তারা অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের মাটিতে। আজ বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যরা সেই রক্তলেখা দিয়ে সংবিধান দিয়েছে। এই সংবিধান ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। সেখানে সংবিধান দিতে লাগলো ১৯৫০ সাল। ২৫ বছরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সংবিধান দিতে পারে নাই। তদানীন্তন গণপরিষদের প্রতিনিধিরা যেটা করেছিল, সেটা উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য, বাংলার মানুষকে শোষণ করবার জন্য, কিন্তু পারে নাই। জাগ্রত সমাজ রক্ত দিতে শিখেছে।

২৫ মার্চ প্রথম আমি বলেছিলাম, যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তাই আজ রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। গুদামে খাবার ছিল না, ২৭৮টি রেল ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। সমস্ত রাস্তার ব্রিজ, প্রায় ৭০টির মতো, ধ্বংস করে দিয়েছিল। চালের প্রায় গুদামই ধ্বংস করে দিয়েছিল। বন্দরগুলোর (Port) মধ্যে মাইন বসিয়ে রেখেছিল, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। ব্যাংকের পয়সা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কল-কারখানাগুলো বন্ধ ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। গ্রামের স্কুলগুলোর ফার্নিচার জ্বালিয়ে রুটি বানিয়ে খেয়েছিল। ৬৫ হাজার গ্রাম এই বাংলাদেশে। ৫৪ হাজার বর্গমাইল এই বাংলাদেশের আয়তন। সাড়ে ৭ কোটি লোক বাস করে এই বাংলায়।

তারা গর্ব করে বলে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের লোক, জয় বাংলা স্বাধীন হবে, কিন্তু এমন ধ্বংস করে দিয়ে যাবো, এই দেশের মানুষ আর যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং দুর্ভিক্ষে যেন লাখ লাখ মারা যায়।

আমার সহকর্মীরা দিন-রাত পরিশ্রম করেছে, চেষ্টা করেছে। এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়, এখনো কাউকে কাপড় দিতে পারি নাই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাজার করেছিল বাংলাদেশকে। এখানে এমন কল-কারখানা করতে দেয় নাই, যা থেকে মানুষ তাদের নিজেদের জিনিস ভোগ করতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠী সেখানে কারখানা স্থাপন করে এখানে মাল বিক্রি করতো। আশি ভাগ জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসতো। বিক্রি করে পয়সা নিয়ে যেতো। এই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশে এসেছিলেন। আশিজন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সার্ভে করেছিলেন। তারা রিপোর্ট দিয়েছেন। গত মহাযুদ্ধে যখন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করে এবং জার্মানিকে পরাজিত করে, তখন জার্মানিতে যে ধ্বংস হয়েছিল, সেই সমপরিমাণ ধ্বংস হয়েছে বাংলাদেশে। এটা বাংলাদেশের শেখের কথা নয়, এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কথা–যাঁরা বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন। যাঁরা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা অবশ্য জানেন না যে,

জার্মানির লোক এক বছর, দেড় বছর রুটি খেয়েছিল। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা জানেন না যে, রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে একমাত্র লেনিনগ্রাডে ১২ লাখ লোক শীতে মারা গিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনার পরে দেশের যা অবস্থা হয়, তা যাঁরা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা জানেন না। যুগোস্লাভিয়ার কি অবস্থা হয়েছিল, ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর কি অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না। বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার কি অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না। বাংলার অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। কারণ বাংলাদেশ যাদের হাতে ছিল, তারা মানুষ নয়, তারা ছিল অমানুষ। তারা ছিল মানুষের চেয়ে অধম–তারা পশু। তারা মানুষকে হত্যা করে। সিংহ, বাঘ যখন মানুষকে হত্যা করে, তখন এক আঘাতে হত্যা করে। কিন্তু পাকিস্তানী পশুর দল আমার এক-একজন কর্মীকে ধরে নিয়ে মাসের পর মাস অত্যাচার করে হত্যা করেছে।

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। বাংলার মানুষকে কমপক্ষে খেয়ে বাঁচতে হবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে appeal করেছিলাম। তারা এগিয়ে এসেছিল। সাহায্য আমাদের তারা করেছিল। বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রথম লড়াই শুরু করেছিলাম দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলেছিল, ৫০ লাখ লোক বাংলাদেশে না খেয়ে মারা যাবে। কতটুকু করতে পেরেছি, জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। জানি অবস্থা ভয়াবহ, বিরাট আঘাত, বিরাট ধ্বংস। একটা গাছের ফল হতে ৬ মাস সময় লাগে। বিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তার মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে কি লাগে, তা যারা গড়ে তারা বোঝে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। আমি ছিলাম কলোনি। আমাকে সেখানে সাহায্য করেছে। একথা যদি আমি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় হবে। যদি ৮ লাখ, ৯ লাখ টন খাদ্য দিয়ে ভারত আমাদের সাহায্য না করতো, তাহলে কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা। অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না। বাংলা আর কিছু হতে পারে; কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। ১ কোটি লোককে খাবার দিলো, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

গণতন্ত্র জানি, গণতন্ত্র বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের অর্থ আপনি জানেন স্পিকার সাহেব, দুনিয়া জানে। আর দুনিয়ায় এমন ইতিহাস যদি কেউ দেখাতে পারে এতো বড় বিপ্লবের পরে, এতো বড় ধ্বংসস্তূপের পরে যেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ লোকের কাছে বন্দুক ছিল, কামান ছিল, মেশিনগান ছিল, যেখানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবার পরে অনেকের

কাছে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রে আমরা বাংলার মানুষকে মোবারকবাদ না দিয়ে পারবো না। তারা বলল, বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় গণহত্যা হবে। কিন্তু বাংলার মানুষ আমার জেল থেকে ফিরে আসার পরে তারা চেষ্টা করে, সহযোগিতা করে বাংলার মাটিতে গণহত্যা হতে দেয় নাই। এমন কি, যারা আমার বাংলার মানুষকে হত্যা করেছিল, তাদেরকেও হত্যা করতে দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, এখন তাদের প্রশংসা না করে আমাদের গালি খেতে হয়। সেটা ভালো। গালি না খেলে চলবে কেমন করে? যা হোক, আসল কথায় ফিরে আসি। এই যে ধ্বংসস্তূপ, তার মধ্যেই শুরু হয় আমাদের দেশ শাসন। সেই যে অস্ত্র, আমি নিশ্চয় মোবারকবাদ দেব বাংলার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দেব বাংলায় যারা যুদ্ধ করেছে তাদের এবং সমস্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। সামরিক বাহিনী বলেন, মুক্তিবাহিনী বলেন, পুলিশ বলেন, আনসার বলেন, যারা সত্যিকারভাবে দেশপ্রেমিক, যারা সত্যিকারে বাংলাকে ভালোবাসে, আমি নিবেদন জানিয়েছিলাম তাদের প্রতি অস্ত্র সমর্পণ করবার জন্য। প্রায় দেড় লাখ থেকে দু'লাখ অস্ত্র তারা আমার কাছে সমর্পণ করেছিল। কিন্তু দুষ্কৃতকারী সব জায়গায় আছে, সব দেশেই আছে। যুগে যুগে এটা চলে এসেছে। আমাকে হাসতে হাসতে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন। আমি বলেছিলাম, ৬৫ হাজার গ্রামে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। অনেকের চেয়ে, অনেক দেশ অপেক্ষা ভালো। যে দেশে এক এক রাতে, এক এক শহরে ৬০ থেকে ৮০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়, সে দেশ অপেক্ষা আমার দেশের লোক ভালো। বিপ্লবের পরে দেশে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের এবং আমার জনসাধারণের সহযোগিতায় আইন-শৃঙ্খলা অনেকটা ফিরে এসেছে–ভালোভাবেই ফিরে এসেছে। তবুও দুষ্কৃতকারী কিছু আছে। তাদের প্রতি জনগণের সহযোগিতা চাই। কাজেই, শেষপর্যন্ত তাদেরও আত্মসমর্পণ করতে হবে। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েশ থাকে। তাতে কিছু আয় আসে না। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। দেশের মানুষ যখন ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তখন তারাই সব রুখে দাঁড়াবে। দরকার যদি হয়, সরকার এমন থাবা দেবে, যে থাবায় কয়েক দিনের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না, এ ধরনের অবস্থার মধ্যে মাত্র ১০ মাসের মধ্যে কোনো দেশ সংবিধান দিতে পেরেছে। আমি তাই মোবারকবাদ জানাই সংবিধান কমিটির সদস্যদের। মোবারকবাদ জানাই বাংলার জনসাধারণকে, রক্তে লেখা এ

সংবিধানকে। যারা আজ বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত, এ সংবিধান আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের পূর্ব থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই সংবিধানের আলোচনা হতে হতে সংবিধান কি ধরনের হবে, সে সম্পর্কে ভোটের মাধ্যমে শতকরা ৯৮ জন লোক তাদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছে। তাই, সংবিধান দেয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে। দরকার হলে আওয়ামী লীগ আরেকবার ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করবে।

খবরের কাগজ থাকলে বক্তৃতা লেখা যায়, ময়দান থাকলে বক্তৃতা দেয়া যায়; কিন্তু জনসাধারণের কতটা সমর্থন আছে, সেটা পরীক্ষা হয়, যখন জনগণ অধিকার পায় ভোট দেয়ার। সেই জন্যই আজ ১০ মাসের মধ্যে সংবিধান দেশের সামনে পেশ করা যাচ্ছে। সংবিধান ছাড়া কোনো দেশের অর্থ হলো মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা। সংবিধানে মানুষের অধিকার থাকবে, অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে। এখানে Free Style Democracy চলতে পারে না। যে সংবিধান পেশ করা হয়েছে, সেটা যতদূর সম্ভব জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে। এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের আদর্শ পরিষ্কার, এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই আদর্শের ভিত্তিতে এ-দেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ–বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। বাংলার কৃষ্টি, আমার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে গড়া বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণী আর কোনোদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ৫৫ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না, সেই জন্যই অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক। আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে না, বাংলার মানুষ এটা চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তা হলে বাংলার মানুষ তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ বিশ্বাস আমি করি। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার সংবিধান তৈরি হয়েছে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করি। জনগণ এ জন্য সংগ্রাম করেছে, লাখ লাখ লোক এ জন্য জীবন

দিয়েছে। এই আদর্শের ভিত্তিতেই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। সোনার মানুষ ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

জনাব স্পিকার সাহেব, খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেটা পরিষদের সামনে আছে। সে সম্পর্কে পরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হবে। সকল সদস্য এতে সুযোগ পাবে। আমার মনে হয়, আজকে বোধ হয় দুটো Programme আছে– Rules and Procedure-এর। সেখানে Point by point আলোচনা হবে। কমিটি যে কষ্ট স্বীকার করে এবং পরিশ্রম করে পরিষদে খসড়া পেশ করেছেন, সেটা যদি আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে এর কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করলে এর ফল ভালো হবে, দেশের মঙ্গল হবে, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা তা গ্রহণ করবো। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিই চূড়ান্ত করে নাই, দু'একজন যারা নির্দলীয় বা বিরোধী পার্টির সদস্য রয়েছেন, তারা যাই বলুন, আমার কোনো আপত্তি নাই। যদি আপনাদের ভালো সংশোধনী থাকে, নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গলের জন্য উদার মন নিয়ে আমরা তা গ্রহণ করবো। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি সংশোধনী পেশ করবেন, তা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবো। এটা খসড়া সংবিধান। কমিটির সদস্যরা তা প্রণয়নে পরিশ্রম করেছেন। বিশেষ করে, এর জন্য চেয়ারম্যানকে প্রশংসা না করা হলে অন্যায় করা হবে। ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সহকর্মীরা পরিশ্রম করেছেন। Rules and Previlege কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। এ জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর ফলে সদস্যরা সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পাবেন। আমি পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি; যদি এর কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তা হলে, নিশ্চয়ই তা করা হবে। তবে, এটা কোনো আইন নয়, এ বছর পেশ করা হলো আবার আগামী বছর এর পরিবর্তন করা হবে; এটা হলো সংবিধান, এটা হলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা নির্দেশনামা।

আজ স্বাধীন বাংলার স্বাধীন মাটিতে আমার পতাকা ওড়ে, 'আমার সোনার বাংলা' গান হয়। সোনার বাংলার মুক্ত হাওয়ায় বসে আলোচনা করছি। আজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু থাকতে পারে না। এরই স্বপ্ন দেখেছি অনেক দিন আগে, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি যে, কবে স্বাধীন বাংলার মাটিতে বসে স্বাধীন বাংলার সংবিধান দিতে পারবো। সেই চিন্তা আজ বাস্তব

ফল লাভ করেছে। কিন্তু যখন রক্তের কথা মনে পড়ে, তখন যেন অভিভূত হয়ে পড়ি।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে বাংলার মানুষ গর্বিত, আমার দল গর্বিত, পরিষদ সদস্যরা গর্বিত যে, আজ আমরা স্বাধীন বাংলার মাটিতে খসড়া সংবিধান দিতে পেরেছি। আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ সংবিধান মানুষের সামনে পেশ করতে পারবো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আটকে রাখবার জন্য রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আইন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতো। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য আওয়ামী লীগ রাজনীতি করেছে এবং সেই মুক্তি আজ হয়েছে।

সংবিধান দেয়ার পরে দেশে নির্বাচন হবে, তাতে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট না দেয় না দিক, যাঁদের ভোট দিবে, তাঁরাই ক্ষমতায় আসবেন–এতে আপত্তির কিছুই থাকবে না। তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি যে সমস্ত সরকারি অফিসার এ কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবিধান যাঁরা প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এটা দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাঁরা একবার গদি পায়, তাঁরা আর সে গদি ছাড়তে চায় না। তাড়িয়ে না দিলে গদি ছাড়ে না। অথচ আমার গণপরিষদ সদস্যরা সংবিধান দিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁরা আবার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন তাঁরা আর গণপরিষদে আসবেন না, আসবেন পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে। তাই তাঁদেরকে আপনার পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ দুনিয়ায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই নির্বাচন দিয়ে। বাংলার মানুষের জয় হোক। জয় বাংলা। ধন্যবাদ।

চারটি মৌলিক আদর্শের উপর শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিচে উদ্ধৃত হলো।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আজ প্রথম সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদান করছে। বোধ হয় নয়, সত্যিই প্রথম–বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে গণপরিষদে এসে তাদের দেশের শাসনতন্ত্র প্রদান করছেন। আজ আমাকে অনেক কিছু স্মরণ করতে হয়, অনেক দিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কেবল এইটুকু বলতে চাই, তদানীন্তন ভারতবর্ষ, যাকে আমরা উপমহাদেশ বলতাম–সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে তার হিসাব করলে দেখা যাবে তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই রক্তদান করেছে বেশি। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বাংলায় এমন কোনো জেলা, এমন কোনো মহকুমা ছিল না যেখানে সে আমলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশের জনসাধারণ বহু যুদ্ধ করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বার বার সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা জেল-যন্ত্রণা ভোগ করেছে বহুবার, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে অনেক। কিন্তু দুঃখ, বাঙালির জীবনে সুখ কোনো দিন আসে নি। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠাট্টা করে একবার আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমি তোমার দুঃখের কারণ। তাই বোধহয়, শকুনিদের বারবার এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কারণ তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল। দুনিয়ার সেইসব লোভীরা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের যারা

শাসক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। গৃহহারা সর্বহারা কৃষক-মজুর দুঃখী বাঙালি যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় নি, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে করাচী, ইসলামাবাদ, লাহোর। গড়ে উঠেছে ডান্ডি, গ্রেট ব্রিটেন। এই বাংলার সম্পদ ছিল বাঙালির দুঃখের কারণ। সংগ্রামী বাঙালিরা বার বার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাঁদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়; কারণ বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা, স্মরণ করতে হয় সোহরাওয়ার্দী মরহুমের কথা, আরো স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা– যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেসব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যাঁরা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ৯ মাসই হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই। ৯ মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বহুদিন আগে থেকে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ করে সংখ্যায় মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সব কিছু হারিয়ে ফেলে। জনাব জিন্নাহ সাহেব, যাঁকে অনেকে নেতা বলে মানতেন, বাঙালিকে এক শকুনের হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচীতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি জিন্নাহ সাহেব মরার পূর্বে তাঁর সম্পত্তির যে দলিলপত্র করে গিয়েছিলেন সেই দলিল অনুসারে ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচী স্কুলকেও তিনি কিছু দান করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কোনো মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই। বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি, এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোনো দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ পাই না এক বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর খুব বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রাশিয়ান ভাষায়, ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চায়নিজ ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ নাই, একমাত্র বাংলাভাষা ছাড়া। এই

কারণে বাঙালিদের মধ্যে যেমন ত্যাগ ও সাধনা করার শক্তি ছিল তেমনি পরশ্রীকাতরার মনোভাবও দেখা গেছে। বাংলাদেশের যে সকল নেতারা সংগ্রাম করেছেন আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই; আমরা বুঝেছি মি. জিন্নাহ বুঝি আমাদের নেতা হয়ে চলে এসেছেন বোম্বাই থেকে। যা হোক, সেই ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পিকার সাহেব, ১৯৪৭ সাল থেকে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমা শক্তিকে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের একদল লোক ছিল–যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বার বার হাত মিলিয়েছে, তারা বার বার চরম আঘাত হেনেছে আমাদের উপর। আঘাত হেনেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫৪ সালে। এমনকি ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র রচনার সময় যখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে তখনো বাঙালিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মেলায় মন্ত্রিত্বের লোভে। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। যখন পশ্চিমারা দেখে বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করে। তাদের শক্তি ছিল একটা, সেই শক্তি তাদের সামরিক বাহিনী। ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকা বেছে নিয়েছিল, সেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হত। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হতো না। বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হতো না। কারণ, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে – এই হচ্ছে তাদের দোষ। ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় ছিল বেশি, বুদ্ধিতে ছিল ভালো, লেখাপড়া ভালো জানত, আক্কেল তাদের প্রখর ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার তারা মার খেয়ে গেল। যদিও তা পূরণের জন্য আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হককে ঘরের মধ্যে অন্তরীণ করা হয়। আমি সহ

৫০ জন সহকর্মী, যাঁরা তদানীন্তন এম.এল.এ. ছিলেন তাদেরকে এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। যখন মানুষ আমাদের একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পাওয়া যেত না, আত্মীয়স্বজন ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না। সে যুগে, ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ্ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এ দেশে বিরোধী-দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি, তবে অন্যায় করা হবে। তাঁদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আরও স্মরণ করি তাঁদের কথা, যাঁদের রক্তে এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথ-ঘাট, রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, যে লক্ষ লক্ষ মা-বোন জীবন দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে তাঁদের কথা। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্র-হারা। কত বোন আজ স্বামী হারা। কত পিতা আজ সন্তান হারা। কত সংসার যে আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই। পশ্চিমা শোষকরা শেষপর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক-একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বলেছিলাম, যে জাতি যত রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনও কেউ পদানত করতে পারে না – সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। অনেকে দালালী করেছেন প্রগতির নামে। ইয়াহিয়া খানের দালালী, আইয়ুব খানের দালালী করেছেন। আজকের অনেকেরই তখন রাজনৈতিক জীবনের জন্ম হয় নাই – তাঁরাও অনেক সময় আজ সমালোচনা করেন আমাদের। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন – সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া সৎসাহসের কাজ। গত সংগ্রামের সময়, ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেফতার করা হয়, সেই সময় আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে – গিয়ে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও! ২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ই.পি.আর., বাঙালি পুলিশ, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগ কর্মী ও

নেতৃবৃন্দের উপর। এবং যারা এদেশের দুঃখী মানুষ, তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সারা বাংলাদেশে সেই ২৫ তারিখ রাত থেকে অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে। যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হবে, মনে হলো এই বুঝি আমার শেষ। তখন চেষ্টা করলাম, কি করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়া যায় এবং তা আমি পৌঁছিয়েও দিয়েছিলাম। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সে আগুন আমি দেখেছি। তাদের শুধু বলেছিলাম তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে প্রাণে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তারা আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। হালাকু খাঁর কাহিনী পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর কাহিনী পড়েছি, হিটলার মুসোলিনীর কাহিনী পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে তা দেখি নাই। তারা দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে "বল জয় বাংলা" লেখা এঁটে গাছের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। মানুষ এত জঘন্য পশু না হলে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর কি পাশবিক অত্যাচার করতে পারে? তারা লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্তের স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয়।

আওয়ামী লীগ, আমার সহকর্মীরা বা আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার ক্ষমতা মন্ত্রীত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেইজন্য সংগ্রাম করেছিলাম।

জনাব স্পিকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ অনেক সময় আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা সবাই তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে

গিয়েছিল। এই পরিষদের এমন কোনো সদস্য নেই, যার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করা হয় নাই। আজ অনেকে এদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কারণ যে কাজ করে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে। যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না। আওয়ামী লীগের এমন অনেক সদস্য, আমার কর্মী ভাই-বোন আছে, যাদের ঘর-বাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায় নি। সেদিন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বুঝতে পারছিল না তারা কী করবে, আমি তাদের কাছে নাই। আমি ঘোষণা করে বলে গিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় এক সঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু কর এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নাই, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নাই। সেই ভাঙ্গাচোরা দল অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে তারপর পুরোদমে সংগ্রাম করে চলে। নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, সাবেক ই.পি.আর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তখনও তারা অন্যান্য জায়গা থেকে অস্ত্র পায় নি। দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করে। সেইভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ভালো ভালো আধুনিক অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দেয় ; কিন্তু পদানত হয় নি বাঙালি। সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যাঁরা আজ পঙ্গু হয়ে বসে আছে। তাঁদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য 'ট্রাস্ট' করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয় করে। সেখান থেকে তাঁরা পেনশন পাবে সারা জীবন। আমি আরো স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা-বোনের কথা। দুই লাখ নির্যাতিতা মা-বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানী সেই দস্যুরা– যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার

করতো, 'মুসলিম বাংলা' বলে চিৎকার করতে লজ্জাবোধ করে নাই। সেই দুই লাখ মা-বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, সেসব কথা আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছি, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। কোনো দেশে কোনো যুগে আজ পর্যন্তও এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। স্বাধীনতার পর দেশের যে অবস্থা বিরাজ করছিল, জনসাধারণ তা জানে। বৈদেশিক মুদ্রা কয় পাউন্ড ছিল, তা সকলের জানা আছে। রাস্তা-ঘাটের কী অবস্থা ছিল, এসবই আপনাদের জানা আছে। মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনি-মাত্র ছিল। শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী মাল এখানে বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায় যাবার বেলায় তারা গর্ব করে বলে যায়, বাঙালি যে স্বাধীনতা পেল, তা আর কতদিন, দেশকে এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পিকার সাহেব, বিপ্লবের পর নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হলো, আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী। এই জনগণের উপর আস্থা নিয়েই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি। সেইজন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমরা অনায়াসে শাসন চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোট দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে। কিন্তু, তা আমরা চাই নি, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীর একজনও আপত্তি করে নাই যে, আমরা পরিষদ ভাঙ্গবো না। এজন্য আমি গর্বিত। যাঁরা এই পরিষদের সদস্য হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ-সদস্য, তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারও কিছু বলার

অধিকার ছিল না। কেননা, কনভেনশনে রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করা হয় নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, এটা তার আর একটি প্রমাণ, সে শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে যাবে। আজ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বক্তৃতা করেছেন। একজন বিপক্ষে আছেন এবং দুইজন স্বতন্ত্র দলে আছেন তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে এখানে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা এখানে আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন। তাতে আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন, তাতেও আপত্তি নাই জনগণই ঠিক করে দেবে কে এখানে আসবে আর কে আসবে না। নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হলো আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিহীন নৌকার মতো। আমি মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে তারা খসড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছেও। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এখানে এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। অথবা আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই কিংবা কেউ এসে আমাদের 'মার্শাল ল' জারি করে বসিয়ে দেন নাই। 'মার্শাল ল' জারি আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, emergency! No democracy! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোনো সমালোচনা চলবে না! কোনো কথা চলবে না! কোনো মিছিল হবে না! কোনো পার্টির কাজ চলবে না! কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা সহজেই করা যেত। সব দেশে, সব যুগে, বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ। কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির উৎস হল জনগণ।

জনাব স্পিকার সাহেব, ৪টা মূল স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও

অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। এই যে ৪টা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো– এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি। মূল ৪টা স্তম্ভ – জনগণ ভোটের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয় – ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনও জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্পর্কে আর নতুন সংজ্ঞা নাইবা দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি যে বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি। এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে কোনও জাতি বড় হতে পারে না। এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক-জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে – তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার উপর ভিত্তি করে সেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রকেটশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের

সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক সিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয়ই আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স-কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাট-কল, চিনির কারখানা – সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি, তার মানে হলো, শোষক-গোষ্ঠি যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয়, সোশ্যালিজম অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যাঁরা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাঁদের আগে বোঝা উচিত সমাজতন্ত্র কী। সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয় – অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিন সময় প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি – শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সব কিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই – সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার বামে বাস করেও যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে। ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে তারা কোনোদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ, লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না –

যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের 'রীতিনীতি', তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে, তারাও সেগুলি করতে পারেন নাই। এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে – তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে – কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে – তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। তাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে নিয়ে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার – এই বাংলাদেশের মাটিতে এ সব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয় নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

কোনও কোনও বন্ধু বলেছেন, সিডিউলে এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পিকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না – ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কি করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন

যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারি কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোনো ভিন্ন শ্রেণী নন। ইংরেজ-আমলে তাদের প্রটেকশন দেওয়া হতো, সেই প্রকেটশন আবার পাকিস্তান-আমলেও দেওয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই প্রটেকশনের উপর আঘাত করেছি – অন্য জায়গায় আঘাত করি নি। এই শ্রেণী রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারেন না। সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন, সেবক। Some people came to me and wanted protection from me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen." আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাব আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি। কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে। আজ যে কাজ করবে, এবং লোকে তাকে কতটুকু ভালোবাসে, তার উপর নির্ভর করবে তার প্রমোশন। প্রমোশনের ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদেরও অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে। আমরা সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি গঠন করেছি। সেই কমিটির সদস্যদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ১২৫টি স্টেপ বা প্রাদেশিক সরকারের ৩৩টি স্টেপ আমরা রাখবো না। এই ১২৫ ও ৩৩টি স্টেপের মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে অনেক প্রমোশন হতো। মাত্র সাত আসমান– অর্থাৎ ৭টি স্তর– এর বেশি স্টেপ সরকারি চাকরিতে থাকবে না। এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছেন এবং এম.সি.এ. দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন। বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে

জন্মলাভ করেছি। আমরা ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমঘা' নিয়ে বেড়াই নি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে, রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন, ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের এই প্রটেকশন পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম কর, ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাঁরাই আবার সভা করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিসগুলোতে দালালে ভরে গিয়েছে। দালাল আছে সত্য যাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাই তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়। তারপর আর এক কথা। কাজ না করে টেবিল-চেয়ারে বসে থাকা, আজকাল যে একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed। ঐ C.S.P., P.S.P. বাংলাদেশের থাকবে না। সরকারি চাকুরিতে ৭টি স্তর থাকবে। সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি করা হয়েছে। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তাঁরা কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে। স্ক্রুটিনি কমিটি করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা বেতন পাবে, কেউ ২ হাজার টাকা বেতন পাবে – তা হতে পারে না। সকলে বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সব কিছু পাবে, আর একজন পাবে না – তা হতে পারে না। বেতন কমিশন সরকারি কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। দেশে এ রকম কোনো পার্টি আছে কিনা, জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোনো পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায়, সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুন, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায় নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুন, আমরা বিরোধী দল। তা না হলে বলুন, এই এই আমাদের দাবি।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করতে হলে ethics মানতে হয়। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লাখ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেলওয়ে ব্রিজ নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৮৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরা মেহেরবানী করে যান না, রিলিফ কমিটি করে চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি কিছু খাওয়াইতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াইতে পারেন, তাহলেও বুঝি যে, দেশের লোকখের জন্য কিছু করছেন। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠার জন্য বক্তৃতা করে গণতন্ত্র চাই বললে কী হবে? গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সাথে সাথে কর্তব্যও রয়েছে। সেই জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করার সময় আমরা ৪টি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি। আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেই জন্য, জনাব স্পিকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে। জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বছর, আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা। আমরা শাসনতন্ত্র প্রদান করেছি, এর উপর আইন পাস হবে– যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভায়েরা ভুল করেছেন, শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র একটি জিনিস– যার একটা আদর্শ, নীতি থাকে, সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন পাস করতে হয়। অনেকে ভুল করেছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই; তাই বুঝতে পারেন না কিংবা বুঝতে চান না। শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই মৌলিক নীতির উপর ভবিষ্যৎ এসেম্বলিতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক নীতির বিরোধী কোনো আইন হতে পারবে না। শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষকতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী, সেইসব শোষকদের অধিকার খর্ব করা হবে। শোষকদের ভোটের অধিকার দেয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবো, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা দালালি করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক-মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে, মিলিটারির কাছে দিয়েছে। নানাভাবে তারা দালালি করেছে। স্পিকার সাহেব, এই অ্যাসেম্বলিতে যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন তার আশপাশে এবং এই এ্যাসেম্বলির এমন কোনও দেয়াল নাই যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভায় সেসব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান, সেখানে তারা ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেয়ালের সেইসব দাগ দেখেছেন কিনা জানি না। এই পরিষদে যারা কর্মচারী আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায় দেয়ালে রক্তের দাগ। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেয়ালের গায়ে 'জয় বাংলা' লিখে গিয়েছে। এই অ্যাসেম্বলির হলের মধ্যে তারা দালালদের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে। নিরপরাধ যারা আছে তাদের খালাস দেয়া হবে, কিন্তু যারা তাদের সাথে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের – যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের আসন খালি করিয়ে আচকান গায় দিয়ে উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার

দেয়ারও জনগণ আপত্তি করেছে। জনগণ তাদের বাইরে পেলে কেটে ফেলতো, তাঁদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি। যাই হোক, আমরা সংবিধানের সিডিউলে যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনামলের কিছু কছু আইনকে আমরা প্রটেকশন দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না হলে লিটিগেশন করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলোর প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির প্রয়োজন হবে। কতকগুলো শুধু মেজরিটিতেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার পার্থক্য না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেইদিন, যেদিন জল্লাদ-বাহিনী রেসকোর্স-ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্রবাহিনীর যুক্ত কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখে। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পিকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা স্মরণে রাখতে চাই। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবি করতে পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে মূল সংবিধানে দস্তখত করবেন। ১৪ ও ১৫ তারিখের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পিকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করতে চাই। আমি নির্বাচন কমিশনারের সাথে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করেছি যে, নির্বাচনের তারিখ স্থির করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। সেইদিন, যেদিন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলাম : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই ৭ই মার্চ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবে বলে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এ ব্যাপারে আবেদন করবো।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার ধৈর্য্য আমি আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় এখানে ছিলাম। আপনাকেসহ পরিষদের সকল কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই, যারা কষ্টের ভিতর কর্তব্য পালন করেছেন, সেইসাথে সরকারি কর্মচারীদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তারা শ্রদ্ধার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমি যদি সাংবাদিকদের কিছু না বলি তাহলে মহা অন্যায় হবে, তাই শ্রদ্ধার সাথে বলি আপনারা যে এত কষ্ট করেছেন– এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন, বসবার জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই, এই কষ্টের মধ্যে যে ভালোভাবে পরিষদের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট স্বীকার করবেন। কারণ, নতুন পরিষদ ভবন না নেয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমারও নাই। আর, দেশবাসী যখন কষ্ট করছে, তার কিছু ভাগ আমাদেরও নেয়া উচিত। জনাব স্পিকার সাহেব, এই কক্ষের পক্ষ থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পিকার সাহেব আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, তারপর, যাঁরা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে শাসনতেন্ত্রর জন্য ২/৩ শিফটে কাজ করতে হয়েছে, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন সদস্যকে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন ১১ই এপ্রিল তারিখ থেকে। সেই ১১ তারিখে আমরা শাসনতন্ত্র কমিটি গঠন করি– তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত-নির্বিশেষে আপনাদের কাছে যে কোনও প্রস্তাব হোক বা কোনও মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিশনের কাছে পাঠাবেন। যদিও তা দু'একটা কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজে বিবৃতি দেন, মাঠে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। অন্য মানুষদের কাছ থেকে, অধ্যাপকদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি– সেটা সাহায্য করেছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যাঁরা মানে না, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, যারা এই ধরনের লোক আছেন– তারা কষ্ট করে এক কলমও লিখে পাঠান নাই। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। কথায় আছে জাত যায় না ধুলে, খাসলত যায় না মরলে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের বিপদসমূহের কথা– যেসব থেকে আমি উদ্ধার

পেয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালন করলো। কিন্তু জনতার শাসনতন্ত্র কোনো কিছু লেখা হয় না। তারা এটা গ্রহণ না করলে প্রবর্তন করা হবে না, ব্যবহার না করলে হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে আমার জীবন সার্থক। স্পিকার সাহেব, আজ বিদায় নেয়া হচ্ছে, সদস্যরা আবার সই করতে আসবেন। যাঁরা ৫ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন, তাঁরা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিলেন, যে উদারতা দেখালেন তা বিরল। ভবিষ্যতে যারা এখানে আসবেন তারা যেন তা উপলব্ধি করেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

বাংলার দুঃখী মানুষের নিকট থেকে সরে যেও না

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিচে উদ্ধৃত হলো।

সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, বিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা,

আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এবারই নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য হিসেবে প্রথম আপনারা সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কর্মী ভাইয়েরা, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, আপনারা জানেন, হাসি-কান্নার ইতিহাস, রক্তের ইতিহাস, অত্যাচারের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, জয়ের ইতিহাস। আপনাদের সাথে বাংলার মাঠে-প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামে আমি কাজ করেছি। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকে প্রথমে আমি যোগদান করি যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। ৫৩ সাল থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত কাজ করি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং ৬৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে। গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হলে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক কিংবা কর্মকর্তা হওয়া যায় না। তবুও গতবার আপনারা আমাকে কিছুদিনের জন্য দায়িত্বভার দিয়েছিলেন আপনাদের সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য। আজ আপনাদের নতুন করে প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হবে।

আপনারা জানেন কিভাবে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। আমরা বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম। দুই শ' বছর ইংরেজ এ দেশে শাসন করে। দুইশ' বছর পরে ১৯৪৭ সালে এক ফাঁকির স্বাধীনতা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো। আমরা বাংলাদেশের জনগণ সংখ্যাগুরু ছিলাম। কিন্তু বাংলার মানুষকে শোষণের পর শোষণ করার জন্য সামরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে নতুন করে বাংলাকে পরাধীন করে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কলোনিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করে

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গড়ে তোলে তাদের দেশকে। কিন্তু বাংলার মানুষ চুপ করে থাকে না।

এসব শাসন-শোষণ ও সংগ্রামের অনেক ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। কারণ অনেক আন্দোলনের মধ্য থেকে আপনাদের জন্ম। অনেক রক্ত দিয়ে আপনাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। আপনাদের বারবার মোকাবিলা করতে হয়েছে শোষক শ্রেণীকে, মোকাবিলা করতে হয়েছে একদল মীরজাফরকে। বাংলাদেশের একদল শোষক যদি হাতে হাত না মিলাতো তাহলে ২৫ বছর পাকিস্তানীরা বাংলাকে শোষণ করতে পারত না। যতবার আমরা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছি ততবারই এই বাংলার মাটিতে একদল লোক সেই শোষকদের হাতিয়ার হিসেবে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। বারবার আমরা এদের মোকাবিলা করেছি। বারবার আমরা মার খেয়েছি। অবশেষে আমরাও চরম আঘাত হেনেছি, যে আঘাতে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সহকর্মী ভাইয়েরা ও বোনেরা, ১৯৪৭ সালের পূর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম; তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা স্বাধীন হবো। কিন্তু '৪৭ সালেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছি। এর মধ্য থেকেই আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। জনগণ তখন বুঝতে পারে নাই। শোষক গোষ্ঠীর নায়করা এখানে শক্তিশালী সরকার গঠন করে। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে। এই অবস্থায় আমরা কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করি।

আমার মনে আছে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আমরা ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ লীগ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। উদ্দেশ্য শোষক গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু আমরা এগুতে পারলাম না। অনেক সময় থিওরি ও প্রাকটিসে গণ্ডগোল হয়ে যায়। থিওরি খুব ভালো। কাগজে-কলমে থিওরি অনেক মূল্যবান। পড়ে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাগজের সাথে মিল না থাকলে থিওরি কাগজে-কলমে পড়ে থাকে, কাজে পরিণত হয় না।

তখনকার দিনে একদল লোক এ ধরনের থিওরির অনুসারী ছিল। এ সময় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন রণদিভে। তিনি পি. সি. যোশীকে তাড়িয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হন। তিনি বললেন, এখনই অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবিলা করা দরকার। পণ্ডিত জওহেরলাল

নেহেরু সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাঁরা এদিক-ওদিক আঘাত হানলেন।

আমাদের এখানেও কিছু সংখ্যক কর্মী বুঝতে না পেরে সেই পন্থা অবলম্বন করতে গেলেন। আমাদের সাথে তাঁদের অমিল হলো। আমরা বললাম, দেশের মানুষকে না গড়ে তুলে, দেশের মানুষকে মোবিলাইজ না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ না নিয়ে চলা যায় না। তাঁরা বুঝতে পারলেন না। ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ লীগ ভেঙে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন শোষণ করতে চায় তখন তারা আঘাত করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর, ভাষার উপর। তাকে ধ্বংস করতে না পারলে শোষণ করা সহজ হয়ে উঠে না। তাই, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার উপর আঘাত হানলো। সংখ্যাগুরু লোকের ভাষার উপর আঘাত করে আমাদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলো। তখন একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ। জিন্নাহ সাহেব তখনো বেঁচে আছেন এবং তাঁর দলের লোকেরাই বাংলাদেশে শাসন চালিয়েছিল। তাদের শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, অর্থ ছিল। বিদেশী শক্তি তাদের পিছনে ছিল। আমরা ভাষার উপর এ আঘাত সহ্য করতে পারলাম না। তারই ফলশ্রুতিতে '৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম হয়। ১১ মার্চ তারিখে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন শুরু করি। ঐ তারিখেই অন্যান্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে আমরা শোষক গোষ্ঠীর আঘাতের মোকাবিলা করি।

আজ মনে পড়ে আমার বন্ধু ও সহকর্মী শামসুল হকের কথা, যাঁর সাথে অনেকদিন কাজ করেছি। তিনি আর ইহজগতে নাই। তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কথা যদি আজ আমি স্মরণ না করি, অন্যায় করা হবে। মরহুম শামসুল হক আর আমি একসাথে গ্রেপ্তার হই। তারপরেই আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। আমরা বুঝতে পারলাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। তা না হলে আন্দোলন করা যাবে না, তাই আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আমাদের সহকর্মীদের মোবালাইজ করতে শুরু করলাম।

আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হলো। আমরা সেখানে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করবো বলে ঠিক করলাম। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আমি যখন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে

বন্দি তখন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আমাকে যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন।

অনেকে ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের তথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আপনাদের জানা দরকার। আমরা তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার উপর ও আমার দেশের উপর যে আঘাত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তার মোকাবিলা করা হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। এ কথা আজ বলতে পারি কারণ আজ পুলিশ কর্মচারীর চাকরি যাবে না। সরকারি কর্মচারীর চাকরি যাবে না। কথা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করবো, আর ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। জেলে দেখা হয় বরিশালের মহিউদ্দিন সাহেবের সাথে। তাঁকে বললাম, আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। তিনি বললেন, আমিও অনশন ধর্মঘট করবো। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের।

তারা চরম আঘাত করলো ভাষার উপর, কৃষ্টির উপর। চরম আঘাত হানলো আমাদের উপর। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হয়। আওয়ামী লীগের কণ্ঠ রোধ করে দেয়া হলো। আওয়ামী লীগের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীদের পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এভাবেই আমাদের দিন কাটতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাই। একদিনে সংগ্রাম হয় না। একদিনে জয় হয় না। একদিনে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য চাই নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

সহকর্মী ভাইয়েরা, আজ এসব কথা কেন বলছি? এ জন্য বলছি, এতকাল পর্যন্ত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কাজ চালিয়েছি। আজ আমার বিদায় নেয়ার পালা। আজ আমি আপনাদের প্রেসিডেন্ট থাকতে পারি না। আজ আপনাদের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। কারণ আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এটাই আমার সভাপতির শেষ ভাষণ। এই জন্যই আপনাদের কাছে আমার কিছু বলা দরকার। এ জন্যই আমি সংক্ষেপে আওয়ামী লীগের কিছু ইতিহাস বলছি। এই প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করলেই বক্তব্য আমি দেবার পারি না। কত

চেহারা ভেসে ওঠে আমার সামনে। কত ত্যাগী কর্মী কারাবরণ করেছে। কত ভাই, কত সহকর্মী শহীদ হয়েছে। এঁদের সাথে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছি। কত দিন আন্দোলন করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। তাঁদের কথা স্মরণ না কালে অন্যায় করা হবে। কারণ, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু তাঁরা আমাদের মধ্যে নাই।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চরম আঘাত আসে আওয়ামী লীগের উপর। শোষকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা ও কৃষ্টির উপর হামলা চালায়। অত্যাচার চালায় বাংলার মানুষের উপর। কিন্তু আমরাও বসে থাকি নাই। বাংলার জনগণ, বাংলার ছাত্র সমাজ, বাংলার যুব সমাজ, বাংলার প্রগতিশীল কর্মীরা এই হামলার মোকাবিলা করতে থাকে বারবার। কিন্তু অপর পক্ষ ছিল বড় শক্তিশালী। তাদের হাতে ছিল অস্ত্র, মেশিনগান। তাদের কাছে ছিল অর্থ, তাদের হাতে ছিল ধোঁকাবাজি। তারা বিশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো ধর্মের নাম। আমার বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাই ধর্মের নামে ধোঁকা দেয়া যত সহজ, অন্য কিছুতে ততটা সহজ নয়। তাই ধর্মকে তারা ব্যবহার করলো বাংলার মানুষকে শোষণ করার অস্ত্র হিসেবে।

১৯৫২ সালের আন্দোলনের পরে শোষকগোষ্ঠী দেখলো যে, বাংলা ভাষাকে এভাবে দাবানো যাবে না। তাই তারা ছলেবলে-কৌশলে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এবং আমাদের আন্দোলনকে বানচালের চেষ্টা করতে আরম্ভ করে।

ভাই ও বোনেরা, ১৯৫৪ সালের ইতিহাস আপনারা জানেন। আমরা '৫২ সালে জেল থেকে বের হয়ে আসি। '৫৩ সালেও আমাদের অনেক কর্মী গ্রেপ্তার হয়। ১৯৫৪ সালে একটা নির্বাচন দেয়া হলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই যুক্তফ্রন্ট। বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হক তখন চিফ মিনিস্টার হন। কিন্তু পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী আঁতকে ওঠে। তারা বাংলার মানুষকে একতাবদ্ধ হতে দেবে না। তাই আবার তারা আঘাত হানার চেষ্টা করে।

যেদিন আমি মন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলার কেবিনেটে শপথ নিয়েছি সেদিনের কথা আমার মনে আছে। ঠিক সেই সময় এক ঘণ্টার মধ্যে আদমজীতে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। তারা ষড়যন্ত্র করলো এই

সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাই সৃষ্টি করলো তাদের দালালদের দিয়ে এই দাঙ্গা। মানুষের জন্য তাদের কোনো দরদ ছিল না। মানুষকে তারা ভালোবাসতো না। ক্ষমতাকেই তারা বড় করে দেখতো। তাই '৫৪ সালে তারা দাঙ্গা বাধালো আদমজী পাটকলে। আমার মনে আছে, পাঁচশ'রও বেশি লোক সেখানে মারা যায়। শপথ নিয়েই সেখানে আমরা দৌড়ে যাই। উপস্থিত হই। মোকাবিলা করি। মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করি।

১৯৫১ সালেও তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে বাংলার মাটিতে। এতে এ দেশের অনেক নিরীহ লোক জীবন দেয়। এই দাঙ্গা তারা সৃষ্টি করে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার জন্য। কারণ, বাংলাদেশে যদি বিভেদ সৃষ্টি করা না যায় তাহলে তারা শাসন ও শোষণ চালাতে পারবে না। এমনি করে তারা চালায় তাদের ষড়যন্ত্র। আমার মনে আছে তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদের ৫০ জনের মতো সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমাদের কয়েক হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হয়। বাংলার মানুষের উপরে অত্যাচারের স্টিম রোলার চলে। কিন্তু আমরা নিরুৎসাহিত হই নাই। আমরা আরো সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করার চেষ্টা করি। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। আওয়ামী লীগের পরিষ্কার আদর্শ আমাদের সামনে ছিল। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ছিল। তাদের কর্মী ছিল, তাদের প্রতিষ্ঠান ছিল।

সহকর্মী ভাইয়েরা, আমাদের রাষ্ট্রের চারটি আদর্শ আছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও তেমনি চারটি স্তম্ভ থাকা প্রয়োজন। এই চারটি স্তম্ভ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আমি গর্বিত যে ২৫ বছরে আওয়ামী লীগ সেই স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২৫ বছরের আওয়ামী লীগের কর্মীদের জন্য আমি গর্বিত। বারবার জনগণের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। সঠিক নেৃত্বত্ব ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে। নেতারা চেষ্টা করেছেন সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। নেতৃত্বের সাথে প্রয়োজন আদর্শের। যাকে অপর কথায় বলা যায় ম্যানিফেস্টো। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি আদর্শ কি, এটা থাকতেই হবে। নেতৃত্ব ও আদর্শের পরে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর। নিঃস্বার্থ কর্মী ছাড়া কোনও প্রতিষ্ঠান বড় হতে পারে না, কোনো সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। এরপরে প্রয়োজন সংগঠনের। সংগঠন ছাড়া কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজ সফল হতে পারে না।

সেইজন্য বলছিলাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন। আমি আনন্দের সাথে বলতে পারি যে, আওয়ামী লীগের ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব ছিল, আদর্শ ছিল, নিঃস্বার্থ কর্মী ছিল এবং সংগঠন ছিল–এই ভিত্তির উপরই সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে।

১৯৫৪ সালের পর অনেক ইতিহাস। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাই। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তারপর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলে। কিন্তু শোষকগোষ্ঠী দেখলো যে, এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তাই ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন।

বাংলাদেশ আরো বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কারণ সামরিক বাহিনীর শতকরা ৯৫ জন ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের। তারা বাংলাদেশেও সরকার দখল করলো। মার্শাল ল জারি করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে শোষণ করা। আমরা গ্রেপ্তার হলাম। সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। আওয়ামী লীগ পার্টি ব্যান্ড হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। তাদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা মামলা জারি করা হলো। কিন্তু তারা চুপ করে বসে রইলো না। ব্যান্ড হয়ে গেলেও আওয়ামী লীগের কাজ চলল।

আমরা সংখ্যাগুরু। তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বন্দুকের জোরে বাংলার মানুষের উপর মিলিটারি শাসন আরম্ভ করল। দু'শ বছরে ইংরেজ যা করে নাই–২৫ বছরে পাকিস্তানীরা বাংলার মাটিতে তাই করল। সম্পদ, অর্থ যা কিছু সেখানে জড়ো করল। সেখানে রাজধানী, সেখানে সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার, ইনভেস্টমেন্টের হেডকোয়ার্টার, এসেম্বলি সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হলো।

পনেরশ' মাইল দূরের দুটি অংশ নিয়ে কোনো সময় কোনো একটি রাষ্ট্র বলে আমার জানা নাই। কিন্তু আমারা ধর্মভীরু মানুষ; তাই পাকিস্তানীরা ধর্মের নামে এক রাষ্ট্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করল। আমরা যারা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তারা সংগ্রাম করেছি। যারা বুঝতে চেষ্টা করে নাই তারা তাদের দালালি করেছে।

১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগ পার্টি তখন ব্যান্ড। অন্যান্য পার্টিও ব্যান্ড ছিল। আমরা

জেল থেকে চেষ্টা করলাম, কি করে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়। আমরা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়ে রাখলাম। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে যেখানে ছিল বিপদের সম্মুখীন হয়েও নীতি পরিবর্তন না করে, আদর্শ পরিবর্তন না করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

আমরা চিন্তা করে দেখলাম এদের সাথে আর আমাদের চলবে না। যেখানে আদর্শের মিল নাই, যেখানে মতের মিল নাই, যেখানে ভাষার মিল নাই, যেখানে চিন্তার মিল নাই সেখানে এক রাষ্ট্র চলতে পারে না। আজ কোথায় পাকিস্তান, কোথায় বাংলাদেশ। পনেরশ' মাইলের ব্যবধানে তার সাথে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। এক রাষ্ট্র করা হয়েছিল বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য, কলোনি করার জন্য। তারা সাড়ে ৭ কোটি লোকের বাংলাদেশকে তাদের শিল্প পণ্যের বাজারে পরিণত করে। তাদের কল-কারখানার শিল্পদ্রব্য বাংলাদেশে বিক্রি করে এখানকার অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। আমাদের কিছু কিছু লোক তারা মন্ত্রী হলে খুশি হতেন, পার্লামেন্টের সদস্য হলে খুশি হতেন, সামান্য ব্যবসায়ী হলেও খুশি হতেন। কিন্তু সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কথা তাঁরা চিন্তা করতেন না।

১৯৬৪ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এন্তেকাল করলেন। আওয়ামী লীগকে আমরা রিভাইব করলাম। আবার আমরা আওয়ামী লীগকে অর্গানাইজ করার উদ্যোগী হলাম। এই সময় কিছু কিছু লোক আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে চলে গেল। ভালোই হলো। আবর্জনা যতই যায়, ততই মঙ্গল। কয়েকবারই এরকম হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি হয় না। যাদের আদর্শ নাই, যাতের নীতি নাই, যারা দুর্নীতিবাজ, যারা দেশকে ভালোবাসেন না, তারা যদি প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে যায়; তাতে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় না, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়। তাই ভবিষ্যতেও এ ধরনের লোক প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনাদের আরো শক্তিশালী করতে হতে পারে।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, আমরা আমাদের সহকর্মীদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে যাবার স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর অনেক ভাঙা-গড়া হলো। ১৯৬৬ সালে আমার দেশবাসী জানতে চায় পরিষ্কার রাস্তা কোথায়? বাঙালি কি চায়? তাদের সামনে কি আছে? তখন ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল নামে একটা পদার্থ ছিল। ফান্ডামেন্টাল রাইটস ছিল না, আইয়ুবী শাসন চলছিল তখন বাংলার মাটিতে। অত্যাচারের স্টিম রোলার চলছিল বাংলার মাটিতে–আমার চোখের সামনে। আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম–পরিষ্কার পন্থা

দিতে হবে। বাংলার মানুষকে আর আমরা এভাবে শোষিত হতে দিতে পারি না। মানুষের একদিন মরতে হয়। আমরা বহু অত্যাচার সহ্য করেছি, দরকার হলে আরো অত্যাচার সহ্য করবো। কিন্তু পরিষ্কার রাস্তা দেখাতে হবে। ওদের সাথে আমরা থাকতে পারি না। আমার বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার মানুষকে রক্ষা করত হবে। বাংলার অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সাথে থেকে বাংলার মানুষ তা কোনোদিন করতে পারবে না। এর উপায় কি?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, যাঁরা মনে করেন রাতের অন্ধকারে গুলি করে কিংবা একটা রেল লাইন তুলে দিয়ে টেরোরিজম করে বিপ্লব হয়, তাঁরা কোথায় আছেন তাঁরা জানেন না। এই পন্থা বহু পুরোনো পন্থা। এই পন্থা দুনিয়ায় কোনোদিন কোনো কাজে লাগে নাই। এ পন্থা দিয়ে দেশের মানুষের কোনো মঙ্গল করা যায় না। একটা রাস্তা ভেঙে দিয়ে ও একজন লোককে অন্ধকারে হত্যা করে শুধু শুধু মানুষকে কষ্ট দেয়া হয়। এই টেরোরিজম দিয়ে দেশের বিপ্লব হয় না, হয় নাই, হতে পারে না। জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোনোরকম গণআন্দোলন হতে পারে না। এবং সেখানে কোনো বিপ্লব হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, অনেকে এখনো টেরোরিজম-এ বিশ্বাস করেন। যাই হোক, ভবিষ্যতে তাদের ভুল ভাঙ্গবে। সময় থাকতে না ভাঙ্গলে তাদের ক্ষতি বেশি হবে। জনগণের ক্ষতি তো হবেই, কিন্তু তাদেরও ক্ষতি হবে।

পরিষ্কার রাস্তা হিসেবে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেয়া হলো। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করবেন বলে হুমকি দিলেন। আইয়ুব খান বোকা ছিলেন না। আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন, ৬ দফা আওয়ামী লীগ কেন দিয়েছে। এর পিছনে উদ্দেশ্য কি। পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছে, এর উদ্দেশ্য কি। এবং আমরা জানতাম আমাদের উদ্দেশ্য কি ও কোথায় আমরা যাবার চাই। কি আমরা বোঝাতে চাই। ৬ দফা বাংলার মানুষের মুক্তি সনদ। আমরা মুক্তি সনদ কেন দিলাম, আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন। তাই তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করলেন আমাদের বিরুদ্ধে-সামরিক বাহিনীর কিছু বাঙালি ছেলে, বাঙালি সরকারি কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাঁরা আমাদের কারাগারে বন্দি করলেন। আওয়ামী লীগকে ব্যান্ড করলেন

না, কিন্তু তাঁরা বন্দি করলেন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে। আওয়ামী লীগ ভাঙার জন্য পাকিস্তান থেকে কিছু নেতা এসে তখন চেষ্টা করলেন। ভাঙলেন কিছুটা। কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতা বুঝতে না পেরে যোগদান করলেন তাদের সাথে। আমি তখন কারাগারে বন্দি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, শামসুল হক, জালাল, জহুর, চিটাগাং-এর আজিজসহ আমার বহু সহকর্মীও বন্দি হয়। যারা বাইরে রইল, তারা ৬ দফাকে আঁকড়ে ধরল। তারা মোকাবিলা করল, নেতৃত্ব দিলো। নজরুল ছিলেন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট। এই অবস্থায়ই তারা শুরু করল। শাসকরা পারলো না আওয়ামী লীগকে দাবাতে।

বাংলার ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়াল এর বিরুদ্ধে। গণআন্দোলন শুরু হলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য সব প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করল। তারা আওয়ামী লীগকে সক্রিয় সমর্থন দিলো এবং তাদের সাথে যোগদান করল। আইয়ুব খানের আসন নড়ে উঠলো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উইথড্র হয়ে গেল। আমরা খালাস পেলাম।

আবার একটা ফন্দি করা হলো। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল একটা কনস্টিটিউশন প্রবলেম সলভ করা। আমি আমার সহকর্মী ছাড়াও কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গেলাম আমার সাথে। কারণ আমাদের বুঝতে হবে, এটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স না ধোঁকা।

আসলে এটা ছিল বাংলার শোষণ করার আরেকটা ষড়যন্ত্র। তাই আপনাদের পক্ষ থেকে আমি তা রিজেক্ট করলাম। বলে দিলাম, সংগ্রাম করে বাংলার মানুষ তাদের দাবি আদায় করবে, রাউন্ড টেবিলে বসে নয়।

আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। ইয়াহিয়া খানকে বসিয়ে দেয়া হলো। প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে পড়লেন আর এক জেনারেল সাহেব। তিনি বললেন, নির্বাচন দিবেন। নির্বাচন দেয়া হলো। আমাদের অনেকে বুঝতে পারলেন না। তাঁরা বড় বড় বক্তব্য করলেন, প্রশ্ন করলেন কেন আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি? বাংলার মানুষ যে একতাবদ্ধ, এক; বাংলার মানুষ যে বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ যে মুক্তি চায় তার জন্য আমাদের নির্বাচনে যাওয়ার প্রয়োজন। তাঁর একথা বুঝতে পারেন নাই। বুঝতে পারেন নাই শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য কি।

আমরা নির্বাচনে গেলাম। আমরা ১৬৯টি সিটের মধ্যে ১৬৭টি সিট ক্যাপচার করলাম। দুনিয়া দেখলো, বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ। এই প্রথম একতাবদ্ধ। বাংলার মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স ফিরে আসলো। ইয়াহিয়া খান আঁতকে উঠলেন। শোষকগোষ্ঠী আঁতকে উঠলো। তারা আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলো। আমরা জনগণকে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলাম। জনগণ যে ম্যান্ডেট দিয়েছে, তা থেকে আমরা সরতে পারি না।

তারপরের ইতিহাস চরম ইতিহাস। ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে এগিয়ে নিতে হয়েছে। ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেকে বক্তৃতা করে, বড় বড় তেজি বক্তৃতা, কিন্তু তারা জানে না ১৯৪৭-৪৮ সাল কি ছিল। ১৯৫০, '৫২, ৫৪ সাল কি ছিল। ওরা জানে না ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৮-৬৯ ও '৭০ সাল কি ছিল। ওদের কারো কারো সেদিন জন্ম হয় নাই। অনেকে আন্দোলন দেখে নাই। আন্দোলন কাকে বলে জানে না। কোনোদিন জীবনে জেলের দরজা দেখে নাই। অবিচারের সামনে পড়ে নাই। আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।

তারা ভুলে যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের ইতিহাস ভুলে যায়, কিভাবে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এককভাবে এ দেশের নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট করে। ছাত্র-জনতা, ধর্ম, শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে তাতে যোগদান করেছিল। দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ ছিল, শোষকগোষ্ঠী আঁতকে উঠেছিল। শোষকরা জানতো এবং আমরাও জানতাম যে, আওয়ামী লীগ তাদের দাবি থেকে এক চুলও নড়বে না। কারণ আওয়ামী লীগ কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করে নাই। তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে না। বাংলার মানুষ যা বলেছে তাই হবে। এর পিছনে সরার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই আমি সেদিন বলেছিলাম, ৬-দফা জনগণের সম্পদ, আওয়ামী লীগের আর শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পদ নয়। ওটার সাথে আপোস হয় না। অনেকে গোপনে আপোসের প্রোপাগাণ্ডা করতেন। কিন্তু আমরা জানতাম যে ইয়াহিয়া খান সৈন্য সমাবেশ করছেন।

আজ সকলের জানা দরকার আমরাও বসে ছিলাম না। আমরা যদি বসে থাকতাম; একই সময় একই মুহূর্তে বাংলাদেশের ৫৮টা মহকুমার সশস্ত্র

বিপ্লব শুরু হতো না। রেসিসট্যান্ট মুভমেন্ট শুরু হতো না। শুরু হয়েছিল এ জন্য যে, তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

২৫ মার্চ তারিখে আমি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম, আমি যখন বাংলার মানুষকে ডাক দিলাম তখন আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংগ্রাম উপরের থেকে পড়ে নাই। নজরুল তখন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে করে। তাজউদ্দিন প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল। তারা দেশের এই সংগ্রাম চালায়। অবশ্য আমাদের সহযোগী দু-একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমাদের সমর্থন দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি দিয়েছিল। আমাদের মুজাফফর ন্যাপও দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন প্রতিষ্ঠান ছিল কার? নেতৃত্ব ছিল কার? আজ যারা বড় বড় কথা বলে, কোথায় ছিল তারা? কোথা থেকে তারা এসেছে? কে তাদের কথা শুনতো?

আজকে তারা সংগ্রাম করে গভর্নমেন্ট করতে চায়। ২৫ মার্চ তারিখে কার উপরে আক্রমণ শুরু হয়? আক্রমণ হয় আওয়ামী লীগের উপরে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপরে, রাজারবাগে আমার পুলিশের উপরে, আমার সামরিক বাহিনীর বাঙালি ছেলেদের উপর, আর আমার বি ডি আর-এর উপরে।

এরপর রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্ট আরম্ভ হয়। এরোপ্লেন, জাহাজ না থাকলে তারা কিছুই করতে পারতো না। আমাদের অস্ত্র ছিল না; সামান্য যা জোগাড় করতে পেরেছিলাম সেগুলো সমস্ত জায়গায় বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় পাঠানো হয়েছিল। প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমায় আমাদের কমান্ডার ঠিক করা ছিল। প্রত্যেক জিলায় জিলায় আমাদের কমান্ডার ঠিক করা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন একদিনে হয় নাই। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে ২৫ বছর আগে থেকে। আওয়ামী লীগের জন্ম, সংগ্রামের জন্ম। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের আজ যদি মৃত্যু হয় তবে আমি দেখতে চাই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেন মৃত্যু হয়।

কর্মী ভাইয়েরা, আজ তোমাদের সামনে আমার অনেক কথা বলার আছে। কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে বাংলার স্বাধীনতার জন্য। লক্ষ লক্ষ মা-বোনের আর্তনাদ আজো মোছে নাই, আজো থামে নাই। আজো তাদের চোখের পানি যায় নাই। সেই সংগ্রাম আওয়ামী লীগের এমন কোনো কর্মী নাই যার বাড়িঘর জ্বালাইয়া দেয়া হয় নাই। গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগারদের বাড়ি কোনটা, আওয়ামী লীগের কর্মীর বাড়ি কোনটা,

আওয়ামী লীগের বাম-বা কে–সেইগুলো বেছে বেছে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীকে ধরতে পারলে এক মুহূর্তও দেরি করে নাই, গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক, লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস কোনোদিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিল তারা সকলে জানতো যে ২৫ তারিখে রাত্রে কি ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি–সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ৭ মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চই স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। সহকর্মী ভাইয়েরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আপনারা জানেন, আমি আর বলতে চাই না। ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী কি করেছে আপনারা জানেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, রাস্তাঘাটের অবস্থা, পোর্টের অবস্থা সবই আপনারা জানেন।

১০ জানুয়ারি তারিখে আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আজ আমি বেঁচে আছি, অথচ আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। এ দু'বছর আমার লাইফের এক্সটেনশন হলো। ৫৭ বছর চাকরি হয়ে গেলে সরকারি চাকরি যেমন এক্সটেনশন হয়, তেমনি আবার লাইফেরও এক্সটেনশন হয়েছে। কিন্তু কয় বছর এক্সটেনশন তা আমার জানা নাই। কারণ ওটা খোদার হাতে। তবে দুই বছর পার হয়েছে বলতে পারি। আমার সহকর্মীদের দশা হয়েছিল তাই। ধরা পড়লে আর এক্সটেনশন হতো না, সাথে সাথে শেষ।

তাই আজকে ভেবে দেখুন, যে আদর্শের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন সে আদর্শ কি। কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করলাম? কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিলো? আজ সত্যিই আমরা স্বাধীন। আজ আমার পতাকা ওড়ে। আজ আমার জাতীয় সঙ্গীত বাজে। দুনিয়ার ১১৬টি দেশ আমাদের রিকগনিশন দিয়েছে। আজ আমার কৃষ্টি ও ভাষার উপর কেউ আঘাত করতে পারবে না। আজ বাংলার মাটি আমার, আমি বাংলার মাটির। আজ বিদেশী শোষকরা আমার দেশকে শোষণ করতে পারবে না। আজ সাম্রাজ্যবাদের শোষকদের দালাল বাংলার মাটিতে স্থান পাবে না। আজ আমার বাংলার মানুষকে শোষণ করতে দিব না। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এটা একদিক। আর

একদিক রয়েছে। সহকর্মী ভাইরা মনে রেখ, কোনোদিন আমি আমার কথা না বুঝে বলি না। আমি জেনেশুনেই বলেছিলাম, স্বাধনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ মুক্তি পাবে সেই দিন যেইদিন অর্থনৈতিক মুক্তি দেবো বাংলার মানুষকে। তোমরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছ, দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করেছ। আওয়ামী লীগের সহকর্মীরা এইখানেই তোমাদের পরীক্ষা-অগ্নিপরীক্ষা।

আজ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করি। পাকিস্তান বর্বর বাহিনী পাঁচ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে বাংলার মাটিতে থাকতে পারে নাই। এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার সহকর্মীরা আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনগণ এবং শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার বাংলার মানুষকে যদি সেই দিন আশ্রয় না দিত, যদি সান্ত্বনা না দিত– বাংলার মানুষের দাঁড়াবার জায়গা থাকতো না। পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর লোকেরা আমার দেশের মানুষকে শেষ করে দিত। তাই আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের স্মরণ করি।

কিন্তু বন্ধুত্ব নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, এ বন্ধুত্ব এমনি আসে নাই। দুর্দিনে যে লোক আমার পাশে দাঁড়ায় সেই হলো আমার সত্যিকার বন্ধু। তাই ভারতবর্ষ আমার বন্ধু, আমার স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ভারত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তার ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করবো না। আমার ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতে আমি বাস করতে চাই। আজ আমি স্মরণ করি আমার সহকর্মী ভাইদের কথা, আমার বাংলার জনগণের কথা–যে জনগণ রক্ত দিয়ে গেছে। স্মরণ করি আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের কথা–যারা রক্ত দিয়েছে, যারা মরে শহীদ হয়েছে, যারা আজ পঙ্গু হয়ে আছে। আমি স্মরণ করি সেই মা-বোনদের কথা–যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেই সাথে নিশ্চয়ই আমি স্মরণ করি ভারতে সেই সমস্ত সেনাবাহিনীর জোয়ানদের কথা। ১৪ হাজার জোয়ান, যারা বাংলার মাটিতে রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচিয়েছিল।

ছেলেখেলা নয়। রাষ্ট্র চালানো এতো সোজা নয়। আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, আমি আগেই বলেছি আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। যে জনগণ সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই জনগণ কিন্তু আজো আছে। যদি আজ জনগণ আপনাদের অশ্রদ্ধা করে, যদি আজ জনগণ আপনাদের

ভালো না বাসে, জনগণ যদি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে জনগণ যদি আপনাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, সেই জন্য বাংলার জনগণ দায়ী হবে না–দায়ী হবেন আপনারা, দায়ী হবো আমরা। আপনারা জানতেন না কোনো দিন আপনারা ক্ষমতায় আসবেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীরা, আপনারা জানতেন না এত সহজে কোনোদিন আপনারা যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাবেন। আপনারা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা পেলেও বিদেশী দালালরা আজ চুপ করে বসে নাই। এ স্বাধীনতাকে তারা আজ সহজে গ্রহণ করতে পারে নাই। সে জন্যই তারা ছলে-বলে-কৌশলে কাজ করছে। সম্মুখ সমরে না যেয়ে পিছনের রাস্তা অবলম্বন করেছে। পিছনের পথ দিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। মাত্র দু'বছর আগে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে।

আমি বিশ্বাস রাখি, আওয়ামী লীগ কর্মীদের জীবন থাকতে এ স্বাধীনতা কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না। সহকর্মী ভাইয়েরা, আজ আপনাদের সামনে যথেষ্ট কাজ রয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। আজ আমাদের নীতি পরিষ্কার। আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে চারটা স্তম্ভ রয়েছে। এটার মধ্যে কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই। এটা পরিষ্কারভাবে শাসনতন্ত্রে দেয়া হয়েছে। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করি। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাস করি। আওয়ামী লীগ পার্টি বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে, তাই আওয়ামী লীগের ম্যানোফেস্টোতে যে নীতি ছিল তা আজ রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ কর্মীদের সবচেয়ে বেশি। যে বিশ্বাস করবে না, তার জন্য রাস্তা খালি আছে। আমাদের নীতি পছন্দ না হয় চলে যেতে পারেন। থাকলে নীতি বিশ্বাস করে থাকতে হবে। মানুষ মরতে পারে–নীতি-আদর্শ মরে না কোনো দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের পরে আপনারা শাসনতন্ত্র দিয়েছেন। আপনারা নির্বাচন দিয়েছেন। বাংলার মানুষ শতকরা ৯৭টি সিট আপনাদের দিয়েছে। এদেশ শাসন করার অধিকার আপনাদের আছে।

কিন্তু দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। হাওয়া-কথায় চলে না। সেদিন ছাত্ররা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাদের

বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা কর। মনে রেখো, আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম কর, আর আত্মশুদ্ধি কর। তাহলেই দেশের জন্য মঙ্গল করতে পারবা।

আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, কোনোদিন তোমরা আমার কথা ফেলো নাই। জীবনে আমি কোনোদিন কন্টেস্ট করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বা প্রেসিডেন্ট হই নাই। জীবনভর তোমরা আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছ। তোমরা আমার কথায় রক্ত দিয়েছ, আজ শেষ দিনে–কেননা আমি সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি–তোমরা আমার কথা মনে রেখ। আমার কথা ভুলো না। কোনো দিন স্বার্থে অন্ধ হয়ে তোমাদের ডাক দেই নাই। কোনো দিন কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে কোন শয়তানের কাছে মাথা নত করি নাই। কোনোদিন ফাঁসির কাষ্ঠে বসেও বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানি করি নাই। আমি বিশ্বাস করি তোমরা আমার কথা শুনবা, তোমরা আত্মসমালোচনা কর, আত্মসংযম কর। তোমরা আত্মশুদ্ধি কর। দুই চারটা পাঁচটা লোক অন্যায় করে, যার জন্য এতো বড় প্রতিষ্ঠান–যে প্রতিষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা এনেছে, যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ কর্মী জীবন দিয়েছেন, যে প্রতিষ্ঠান ২৫ বছর পর্যন্ত ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছে তার বদনাম হতে দেয়া চলে না।

আজ বাংলার নিভৃত কোণে আমার এক কর্মী পড়ে আছে, যার জামা নাই, কাপড় নাই। তারা আমার কাছে আসে না। আপনাদের অনেকেই এখানে। কিন্তু আমি যদি চর কুকরীমুকরী যাই, আমার ঐ ধরনের কর্মীকে আসি দেখি। এদের সাথে আমার রক্তের সম্বন্ধ। আজো আমি দেখি তার পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। আজো দেখি, সেই ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতা নাই। বাংলাদেশে আমার এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কর্মী পড়ে আছে।

কিন্তু কিছু কিছু লোক যখন মধু-মক্ষিকার গন্ধ পায় তখন তারা এসে আওয়ামী লীগে ভিড় জমায়। আওয়ামী লীগের নামে লুটতরাজ করে। পারমিট নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা, আওয়ামী লীগ থেকে তাদের উৎখাত করে দিতে হবে– আওয়ামী লীগে থাকার তাদের অধিকার নাই। তাই বলছি, আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে, আজ আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে, আজ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে। তোমরা, আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা আজ যারা এখানে বসেছ তারা মনে মনে চিন্তা কর। বুকে হাত দিয়ে খোদার উপর নির্ভর কইরা বলো যে, আমরা

মানুষকে ভালোবাসি। আমরা বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমরা ২৫ বছর সংগ্রাম করেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখবো। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবো। আমরা দেশকে মুক্ত করবো। তাহলেই আওয়ামী লীগের ইতিহাস থাকবে। তাহলে মরেও আমি শান্তি পাবো। তা না হলে আমার বড় দুঃখ, বড় কষ্ট। সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, নীতি ছাড়া, আদর্শ ছাড়া এবং যে কথা আমি বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া তা হয় না। ন্যায় নীতি ও আদর্শ সামনে রাখতে হবে। সে আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ভুলে যেয়ো না। স্বাধীনতা পেয়েছো এক রকমের শত্রুর সাথে ফাইট করে। তখন আমরা জানতাম আমাদের এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও শোষকগোষ্ঠী। কিন্তু এখন শত্রুকে চেনা কষ্টকর। আমি একদিন গল্প করতে গিয়ে বলেছিলাম, জীবনে আমি তিনটা জিনিসকে ভয় পাই। আর কাউকে আমি ভয় পাই না। একটা হলো কুমির; নদীতে থাকে। পানির মধ্যে গোসল করতে গেলে পা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে যুদ্ধ করতে পারি না। দ্বিতীয়টা সাপ, ফুস করে মেরে দিলে যুদ্ধ করতে পারি না। আর তৃতীয়তা হচ্ছে মোনাফেক। তার সাথেও সামনাসামনি যুদ্ধ করা যায় না। কুমির, সাপ আর মেনাফেক! তোমরা আগে যুদ্ধ করেছো। কিন্তু এখন বাংলার মাটিতে এদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করার উপায় নাই।

তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে মোনাফেক, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে কেউটে সাপ আর পানির তলের কুমির। এরা রাতের অন্ধকারে গুলি করে মারে, আর বলে রাজনীতি করে। রাতে একজন লোক শুয়ে আছে; তাকে জানালা দিয়ে গুলি করে মারল। বলে আমি বিপ্লবী। তুমি বিপ্লবী, না দাগী চোর? যে কোনো সময়, যে কোনো মানুষকে গুলি করে মারা যায়। এটা কি বিপ্লব? তোমরা রাতে গুলি করে মারো, আমরা প্রস্তাব পাস করি। আর আমি যদি লোকদের বলে দিই যে, তোমরাও রাত্রে গুলি করে মারো, তখন কি হবে? এদের কোনো নীতি নাই, এদের কোনো আদর্শ নাই, এদের কিছুই নাই। এরা বড় বড় কথা বলে। আসলে চোর-ডাকাতের ন্যায় হাট-বাজারে ডাকাতি করে জিন্দাবাদ দিয়ে চলে যায়। সব ডাকাত, সব চোর। হাট-বাজারে, চিনির দোকানে, মুরগির দোকানে, সবজির দোকানে ডাকাতি করে বিপ্লব হয় না। ঐ রণদিভের থিওরি–ইট মারো, সেপাইর আস্তানায় ইট মারো, ওয়ালে একটা পাথর মারো। এতে বিপ্লব হয় না।

সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে, তাকে বিপ্লব বলে না, তাকে বলে পার্ভার্সন-বিপ্লবের বিকৃতি। এই যত বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা আমার পাশে বসে আছেন, বহু বিপ্লব করছেন এরা। ফাউন্ডার্স অব দি বিপ্লব (বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা)। সেটা এদের কাছ থেকে জেনে নাও। জনগণকে ছাড়া, গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না। রাতের অন্ধকারে গুলি মাইরা কোনোদিন বিপ্লব হয় নাই। পড় সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস, পড় অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস। পড় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। দেখ সেখানে কি হয়েছে। দেশ আমাদের এই সাব-কন্টিনেন্টে কি হয়েছে। পড়, জান, শেখ, বোঝ। তারপরে বিপ্লবের কথা বল। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা, টেরোরিজম কইরা হয় না। আবার এখন একটা সুবিধা হয়েছে, রাতের অন্ধকারে গুলি করে মাইরা বলে আমরা মাওবাদী। কিন্তু আমি জানি, তোমরা চোর আর গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু না। তাই আপনাদের কাছে আমি বলতেছিলাম যে, চারটা আদর্শ-সেটা রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং আওয়ামী লীগের আদর্শ-সেটা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

একদল লোক গণতান্ত্রিক পন্থাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। পাঁচ বছর পর নির্বাচন কর। যদি নির্বাচনে তোমরা কেউ আসতে পার, যে কোনো দল মেহেরবানি করে চলে আস। আওয়ামী লীগ গদি ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তোমরা জান, যে যতই বক্তৃতা কর, আর মানুষ যতই বক্তৃতা শুনুক না কেন, ভোট দেবার সময় তোমাদের অবস্থা যা আছে-আগেও যা হয়েছে, পরেও তাই হবে। সে জন্যই তোমরা জনগণের উপর আস্থা রাখ না। একদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যবহার করব আর অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে আওয়ামী লীগ কর্মীকে মারব, প্রগতিশীল কর্মীকে মারব, আর বলব অস্ত্র নিয়ে মোকাবিলা করব, বলবো অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব করব। কোনো স্বাধীন দেশে, কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এটা এলাউ করা যায় না। বহু সহ্য করা হয়েছে। দুই বছর সহ্য করা হয়েছে। বলা হয়, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও। বঙ্গবন্ধু কঠোর কিনা আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নসরুল্লাহ খান, লিয়াকত আলী খান সবাই জানে।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল কি? বাংলার মানুষ তাকে জাতির পিতা করেছে। বাংলার মানুষ তাকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। বাংলার মানুষকে আমি বুঝাবার চেষ্টা করেছি। তাদের বলতে চেষ্টা করেছি, তোমরা কাজ কর। তোমরা

গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন কর। দুটো খেলার অধিকার তোমাদের নাই। গণতান্ত্রিক অধিকারও তোমরা ব্যবহার করবা আর বিপ্লবের কথা বলে রাতের অন্ধকারে গুলি মারবা, অস্ত্র ফেরত দেবা না, সে অধিকার তোমাদের নাই-সে অধিকার তোমাদের দেয়া হবে না। এটা মনে রাখা দরকার- সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া হয়েছে। জনগণ দেখতে চাও, জনগণ দেখবা। কয়েক হাজার লোক মিটিং-এ যোগদান করলেই মনে করো না যে হয়েছে। এখনো আওয়ামী লীগ ডাক দিলে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক এসে হাজির হবে।

মনে করো না যেন বড় একটা কিছু হয়ে গেছো। সাবধান হয়ে যাও। একদল বলে অমুক তারিখ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করো। তারপরেও আমি কিছু বলি না। তবুও তারা বলে কি যে, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে হাত দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নাই, থাকতে পারে না। নইলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা অন্ধকারে মরে? আওয়ামী লীগ কর্মী এবং প্রগতিশীল কর্মী যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে আমি তাদের কাছে অস্ত্র চেয়েছিলাম। তারা অস্ত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু তোমরা গোপনে কিছু কিছু অস্ত্র রেখে দিয়েছো এবং সেগুলো গোপনে ব্যবহার করছো! আজ যদি আওয়ামী লীগ কর্মী বা প্রগতিশীল কর্মীর কাছে একদিন অস্ত্র দিয়ে দেয়া হয় তাহলে একজনের অস্তিত্বও বাংলাদেশে থাকবে না! আমাকে বাধ্য করো না। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করো না। যাও, গণতান্ত্রিক অধিকার আছে বক্তৃতা করো। বাই-ইলেকশন হবে, ইলেকশনে নামো। ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকশনে জিততে পারে না-রাত্রিবেলা এসে চেয়ারম্যানকে গুলি করে মারে। কয় কি করলাম, বিপ্লব করলাম। কি বিপ্লব-চেয়ারম্যান মারছে। বাবা এতো শুনি নাই। আমার মনে হয় এখানে তো দেশের লোকেরা আছেন, যদি শোনেন সবাই হাসবেন। কারণ তাহলে বিপ্লবের ইতিহাস বদলিয়ে লিখতে হবে।

আজ সেই জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে আমার কথা যে, তোমাদের কর্তব্য রয়েছে। স্বাধীনতা এনেছ। এবার খোদাকে হাজের-নাজের রেখে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, বাংলার মানুষকে সুখী করতে হবে আমার। বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। যে রাষ্ট্রীয় চার আদর্শ আছে তাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তাহলেই তোমাদের আদর্শ পূর্ণ হবে-এর আগে নয়।

তোমাদের সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। তোমাদের আরো ত্যাগের প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করে তারা জীবনভর করে। তোমরা ত্যাগ

করছো–আরো করবা। আর যারা মজা মারে তারা এমনিও মারে, অমনিও মারে। সেজন্য তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ আছে–কর্মীরা, তোমাদের কাছে আমার দাবি আছে। তোমরা জীবনে আমার চোখের সামনে কোনোদিন কথা বলো নাই। যা বলেছি তোমরা তাই করেছ। তোমরা হাসতে হাসতে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েছো। তোমরা পারবা না আমার কথা শুনতে? দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো। তোমরা পারবা না এদেশের মানুষকে ভালোবাসার? আমরা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করব। এ দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়, আমরা শান্তি দেবো। পারবা না তোমরা এ কাজ করতে? বলো আমার কাছে। না পার আমাকে বিদায় দিয়ে দাও। আমি কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে।

সহকর্মী ভাইয়েরা, আমি বলে দিচ্ছি, আমি সেন্টিমেন্টালি বাংলাদেশের মানুষের সাথে এ্যাটাচ্‌ড্‌। কথাটা তোমাদের পরিষ্কার বলে দেবার চাই। তোমরা সকলে জান যে, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। তোমরা সকলে জানতা, ইচ্ছা করলে আমি বহু আগে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। এ প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয়। আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না– পারবো না–পারবো না। আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এ দেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সাথে সাথে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কিছু চাই না।

তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমরা শুধু পার আমার অনুরোধ রাখতে, কারণ তোমরা আমার বহু দুর্দিনের কর্মী। ১৯৪৯ সাল থেকে তোমরা এ পর্যন্ত আপদ-বিপদ, মুসিবত, অত্যাচার-অবিচার, জুলুম, গুলি সব অগ্রাহ্য করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছ বাংলার মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। স্বাধীন তোমরা করেছ। এবার বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। দিতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতন্ত্র ছাড়া রাস্তা নাই। শোষণহীন সমাজ গাছ থেকে পড়ে না। শোষণহীন সমাজ বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে হলে আমার কর্মী ভাইদের সমাজতন্ত্রের কর্মী হতে হবে। ক্যাডার তৈরি করতে হবে। ট্রেনিং দিতে হবে। না হলে পারবো না কিছু করতে।

তোমাদের নিঃস্বার্থ কর্মী হয়ে ট্রেনিং নিতে হবে। সমাজতন্ত্রে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাবার চাই। এবং আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন সিস্টেমে আমরা শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলব।

আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাব। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি। বাংলার মাটিতে আমি মরব। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ তোমাদের মনে রাখতে হবে।

আর একটা জিনিস। রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোন দিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামীন–রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক–সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে সমান। সেই জন্যই এক মুখে সোস্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং আর এক মুখে সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পূর্ব আর একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে হবে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে। তোমাদের মনে রাখা দরকার, সেজন্য আমাদের রাস্তা কিলিয়ার–আমাদের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সামজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনো কিন্তু নাই। সে সমাজতন্ত্র হলো আমার অর্থনীতি। একে গড়তে হলে কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক কর্মী হতে হবে, ক্যাডার হতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে। তাহলেই আমরা সফল হবো।

অবশ্য অনেক লোক আছে যারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গ্রহণ করতে পারে নাই। তারা পিছন থেকে কিছু ঢেলা মারার চেষ্টা করেছে। যারা প্রগতির নামে সাম্প্রদায়িকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বোঝাতে হবে, একেই বলে সমাজতন্ত্র। একে বলে শোষণহীন সমাজ। একেই বলে সুষম বণ্টন। তাহলে বাংলার মানুষ তোমাদের পিছনে থাকবে।

সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, আওয়ামী লীগ পার্টি দীর্ঘদিন ধরে যে বৈদেশিক নীতি দিয়েছে, আমার মনে হয় আপনাদের এই সরকার সেই নীতি

পুরোপুরি পালন করতে চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া ও অন্যান্য যেসব দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সাহায্য করেছেন আজ তাঁদের কথা স্মরণ করি। এছাড়াও ঐ সমস্ত দেশের কথা স্মরণ করি, যারা বিপ্লবের পরেও আমাদের ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনর্গঠনে সাহায্য করেছেন। আমাদের সাহায্য করেছেন ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, গ্রেটব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, জি.ডি.আর., ফ্রান্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি এবং আরো বিভিন্ন দেশ। সাহায্য করেছেন সমস্ত সোস্যালিস্ট কান্ট্রি। তাদের সাথে আমাদের রিলেশন ভালো হয়েছে।

আমরা আজ গর্বিত যে, মধ্যপ্রাচ্যে আমরা আরব ভাইদের এবং প্যালেস্টাইনবাসীদের পাশে রয়েছি। ইসরাইলীরা তাদের ন্যায্য অধিকার হস্তক্ষেপ করেছে। ইসরাইলীরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানে নাই। তারা দখল করে বসে আছে আরবদের জমি। আরব ভাইদের একথা বলে দেবার চাই এবং তারা প্রমাণ পেয়েছে যে, বাংলার মানুষ তাদের পিছনে রয়েছে। আরব ভাইদের ন্যায্য দাবির পক্ষে রয়েছে। আমাদের সব শক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করব।

যেসব দেশ আমাদের সাহায্য দিয়েছে আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। শান্তিপূর্ণ দেশ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। আমি বিশ্বাস করি নন-অ্যালইন্ড, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি। আমরা কারুর পকেটে যাবার চাই না। আমরা সকলের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হয়, একটা দেশ পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী নয়।

যে চীন নিজেকে মহান দেশ বলে এবং দুঃখী মানুষের বন্ধু বলে গর্ব করে সে চীন সম্পর্কে আমার একটা কথা বলার আছে। চীনের সাথে আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই না। আমরা এমন কিছু করি নাই, যে জন্য চীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো দিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীন বাংলার বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছে। আমরা সেজন্য দুঃখিত। তবু চীন অনেক বড় দেশ, আরা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু চীন একটা সাম্রাজ্যবাদী ও ক্যাপিটালিস্ট দেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। আর বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ–যারা রক্ত দিয়ে বিপ্লব করে দেশকে স্বাধীন করেছে তারা যাতে জাতিসংঘে স্থান না পায় সেজন্য চীন জাতিসংঘে ভেটো দিলো বাংলার বিরুদ্ধে।

ইতিহাস বড় তাৎপর্যপূর্ণ। যখন চীনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ ভেটো দেয়া হতো তখন এই বাংলার মানুষই বিক্ষোভ করতো। আমি নিজে ঐ ভেটোর বিরুদ্ধে বহুবার কথা বলেছি যে ভেটোর জন্য চীন ২৫ বছর জাতিসংঘে যেতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, সেই চীন আজ "ভেটো পাওয়ার" হয়ে প্রথম ভেটো দিলো আমার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তবুও আমি কামনা করি তাদের বন্ধুত্ব। অনেক বড় দেশ। দুশমনি করতে চাই না। বন্ধুত্ব কামনা করি। কারণ আমি সকলের বন্ধু হতে চাই। কিন্তু জানি না, আমার এই কামনায়, আমার এই প্রার্থনায় তাঁরা সাড়া দিবেন কিনা। যদি না দেন– কিছু আসে যায় না। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা এতো ছোট দেশ নই। বাংলাদেশ এতটুকু নয়। পপুলেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ দুনিয়ার অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র।

আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা আমরা আলোচনা করে বা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করে আনি নাই। সেজন্য আজ আমাদের পরিষ্কার কথা–আফ্রিকা হোক, ল্যাটিন আমেরিকা হোক, আরব দেশ হোক–যেখানে মানুষ শোষিত, যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, যেখানে মানুষ দুঃখী, যেখানে মানুষ সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা নির্যাতিত, আমরা বাংলার মানুষ সেই দুঃখী মানুষের সাথে আছি এবং থাকব। আমাদের নীতির পরিবর্তন হবে না। আওয়ামী লীগের নেতারা, এই নিশ্চয়ই আপনাদেরও নীতি–আমাদের সরকারের তরফ থেকে এটা পালন করা হচ্ছে।

আজ আমাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ। অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভালো নয়। কেন? ২৫ বছর শোষণ করে সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিনা পয়সায়, বিনা বৈদেশিক মুদ্রায় সরকার চালাতে হচ্ছে। সাড়ে ৭ কোটি লোকের দেশ। সব কিছু বিধ্বস্ত। একে গড়া এত সোজা নয়। তাছাড়া দুনিয়াতে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের মতো যারা উন্নয়নশীল দেশ, যারা দেশকে গড়ে তুলতে চায়, তারা মহাবিপদের সম্মুখীন।

আমাদের কষ্ট হবে। তবুও একটা কথা মনে রাখা দরকার, যে সাহায্য আমি চাই, আওয়ামী লীগ যে সাহায্য চায় তা আত্মসম্মান বিক্রি করে নয়। আওয়ামী লীগ সরকার সেই সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের কেউ যদি কিনতে চান ভুল হবে। কেউ যদি সাহায্যের নামে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তবে ভুল হবে। আমরা শোষিত মানুষ। বহু ত্যাগ করেছি। বহু রক্ত দিয়েছি। দরকার হয় আরো দেবো; কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো কাছে সাহায্য চাই না। যারা বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে চান তারা আমার ভাই।

আসুন, আমরা সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো। কারণ দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার দেশকে গড়তে হবে।

আজ সত্য কথা বলতে কি আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার। আওয়ামী লীগ কর্মীরা, কোথায় যেন গোড়ায় একটু গলদ রয়ে গেছে। মানুষ এতো অর্থের জন্য পাগল হয়েছে কেন? শুধু টাকা কমাই করবে কি করে, এই চেষ্টা! একদিন হাসতে হাসতে বললাম যে, বাংলার কৃষক, বাংলার দুঃখী মানুষ–এরা কিন্তু অসৎ নয়। ব্ল্যাকমার্কেটিং করে কারা? রাগ করবেন না। আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছেন, আপনারা রাগ করবেন না। ব্ল্যাকমার্কেটিং কারা করে? যাদের পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা হয়েছে তারাই ব্ল্যাকমার্কেটিং করে। স্মাগলিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া করেছে তারা বেশি করে। হাইজাকিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া শিখছে তারাই করে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশে টাকা রাখে তারাই। আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয়ই আমার কৃষক ভাইরা পারে না। নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক ভাইরা পারে না। পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি আছে তারাই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার। আর বিদেশী এজেন্ট কারা হয়? নিশ্চয়ই আমার কৃষক নয়, নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক নয়। আমরা যারা লেখাপড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি, বিদেশে যাবার পারি, বিদেশীদের সাথে মিশতে পারি, ভালো স্যুট পরতে পারি, তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশের এজেন্ট হই।

মহাবিপদের মধ্যে আছি আমরা। আপনারা যাঁরা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত, যাঁরা দেশকে নেতৃত্ব দেন তাঁদের কর্তব্য হবে আত্মসমালোচনা করা। আর আওয়ামী লীগের সহকর্মী ভাইয়েরা, তোমরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের পিছনে লাগো। হোর্ডারদের পিছনে লাগো। ঘুষখোরদের পিছনে লাগো। তোমরা আমার কথায় আগেও লেগেছো, এখনো লাগো। শুধু আইন দিয়ে, শুধু শক্তি দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। এজন্য এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যেমনভাবে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। যেমনভাবে ২৫ মার্চ থেকে ন'মাস পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম। তেমনি বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে–দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকদের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে।

গণঐক্য জোট করেছেন আপনারা। আওয়ামী লীগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ আছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের সাথে কর্মী আছে পাঁচটি

গ্রুপের–আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ। আমি মাঝে মাঝে খবর পাই–ভুল বোঝাবুঝি হয়। কোনো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারবে না। সবার সাথে আলোচনা করে নিয়ে আপনাদের পাঁচ গ্রুপকে একসাথে কাজ করতে হবে। আপনারা কাজ করছেন দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। সেইজন্য সংঘবদ্ধভাবে বসে আলোচনা করে আপনাদের কাজ করতে হবে। কারণ, আদর্শ আপনাদের এক। নেতৃত্ব আপনাদের এক। কর্মী আপনারা এক। সম্মুখে রাস্তা আপনাদের এক। গভর্নমেন্ট আপনাদের এক।

ভাইয়েরা আমার, পরিশ্রম না করলে, কঠোর পরিশ্রম না করলে সাড়ে ৭ কোটি লোকের ৫৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়দা করতে হবে। শ্রমিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমাদের বারবার বলেছি, এখনো বলছি, প্রোডাকশন বাড়াও। সমাজতন্ত্রের অর্থ এই যে, প্রোডাকশন বাড়াও, ভোগ কর।

একবার এক মিটিংয়ে বলেছিলাম, গাইটা খেয়ো না, দুধ খাওয়া তোমার কিছু লোক যা আরম্ভ করেছো, দুধও খাবার চাও, গাইও খাবার চাও। সেজন্যই বলছি প্রোডাকশন কর। আমি শ্রমিক ভাইদের সবাইকে দোষ দেই না। অনেক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ভালো প্রোডাকশন করছে, ভালো কাজ করছে। কৃষক ভাইরাও এগিয়ে এসেছে। তাদের অর্গানাইজ করতে হবে। এমন কি একথা ছাত্র ভাইদেরও বলি। দেখুন বগুড়ায় গিয়ে, কলেজের ছাত্ররা নিজেরা মাছ চাষ করে। নিজের খরচ নিজেরাই কামাই করে লেখাপড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। আপনারাও শুরু করেন। বাপ-মার উপর ট্যাক্স কম করেন। আজকে জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছে। বিদেশ থেকে আনতে হয়। দেশে ইনফ্লেশন হচ্ছে। মানুষের দুঃখ হবে। সেজন্য আজ আপনাদের এদিকে নজর দিতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আজ আর বেশিক্ষণ বক্তৃতা করছি না। ইতিহাস বলে দেয়ার দরকার ছিল বলেই এতো কথা বলেছি।

আমি তোমাদের পরিষ্কার বলতে চাই, আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকতে পারবো না। তোমাদের নতুন সভাপতি করতে হবে। কারণ, সময় আমি দেবার পারি না। দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের কার্যপ্রণালীর মধ্যে যেটা আমি নিজে পাস করিয়েছিলাম তাতে পরিষ্কার বলা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা গভর্নর হলে কেউই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, বা কর্মকর্তা হতে পারবে না। এটাকে আমি পরিবর্তন করতে চাই না। আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, তোমরা কথা রাখবা এবং আমার কথা শোনবা। আমি সব

ঠিক করে দেব, তোমরা চিন্তা কর না–গোছায়ে গোছায়ে ঠিক করে দেবো। সারা জীবন আমার কথা শুনেছো–এবারো শুনতে হবে।

আমি আগেই বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যা প্রয়োজন; আওয়ামী লীগের সেই চারটি জিনিস–নেতৃত্ব, আদর্শ, সংগঠন ও নিঃস্বার্থ কর্মী রয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। আজ যে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে–দেশ গড়ার সংগ্রাম, দুঃখী মানুষকে বাঁচবার সংগ্রাম–এই সংগ্রামেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করি, যদি আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তা হলে নিশ্চয়ই আমরা কামিয়াব হবো। কেউ আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না। বিশৃঙ্খলাকারীরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাই আজকে তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল–গ্রামে গ্রামে কাজ করো। দুঃখের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াও। তোমরা আমার কথা শুনেছো, এখনো আমার কথা শোন। তোমাদের যা বলি সেভাবে কাজ করো। আমি যেখানেই থাকি তোমাদের সাথেই থাকবো, তোমাদের পাশেই থাকবো। তোমাদের বাদ দিয়ে একদিনও আমি বাঁচতে পারি না। কিন্তু সভাপতি আমি থাকতে পারবো না।

আমি আমার পক্ষ থেকে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে যাঁরা বিদেশ থেকে এখানে এসেছেন সেই যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি, ভারত, রুমানিয়া, ইরাক, মালয়েশিয়া, হাঙ্গেরী ও দক্ষিণ ইয়ামেনের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। যাঁরা আসতে পারেন নি বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং যাঁরা এখানে কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রয়েছেন তাঁদের সকলকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি এই জন্য যে, আজ প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগের কিছু ইতিহাস বলার, প্রয়োজন ছিল আপনাদের কিছু পথ দেখানোর। শুধু একটা কথা বলে যাই–শেষ কথা আমার, যে কথা আমি বারবার বলেছি–সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিজ্ঞা। আমার আওয়ামী লীগের কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি তোমরা সোনার মানুষ হও তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা। আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছো, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেও না।

জয় বাংলা। জয় আওয়ামী লীগ।

ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়া প্রয়োজন

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। জাতিসংঘে তিনিই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন।

জনাব সভাপতি,

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপারে যে স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে। জনাব সভাপতি, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছে।

যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থানলাভ করিয়াছে এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন তাঁহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন তাঁদেরকেও আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইসব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছে।

চূড়ান্ত বিজয়ে ইতিহাস যে জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়, এইসব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনো অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে। অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হইয়াছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই, বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সাথে লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বার বার আখ্যায়িত করা হইয়াছে তাহা এখানে আমাদের বিবেককে দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।

একদিকে অতীতের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাইতে হইতেছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছি। আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেয়ার বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে আমরা

সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারী ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব–যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে। এবং যে বিশ্ব কারিগরিবিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে। এই বৎসরের প্রথম দিকে এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদীন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় নাই ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে বার্ষিক মাথাপিছু একশ ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিশ্বখাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার চাইতেও কম ভোগ করিয়াছে যেসব মানুষ তাহারা

আজ অনাহারের মুখে পতিত হইয়াছে। দরিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি পণ্য, খাদ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন তাহা আজ ক্রমশ তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টাও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে প্রচন্ডভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতোমধ্যেই দারিদ্র ও ব্যাপক বেকারীর নিষ্পেষণে পতিত দেশগুলি তাহাদের পাঁচ হইতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সম্বলিত পরিমিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাঁটাই করার ভয়ানক আশংকার হুমকিতে পতিত হইয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বাড়িয়া যায় নাই, উপরন্তু তাহাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের সামর্থ্যও প্রতিকূলভাবে কমিয়া গিয়াছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো চরমে উঠিবে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার আর কোনো পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাইবে না। ইহার পাশাপাশি অবশ্য থাকিবে গুটিকয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তোলা এবং পারস্পরিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনিতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করিবার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটি স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না, ইহাতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব–এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা–বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন, আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থাকিয়া আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ় সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে। এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপোস মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তি কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহাছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও

সহযোগিতার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সাথে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসূলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ নেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।

৬৩ হাজার পাকিস্তানী পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রহিয়া গিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে এবং নিজ দেশে ফিরিবার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে। যে দেশের প্রতি তাহারা আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে সেই দেশে তাহাদের যাইবার অধিকার আছে। আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এই অধিকার তাহাদের উপর বর্তাইয়াছে। সেই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন। আরো একটি জরুরি সমস্যা হইল সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বণ্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হইবে, যাহাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষার সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার ২৫ বৎসরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে এমনকি আর কেউ করে

নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশের যুদ্ধের দাগ মুছিয়া ফেলিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসা এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করিতে জাতিসংঘ আমাদের দেশে ব্যাপক সাহায্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়াছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব, তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যাঁরা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচিতে অংশ নিয়াছিল, তাঁহাদেরকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্ব উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। আমি আগেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়িয়াছে। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাপারে স্বল্প হইলেও একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়াছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

জনাব সভাপতি, মানুষের অজয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।

কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে হবে

সংগ্রামী অভিনন্দন ও সালাম গ্রহণ করুন। কাল ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস। শহীদের রক্তে রঞ্জিত সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির আত্মত্যাগ ও পরম আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত এই দিনটি। আজ আমরা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, যাঁদের জন্য সোনার বাংলা আজ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কি নিয়ে, কোন অবস্থায় আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তা আপনারা ভালোভাবে জানেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়। আমাদের শুরু করতে হয়েছিল পাকিস্তানীদের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। ১৯৭১-১৯৭৪ সময়ের দিক থেকে মাত্র তিন বছর। একথা সত্য যে, তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারবো না, একথা আমি আপনাদের বলেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেয়ার খাতা একেবারে শূন্য পড়ে থাকে নি। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য কোটি কোটি মণ খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা ছাড়াও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, শ্রমিক ভাইদের নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি, বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন, পাটের নিম্নতম মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দিয়ে বর্ধিত হারে বেতন প্রদান–এই জাতীয় কয়েকটি ব্যবস্থা, যা সরকার কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও কার্যকর করেছে। এরই সাথে আমাদের দেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করা হয় নি, মিরপুর, নয়ারহাট, তরাঘাট প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ করে দেশে উন্নততর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই এটাও জানেন, যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের

জরিপ কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছিল, খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছিল। দেশবাসীও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির কিছুটা ফল লাভ করতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নতুন করে গঠন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশ পুনর্বাসন পর্যায় শেষ করে প্রবেশ করেছিল পুনর্গঠনের নতুন দিগন্তে। '৭২-এর দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি, '৭৩-এর আঞ্চলিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দেশ যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে উপর্যুপরি দুটি বিপর্যয় নেমে এল। প্রথমত মুদ্রাস্ফীতি। তার ফলশ্রুতি আমাদের অত্যাবশ্যক আমদানি পণ্যের অবিশ্বাস্য হারে মূল্যবৃদ্ধি। অন্যদিকে আমাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্য বিশ্ব-বাজারে এই সময়ে বৃদ্ধি তো পায়ই নি, বরং অনেকাংশে কমে গেছে। দ্বিতীয়ত এবারের প্রলয়ঙ্করী বন্যা–যার ফলে ১৭টি জেলার ৪ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো মারাত্মকভাবে। ১০ লাখ টনের বেশি খাদ্যশস্য হলো নষ্ট। এই দুই বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠন প্রচেষ্টা হয়েছে বিঘ্নিত। এইসাথে একদল নরপশু চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদার ও ঘুষখোরের হীন কার্যকলাপ অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশে আজ তিনটি মহাবিপদ– তিন শত্রুর মোকাবিলা করছে। (১) মুদ্রাস্ফীতি– যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং (৩) চোরাকারবারী, মুনাফাবাজার, মজুতদার ও ঘুষখোর–এই তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে। সেপ্টেম্বরে বন্যার তাণ্ডব শুরু হবার পর থেকে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। এবং কোনও কোনও অঞ্চলে এখনো তা অব্যাহত আছে। হেলিকপ্টার থেকে নৌকা পর্যন্ত–যখন যেটা পাওয়া গেছে, তাতে করেই এই তৈরি খাদ্য পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বন্যা কবলিত মানুষের কাছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই নতুন করে আবাদ শুরু করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে বীজ ও চারা। দেয়া হয়েছে কৃষিঋণ, টেস্ট রিলিফ, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা, পরনের কাপড় ও ওষুধপত্র। আমাদের

সাধ্যের কিছুই আমরা অবশিষ্ট রাখি নি। বাংলার মানুষের এই মহাবিপদের দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যও আমরা পেয়েছি। মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, মানবতার ডাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার পরিবর্তে বিশ্বের কোনো কোনো সংবাদপত্র যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করছিল ও দুঃখী মানুষের জন্য উপদেশ খয়রাত করছিল, তখন বাংলাদেশ সরকার তথা এ দেশের মানুষ বিশ্বের বৃহত্তম ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে, অবস্থা আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেছে। সম্পদ নিতান্ত সীমিত হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু ও সুচারু বিলি-বণ্টনের মাধ্যমে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

আমি আগেই বলেছি, তিন শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন এক প্রতিরোধযুদ্ধে আমরা নিয়োজিত। আজ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন তেল, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানির জন্য আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের চক্রে অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। তাই দেশ-বিদেশের মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনা, ওয়েজ আর্নার স্কিমে পণ্য আমদানি তথা পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিলি-বণ্টনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা আমরা করছি। বাজারে ইতোমধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

খাদ্য আমদানি ব্যয় হ্রাসের জন্যও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ঘাটতি পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের নীতি আমরা গ্রহণ করেছি, একথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। দেশের খাদ্য দেশে মজুত করে দুঃসময়ে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষক ভাইয়েরা এ ব্যাপারে যাতে সরকার নির্ধারিত মূল্য পান এবং কোনো প্রকার হয়রানির সম্মুখীন তাঁদের না হতে হয় তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। তাই খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের কর্তব্য। বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন। এই পথে আমরা বেশ কিছুটা অগ্রসরও হতে পেরেছি। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে আলাপ-আলোচনা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এই কারখানাসমূহে যে সার

উৎপাদন হবে, তা দিয়ে শুধু দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, আমরা তা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব।

আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় তেলের সন্ধান লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তেল অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

মুদ্রাস্ফীতির পরেই আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যার কথা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন–সময় ও অর্থ। পাকিস্তানী শোষকরা ২৫ বছরের শাসন ও শোষণে এ ব্যাপারে কিছুই করে নি। বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে বিরাট ঋণের বোঝা। বাংলাদেশ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে চেষ্টা করছেন।

আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরাকারবারী (স্মাগলার), কালোবাজারী, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোরের দল। মানুষ যখন অনাহারে মারা যায়, তখনো এইসব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে বিদেশ থেকে ধার-কর্জ, এমন কি ভিক্ষা করে আনা পণ্যও বাংলার সম্পদ মজুদের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এদের কোনো জাত নেই, নেই কোনো দেশ। এইসব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। সরকার ইতোমধ্যেই সামরিক বাহিনীসমূহ নিয়োগের মাধ্যমে সীমান্তে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিছু সংখ্যক চোরাচালানীকে গুলি করে হত্যাও করা হয়েছে। চোরাচালান অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনীসমূহ ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে এই উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে গণকমিটি। চোরাচালান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হলে চাই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। আমি আশা করি, জনগণ এ কাজে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। এ ব্যাপারে একটা সুখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারও চোরাচালান বন্ধের জন্য তাঁদের এলাকায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

এখানে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর কথা উল্লেখ না করে আমি পারছি না। রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের প্রধান উপজীব্য। ৪ জন সংসদ সদস্যসহ তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীকে এদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তারা জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করতেও দ্বিধা করছে না। সরকার তো দূরের

কথা, কোনো শান্তিপ্রিয় নাগরিক এটা বরদাস্ত করতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে জনগণের কোনো কল্যাণ বা কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। এ পন্থা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এছাড়াও ক্ষমাপ্রাপ্ত কিছু কিছু লোক দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে না। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বাংলাদেশে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা সকলেই এ দেশের নাগরিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সম-অধিকার ভোগ করবেন।

বিগত একটি বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আপনারাই তার বিচার করবেন। শুধু এইটুকু বলবো, জাতিসংঘে আজ বাংলাদেশ স্বীয় ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ইসলামিক শীর্ষ বৈঠক ও কমনওয়েলথ–সর্বত্র বাংলাদেশ সম্মানিত এবং সমাদৃত। প্রতিবেশী প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও বার্মার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের চেষ্টা আমরা করেছি। এমনকি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধের জন্য যাদের বিচার হওয়ার কথা ছিল, সেইরূপ যুদ্ধাপরাধীকেও আমরা মার্জনা করে দিয়েছি। বাংলার মানুষের এ বদান্যতা ও ঔদার্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বাটোয়ারা এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া পাকিস্তানের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না।

আরব ভাইদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনাময় এক নতুন দিগন্ত। দুর্দিনে তাঁরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যার সময় তাঁরা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শুরু থেকেই বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের সাথে একাত্মতা ও কারো প্রতি বৈরতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্বের যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, আজ তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

একটি কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজো বলছি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও

সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কিনা সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার কর্তব্য দেশের ও দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করেছেন, সেটাই বড় কথা।

আমি জানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি জিনিসের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধিতে আপনারা কি নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষ করে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের দুঃখ-কষ্টে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক হাজার লোককে আমরা অনাহারের কবল থেকে বাঁচাতে পারি নি, এ সত্য স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই। কারণ আমি জানি, সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও একমাত্র আমরাই তখন এসব হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সামান্য যা কিছু পেয়েছি, তাই নিয়ে এদের সেবায় এগিয়ে গিয়েছি। কিছু সংখ্যক ভাববিলাসীর ন্যায় বক্তৃতা-বিবৃতির ঝড় তুলেই ক্ষান্ত হই নি। খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে অনাহারে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি রোধ করার সুকঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ভাইয়েরা আমার, জীবন ধারণের এই দুঃসহ সংগ্রামে অতীতের ন্যায় এবারেও আমি আপনাদের পাশে রয়েছি, ভবিষ্যতেও থাকবো।

আমাদের আজকের এই দুঃখ-কষ্ট যে নিতান্ত সাময়িক, সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত। এই বাংলায় সম্পদের কোনো অভাব নেই। কিন্তু সদ্ব্যবহারের জন্য সময়ের প্রয়োজন। আমরা যদি বাংলার এ সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলি-বণ্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়াতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের ভাবী বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারবো। আসুন, ১৬ ডিসেম্বরের এই পবিত্র জাতীয় দিবসে আমরা সকলে সেই শপথ গ্রহণ করি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

[সূত্র : জাতীয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ : ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৪]

পুলিশ এখন জনগণের

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রথম পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের বিবরণ উদ্ধৃত হলো।

আমার পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও সমবেত অতিথিবৃন্দ,

আজ স্বাধীন বালাদেশে প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। যতদিন বাংলার স্বাধীনতা থাকবে, যতদিন বাংলার মানুষ থাকবে, ততদিন এই রাজারবাগের ইতিহাস লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। ২৫ মার্চ রাত্রে যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তারা চারটি জায়গা বেছে নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায়। সেই জায়গা চারটি হচ্ছে রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার বাড়ি। একই সময়ে তারা এই চার জায়গায় আক্রমণ চালায়। রাজারবাগের পুলিশেরা সেদিন সামান্য অস্ত্র নিয়ে বীর বিক্রমে সেই সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করেন। কয়েক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ করেন। তাঁরা এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে।

এর জন্য আজ আমি গর্বিত। আজ বাংলার জনগণ গর্বিত। সেদিন বাংলার জনগণের ডাকে, আমার হুকুমে এবং আমার আহ্বানে বাংলাদেশের জনগণের সাথে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে, বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করতে। স্বাধীনতার ইতিহাসে সাথে রাজারবাগের এবং পুলিশের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পুলিশ বাহিনীর অনেক কর্মী এখানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা রাস্তায় নেমে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন নয় মাস পর্যন্ত। যাঁরা পুলিশ বাহিনীর বড় বড় কর্মচারী ছিলেন, তাঁদেরও অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আজ তিন বছর হলো বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ প্রথম আমাদের পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এখন একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা

রক্ষা করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা, এই রাজারবাগে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের কথা মনে রাখতে হবে। তাঁরা আপনাদেরই ভাই। তাঁরাও পুলিশে চাকরি করতেন। জনগণের সাথে তাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন। ৩০ লক্ষ লোকের সাথে পুলিশের অনেক লোকও আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। তাঁদের ইজ্জত আপনারা রক্ষা করবেন। তাঁদের সম্মান আপনারা রক্ষা করবেন। তাঁদের আত্মা যাতে শান্তি পায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি কষ্টকর।

আজ আপনাদের কর্তব্য অনেক। যে কোনো সরকারের, যে কোনও দেশের সশস্ত্রবাহিনী গর্বের বিষয়। আমার মনে আছে যেদিন আমি জেল থেকে বের হয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসি, সেদিন দেখেছিলাম, আমাদের পুলিশ বাহিনীর না আছে কাপড়, না আছে জামা, না কিছু। অনেককে আমি ডিউটি করতে দেখেছি লুঙ্গি পরে। একদিন রাত্রে তারা আমার বাড়ি গিয়েছিল। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে জামা, হাতে বন্দুক।

এই অবস্থায় এই দেশ শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানী জালেমরা বাংলাদেশের সম্পদ শুধু লুট করেই নেয় নি, যাবার বেলায় সব ধ্বংস করেও দিয়ে যায়। তারা ভেবেছিল, বাংলাদেশ টিকতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশ টিকেছে। বাংলাদেশ থাকবে। বাংলাদেশ থাকার জন্যই এই দুনিয়ায় এসেছে। একে কেউ কোনোদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজ আমরা জাতিসংঘের সদস্য। আজ সারা দুনিয়ায় আমার বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে। আজ দুনিয়ার মাঝে আমার বাংলাদেশের স্থান হয়েছে।

একটা কথা আপনাদের ভুললে চলবে না। আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশী শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালোবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা। আপনাদের বাহিনী এমন যে, এর লোক বাংলাদেশের গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আপনাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ এখন একটি জিনিস চায়। তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তারা আশা করে, চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা, দুর্নীতিবাজ যেন তাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে। আপনাদের কর্তব্য অনেক।

আমি জানি, আপনাদের নানারকম অসুবিধা আছে। ৭০ থেকে ৮০টা থানা হানাদারবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল, মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল।

সেগুলো নতুন করে আমরা গড়তে চেষ্টা করছি। অনেকগুলো গড়া হয়েছে, অনেকগুলোর কাজ চলছে। আপনাদের কিছুই ছিল না। আজ আস্তে আস্তে কিছু কিছু হতে চলেছে। একদিনে কিছুই হবে না।

বাংলাদেশের মানুষ দুঃখী, বাংলাদেশের মানুষ গরিব, বাংলাদেশের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। যুগ যুগ ধরে তারা শোষিত হয়েছে। আজ তাদের অবস্থা যে কেমন, আপনারা ভালো করেই জানেন। আপনারা বিদেশ থেকে আসেন নি, আপনারা ভাড়াটিয়া নন। আপনারা বাংলা মায়ের ছেলে। আপনাদের বাপ-মা এই বাংলাদেশে রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা আপনারা জানেন। গ্রামে গ্রামে আপনারা দেখেছেন, মানুষ হাহাকার করে, না খেয়ে কষ্ট পায়। বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট আরো বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে, মানুষের খাবার যোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আজ গরিবের ওপর ট্যাক্স ধরার ক্ষমতাও আমাদের বেশি নেই। তাঁরা টাকা কোত্থেকে দেবেন? তাঁরা না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। এবার যে বন্যা হয়েছে, যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তা আপনারা দেখেছেন।

আমি আপনাদের কাছে এই আশা করবো যে, আপনারা হবেন আমার গর্বের বিষয়। বাংলাদেশের মানুষ যেন আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আপনারা যদি সৎপথে থেকে ভালোভাবে কাজ করেন, যদি দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকেন, তাহলে দুর্নীতি দমন করতে পারবেন। আপনারা যদি আজকে ভালোভাবে থাকেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করি, যে থানায় ভালো অফিসার আছেন এবং ভালোভাবে কাজ করছেন, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তারা সব সময় সজাগ থাকেন এবং দুষ্টকে দমন করেন। যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

মনে রাখবেন, আপনাদের মানুষ যেন ভয় না পায়। আপনাদের যেন মানুষ ভালোবাসে। আপনারা জানেন, অনেক দেশে পুলিশকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। আপনারাও শ্রদ্ধা অর্জন করতে শিখুন।

আপনাদের বনে-বাদাড়ে-নদীতে-লোকালয়ে–সর্বত্র যখন যেখানে প্রয়োজন পড়ে, ডিউটি করতে হয়। ২৪ ঘণ্টা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হয়। অনেকে বলেন যে, সকলের ছুটি আছে, কিন্তু পুলিশের ছুটি

নেই। এজন্য আমার দুঃখ হয়। সংখ্যায় আপনারা খুব কম বলেই আপনাদের দিন-রাত কাজ করতে হয়। আমি আপনাদের সব অসুবিধার খবর যে রাখি না, তা নয়। কিন্তু উপায় কি? সাধারণ মানুষের টাকা দিয়েই সব চলে। কিন্তু আজ মানুষের যে অবস্থা, দেশের যে অবস্থা, তাতে তাদের ওপর আর ট্যাক্সের বোঝা চাপানো যায় না। আজ আমরা যারা এখানে আছি, তারা সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী। পুলিশ, সামরিক বাহিনী, বি.ডি.আর, রক্ষীবাহিনী বা আনসার যা-ই আমরা হই না কেন, সকলেই এই বাংলাদেশের জনগণের টাকা দিয়েই চলি। এবং সবাইকে রাখা হয়েছে জনগণের সেবা করবার জন্য।

জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাবো না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের ওপর অত্যাচার করবেন? গরিবের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে। তাই শুধু আপনাদের নয়, সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষপর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইলো, আমার অনুরোধ রইলো, আমার আদেশ রইলো, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ্ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনোদিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোনোদিন যারা অত্যাচার করে নি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয় যদি হয় আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

আমার ভাইয়েরা, একদল লোকের পয়সার লোভ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। পয়সার জন্য তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মৃত্যুর পর এ পয়সা তাদের

কোনো উপকারে আসবে না। এই পয়সায় যদি তাদের সন্তানরা মানুষ না হয়, তাহলে তারা নানা অপকর্মে তা উড়িয়ে দেবে। তাতে তারা লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে আখেরাতেও শান্তি পাবে না। তাই আমি সকলকে অনুরোধ করি, রাত্রে একবার চিন্তা করবেন, সারা দিন ভালো কিছু করেছেন, না মন্দ করেছেন। দেখবেন, এতে পরের দিন মনে আশা জাগবে যে, আমি ভালো কাজ করতে পারি। এ দেশের মানুষ বহু কষ্ট করেছে। যুগ যুগ ধরে তারা কষ্ট করছে। এই বাংলাদেশে কয়েক হাজার লোক না খেয়ে মারা গেছে। একথা আমি গোপন করি নি। বিদেশ থেকে খাবার আনতে চেষ্টা করেছি। নিরন্ন মানুষদের খাওয়াবার জন্য ৫ হাজার ৭শ'র মতো লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারী ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে সেইসব লঙ্গরখানা চালিয়েছেন। কোনোমতে আমরা এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।

মাঠে, কলকারখানায় সর্বত্র আমাদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে। কোনোরূপ ফ্যাশন আর চলবে না। এই তিন বছরে অনেক ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু যে ফ্যাশন বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ তার নিজের কাজে ফাঁকি দেবে, চুরি-ডাকাতি করবে, আর বড় বড় কথা বলবে, সে ফ্যাশন আর করতে দেয়া হবে না। মানুষের সহ্যের সীমা আছে। আমারও সহ্যের সীমা আছে। এবার আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকব।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতিবাজ খতম করবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষকে ভালোবাসবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশের মাটিকে ভালোবাসবো।' যারা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমণ করে, অস্ত্র নিয়ে আপনাদের মোকাবিলা করে, বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন।

আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি; আপনাদের খাওয়া-পরার কষ্টের কথাও। কিন্তু কষ্ট কি শুধু আপনারাই করছেন? যাদের টাকা দিয়ে আমরা চলি, তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট করছে। আমরা চাই একটা শোষণহীন সমাজ। আমরা চাই ইনসাফের রাজত্ব। আমরা চাই মানুষ সুখী হোক, গরিব-দুঃখী, বড়-ছোট সবাই পেট ভরে ভাত খাক। তাহলেই তো আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হবে। যারা আত্মত্যাগ করেছে, রক্ত দিয়েছে, তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

আজ হতে শুরু হোক আপনাদের নতুন জীবন। এই পুলিশ সপ্তাহ থেকে আপনারা নতুন মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করুন, যাতে বাংলাদেশের পুলিশ দুনিয়ার বুকে গর্বের বস্তু হয়ে উঠতে পারে। এটিই আমি চাই আপনাদের কাছে। আপনাদের জন্য আমার সহানুভূতি আছে। আপনারা জানেন, আপনাদের আমি ভালোবাসি। আপনাদের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজ করেও আমি ক্লান্তিবোধ করি না। কিন্তু আমি চাই, আপনারা মানুষকে ভালোবাসুন। তাহলেই শান্তি আসবে।

আমি আপনাদের এই সপ্তাহের কামিয়াবি কামনা করি। এবং আরো কামনা করি, সব পুলিশ কর্মচারী, যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সবাই যেন সৎ হওয়ার এবং মানুষকে ভালোবাসার সুযোগ পান। আজকে আপনারা আরো প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা এমন পুলিশ গঠন করবো, যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়।' আমি পুলিশ বাহিনীর ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলছি, একদিন বাংলার মানুষ সুখী হবে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সৎপথে থাকতে হবে।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লব, জাতীয় ঐক্য গঠন ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। ভাষণের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

জনাব স্পিকার,
আজ (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সাল) আমাদের শাসনতন্ত্রের কিছু অংশ সংশোধন করতে হলো। আপনার মনে আছে যখন শাসনতন্ত্র পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম, এই হাউসের পক্ষ থেকে এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় তবে এ সংবিধানেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পিকার,
আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু'শ বছরের ইংরেজের শাসন, ২৫ বছরের পাকিস্তানী শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। ২৫ বছর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য। হাজার হাজার কর্মী, নেতা ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণই করে নাই, তাদের অনেককে জীবনদান করতে হয়েছিল। শোষকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাদের আঘাত বারবার আমাদের উপর এসেছে। তারপর চরম আঘাত তারা হানে; যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার দিকে আজকে আপনারা চেয়ে দেখুন, নিশ্চয় আপনি বলবেন স্পিকার সাহেব, আমরা যে আওয়ামী লীগ পার্টি এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছি– কোনোদিন আমরা আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হই নাই। ক্ষমতার লোভে আমরা রাজনীতি করলে আমিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আর এই নেতৃবৃন্দ অনেক বার মন্ত্রী– অনেক পদ পেতে পারতো। কিন্তু আমরা চেয়েছি একটি শোষণমুক্ত সমাজ, আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমরা চেয়েছিলাম এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য।

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি। আমি যখন কারাগারে বন্দি ছিলাম, আমার সহকর্মীরা এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন বাহিনীকে। আমি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীকে এবং তার সরকারকে। তাঁরা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এক কোটি লোক দেশত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবুও আমরা চেষ্টা করেছিলাম দেশে যারা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালোবাসতে চান নিশ্চয়ই তাঁরা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে। কোনো দেশে কোনো যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবে ক্ষমতা দখল করে কোনোদিন এইভাবে অবাধ অধিকার এবং অন্যান্য দলকে সুযোগ-সুবিধা দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমাদের শাসনতন্ত্র। আপনি জানেন স্পিকার সাহেব, কি দেখেছি আমরা। তিনি বছর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি।

আপনারা জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশত্যাগ করে গেল তারা দেশে ফিরে আসল। তাদের রিহেবিলিটেট করতে হবে। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমরা একটা সরকার নিয়েছিলাম। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সরকার, যেখানে আমাদের কাগজের নোট ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। তাদের ব্যাক করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না, আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না; পাকিস্তানীরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর সেকথা যারা করেছে তারাই বুঝতে পারে– অন্যরা বুঝতে পারে না। এ সমস্ত বিপ্লবের পর দেখা গেছে অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে, তারা আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদের পুনর্বাসন করার জন্য। কতটুকু পেরেছি– না পেরেছি জানি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমাদের কর্তব্য পালন করতে ত্রুটি করি নাই।

স্পিকার সাহেব,
দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আজ আপনার এই এসেম্বলি বা সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের আগে হত্যা করা হয়েছে, যাঁরা এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির মেম্বার ছিলেন। হত্যা করা হয়েছে গাজী ফজলুর রহমানকে, হত্যা করা হয়েছে নূরুল হককে, হত্যা করা হয়েছে মোতাহের মাস্টারকে; এমনকি যাঁরা কোনো দিন আমাদের দেশে আমরা শুনি

নাই যে নামাজে, ঈদের নামাজে কোনো লোক নামাজ পড়তে যায়, সেই নামাজের সময় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, যাঁরা ২৫ বছর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোনো একটি রাজনৈতিক দল যাদের আমরা অধিকার দিয়েছিলাম–তারা কোনো দিন এদের কনডেম করেছেন কিনা? তারা কনডেম করে নাই। তাঁরা মুখে বলেছেন যে, তাঁরা অধিকার চান। তাঁরা মিটিং করেছেন, সভা করেছেন, পার্টি করতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কি করেছেন? আমাদের সংবিধানে অধিকার দেয়া আছে ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকার পরিবর্তন করতে পার– এই ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম। বাই-ইলেকশন আমরা ৩ মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ ভোট না দিলে তার জন্য আমরা দায়ী নই। তখন তারা বলেছিল এই সরকারকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করতে হবে। মুখে বলেছে তারা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি, কিন্তু গোপনে গোপনে তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে এবং এইসব অস্ত্র দিয়ে যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছি আমরা– যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের হত্যা করেছে ঘরের মধ্যে যেয়ে। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে– যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয়, অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হয়, "ইফ ইউ হ্যাভ এ লিবার্টি ইউ হ্যাভ রেস্পনসিবিলিটি" এই কথাটা ভুললে চলবে না। কিন্তু রেস্পনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবে, জনগণের মধ্যে যেয়ে তারা অন্য কথা বলবে এবং তারপর তারা অস্ত্র যোগাড় করবে, রাতের অন্ধকারে মানুষকে হত্যা করবে, সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবে, প্রয়োজন হলে উৎখাত করে দেয়া হবে। আমি যদি বলতাম যে, আপনারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে, আপনারা কবে প্রস্তুত হয়ে উৎখাত করবেন আর আমার যা শক্তি আছে সে শক্তি দিয়ে দুই মিনিটের মধ্যে আমি উৎখাত করতে পারি। আপনাদের কিন্তু তবু আমরা অধিকার দিয়েছি। আজকে আপনারা জানেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই একটা হট বেড অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্লিক। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেয়া হয়। এখানে তারা বিদেশীদের

দালাল হয়। আজকে একটা কথা এখানে আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা দরকার হলে রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার আমরা যারা দীর্ঘদিন, ২৫ বছর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য, এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারোর নাই। (হর্ষধ্বনি) অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইস্কান্দার মির্জা নিয়ে এসেছিলেন, কোনোদিন তাঁদের কাছে আমরা মাথা নত করি নাই। আজ আমাদের সত্যি অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। আমরা কি নিয়ে শুরু করেছিলাম। ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে ৭ কোটি মানুষের একটা দেশ। লোকসংখ্যা কত বেশি এখানে, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল, ২৫ বছর সমস্ত সম্পদ পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, এখানে রেলওয়ে লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এখানে পোর্ট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখানে ব্যাংকে আমাদের গোল্ড রিজার্ভ নাই, এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ নাই, এখানে কমিউনিকেশান নাই, এখানে প্লেন নাই, এখানে গুদামে খাবার নাই– তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট মানুষের আছে, কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে– যে পর্যন্ত দেশকে গঠন করা না যাবে। আজ আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো কিন্তু এই তিন বছরে না হলেও আমরা ২১৬৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি, সমস্ত মিলে, ফুডে, ননপ্রজেক্ট এইড প্রজেক্ট এইড মিলে দুনিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করেছে। তাঁরা দিয়েছেন আমাদের ২১৬৩ কোটি টাকা। আমরা এ পর্যন্ত খরচ করেছি এ দেশের মানুষের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা। আর আমাদের যে আয় ৯০০ থেকে ১০০০ কেটি টাকা তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি, যাতে মানুষের কিছু সাহায্য হয়। খাদ্য আমাদের কিনতে হয় বাইরে থেকে। মানুষ না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম; তারপর থেকে বাংলাদেশে আসল drought, তারপরে হলো দুনিয়া জোড়া ইনফ্লেশান। যে জিনিস কিনতাম এক টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে। যে জিনিস কিনতাম একশো টাকা দিয়ে সে জিনিস করতে হয় দুশো টাকা দিয়ে আমাদের দেশের জিনিস, যা বিদেশে বিক্রি করতাম তার ন্যায্য মূল্য আমরা পেলাম না।

আমরা যারা অনুন্নত দেশ– এ কষ্ট আমাদের ভোগ করতেই হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয় তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর আমরা যখন বিক্রি করি, তার দাম আমরা পাই না। এ অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলেছে। তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ায় যে ইনফ্লেশান হয়ে গেল, শুধু আমরা না, সমস্ত দুনিয়ার যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল এক ভয়াবহ বন্যা। যে বন্যা– এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কিনা সন্দেহ। না ছিল খাবার। ৫ হাজার ৭'শ লঙ্গরখানা খোলা হলো। এবং সেখানে রিলিফ অপারেশন চালানো হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭ হাজার লোক না খেয়ে মারা গেল। এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই। আমি জীবনভর এদের সাথে থেকে সংগ্রাম করেছি, ওদের পাশাপাশি রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। কিন্তু ওদের দুঃখ দূর করার জন্য, মানুষের, আমি যে বলেছি একদিন মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই হাউজে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড় বড় অর্থশালী লোক, যারা বিদেশ থেকে ভোট কেনার জন্য পয়সা পায় তাদের গণতন্ত্র নয়– শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহুদিনের কথা আমাদের। এবং সে জন্যই আজকে আমাদের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পিকার,

আমরা আজকে আমাদের কঠিন কর্তব্য পালন করেছি। আমাদের দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়। গায়ে কাপড় নাই। শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাতে একটা হারিকেনও জ্বালাতে পারে না। নানা অসুবিধার মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে।

জনাব স্পিকার,

আমরা আমাদের কতগুলো কর্তব্য পালন করেছি আজ। আজকে আমরা যারা শিক্ষিত, এম.এ. পাস করেছি, বি.এ. পাস করেছি স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ, তারাই অর্থ দিয়েছে আমাদের

লেখাপড়া শেখার একটা অংশ। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি, আজ যারা লেখাপড়া শিখছেন, তাদের খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়, দেয় বাংলার দুঃখী জনগণ। কি আমি তাদের ফেরত দিয়েছি, তাদের আমি রিপে (repay) করেছি কতটুকু? তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি এটা আজকে আমাদের সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আজ যে একজন ডাক্তার হয়, একজনকে ডাক্তারি পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষ না হলেও ১ লাখ টাকা ব্যয় করে। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও ১ লাখ টাকা খরচ পড়ে। একজন এগ্রিকালচার এক্সপার্ট করতে না হলেও ১ লাখ টাকা খরচ পড়ে। একজন এ দেশের দুঃখী মানুষ, যাদের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থেই এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ সময় এসেছে, আজকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে কি তাদের, কতটুকু বা ফেরত দিয়েছি, যার অর্থে তুমি আজকে ডাক্তার হয়েছো, যার অর্থে তুমি scientist হয়েছো, যার অর্থে তুমি সমস্তদেশে মানুষ হয়েছো, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে professor হয়েছে, যারা লেখাপড়া শিখতেছো তাদের প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুঃখী জনগণ দেয়। সেটাই সরকারের টাকা এবং সেই টাকা ব্যয় করে। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। আমরা কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি। আমরা কতটুকু তাদের দিয়েছি। শুধু আমাদের দাও। কে দেবে? বাংলার দুঃখী জনগণকে তোমরা কি ফেরত দিয়েছো? এটা আজ প্রশ্ন। আজ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজ এদের কর্তব্য বুঝতে হবে। আমি আমার কি কর্তব্য পালন করেছি। দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি আমরা কি পেলাম। তোমরা কি পেয়েছো? তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা দিয়েছো বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কি ফেরত দিয়েছো বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়? যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কি দিয়েছো? এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে। আজকে বহুদিন পর্যন্ত বারবার বলেছি। আজকে করাপশনের কথা বলতে হয়। এ বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।

যারা আজকে ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আজ যেখানে যাবেন, করাপশন দেখবেন– আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান– করাপশন। খাদ্য কিনতে যান– করাপশন, জিনিস কিনতে যান– করাপশন, বিদেশ গেলে টাকার উপর করাপশন। তারা কারা? আমরা যে ৫ পারসেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে, আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে। কবরে যেতে হবে। কিছুই সে নিয়ে যাবে না। তবুও মানুষ ভুলে যায়– কি করে এ অন্যায় কাজ করতে পারে!

বহু দুঃখ নিয়ে এ কাজ করতে হয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত বিবেকের দংশনে জ্বলেছি। মাথা নত করি নাই কোনো অন্যায়ের কাছে। আপোস করি নাই কোনো অন্যায়ের কাছে। জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ যে রক্ত দিয়েছে, স্বাধীনতা এনেছে, তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনবো সেই খাবার চুরি করে খাবে, অর্থ আনবো চুরি করে খাবে, টাকা আনবো তা বিদেশ চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে।

জনাব স্পিকার,

এই বক্তৃতা থেকেই আমি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। আজ আমাদের কি অবস্থা– আজ আমার পপুলেশান কন্ট্রোল করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, ভিক্ষুকের জাতের কোনো ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়? স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করবো না, অফিসে যাবো না, ফাঁকি দিব। ফ্রি স্টাইল। ফ্রি স্টাইল মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে ১০টার সময় যাবার কথা বলে ১২টায় আগে যাবো না। ৫টায় ছুটি হলে ৩টায় ফিরে আসতে হবে। কারখানায় কাজ করবো না। পয়সা দিতে হবে। আমার শ্রমিকরা খারাপ না। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার কৃষকরা আজ কাজ করতেছে। Food production এগিয়ে গেছে। আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করি। আমরাই ষড়যন্ত্র করি। আমরা ধোঁকা দিই। আমরাই লুট করে খাই। জমি দখল করে নিয়ে যাই। এ সকল কাজ করে কারা? আমরা এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ। যাদের পেটের মধ্যে দুই অক্ষর বুদ্ধি বাংলার ওইসব দুঃখী মানুষের পয়সায় এসেছে– তারা আজকে এ কথা ভুলে

যায়। কথা হলো আমি কি পেলাম আর আমি কি দিলাম। আজ সেখানেই প্রশ্ন। আমি বারবার বলেছি– আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন। আজকে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, নচেৎ দেশকে ভালোবাসা যায় না। এবং দেশের উন্নতি করা যায় না। কলে-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে আমাদের production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না। কি করে আপনি করবেন? যদি ধরেন ২০ লাখ টন খাবার বছরে deficit হয়। এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি মাল আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ৩০ লাখ টন। ৫৪০ লাখ মণ খাদ্য যদি ধরুন গড়ে প্রত্যেক বছর আনতে হয় বিদেশ থেকে, কোথায় পাওয়া যাবে, কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়? ২০ থেকে ৩০ লাখ টন প্রতিবছর আমাদের আনতে হয়েছে বিদেশ থেকে এই তিন বছরে। বন্ধুরাষ্ট্ররা সাহায্য করেছে। গ্র্যান্ট দিয়েছে, লোন দিয়েছে, আনতেছি। খাবার দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কদ্দিন দেবে? মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লাখ লোক আমার বাড়ে। আজকে আমাদের পপুলেশান প্লানিং করতে হবে। পপুলেশান কন্ট্রোল করতে হবে। না হলে ২০ বছর পরে ১৫ কোটি লোক হয়ে যাবে। ২৫ বছর পরে? ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল, বাঁচতে পারবে না। যেই ক্ষমতায় থাকুক; বাঁচার উপায় নাই। অতএব পপুলেশান কন্ট্রোল আমাদের করতেই হবে। সেজন্য ডেফিনিট স্টেপ আমাদের নিতেই হবে বাংলাদেশে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। প্রোডাকশন বাড়াবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। বিশৃঙ্খল জাতি কোনোদিন বড় হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছি আমরা। ফ্রি স্টাইল। এটা হবে না, ওটা হবে না, আর যাকে এ্যারেস্ট করবো বলবে যে অমুক পার্টির লোক। ওকে এ্যারেস্ট করলে বলবে অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি! জিনিসপত্র এক জায়গায় দাম একদিন হঠাৎ ১০০ টাকা করে ২০০ টাকা হয়ে গেল। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলো, হোল বাংলাদেশে ২০০ টাকা হয়ে গেল; যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব সেখানে দুনিয়া থেকে সব কিছু আনতে হয়। আমরা কলোনি ছিলাম, আমরা কোনো জিনিসে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা ফুডে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা কাপড়ে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা তেলে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা খাবার জিনিসে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমাদের র-ম্যাটারিয়ালস কিনতে হবে, ওষুধে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানীদের।

আমাদের সবকিছু প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সবকিছু বিদেশ থেকে আনতে হবে, কোথায় পাবেন বৈদেশিক মুদ্রা আপনারা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে, ইনকাম করতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তারও ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে। এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে। আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পিকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে, একথা যদি কেউ মনে করে যে, জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়ে গেছি– নো, আজ এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের জনগণ দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। যে প্রেসিডেন্ট হবে তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে। তবে এইটুকু, আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারে গেলে একটা যদি সিভিল মামলা হয়; আপনি তো উকিল, স্পীকার সাহেব। আল্লাহর মর্জি যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, ২০ বছরেও সে মামলা শেষ হয় বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মরে যাবার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে। আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইর কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে এই লোয়ার কোর্ট, জর্জ কোর্ট– বিচার নাই! জাসটিস ডিলেড জাসটিস ডিনাইড– উই হ্যাব টু মেইক এ কমপ্লিট চেইঞ্জ এবং সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষ যাতে সহজে বিচার পায় এবং সাথে বিচার পায়। ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। কলোনিয়াল পাওয়ার এবং রুল নিয়ে দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। যেখানে জুডিসিয়াল সিস্টেম-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো কথা শুনি না। কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তার অধিকার পাবে। কাজ করবে না, পয়সা নেবে, সে পয়সা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের উপর ট্যাক্স বসা? খাবার আছে তার, কাপড় আছে তার? তার ঘর থেকে ধন কোত্থেকে আনি? পারবো না। তোমাদের কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। ক্ষেত-খামারে কাজ না করলে তোমরা জমির উপর থাকতে পারবে না। আমার সেখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।

জানি আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয়ে যায় প্রত্যেক বছর, সাইক্লোন হয় প্রত্যেক বছর, ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয়– সেটা বোঝা গেল। আজ আমাদের কথা কি– আজ শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকের থেকে নয়। আপনি মেম্বার ছিলেন প্রথম দিন থেকে স্পিকার সাহেব। আপনি জানেন এই দল এই লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারো কাছে কোনোদিন আপোস করে নাই, মাথা নত করে নাই। আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রি করতে হবে, এদের অধিকারের নামে আমাদের এদেরকে ফ্রি-স্টাইল ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না। কোনো দেশ কোনো যুগে তা দেয় নাই। দিতে পারে না। যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারী করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। মানুষকে যারা পয়সা দেয়, তোমার মাহিনা দেয় তোমার সংসার চালানোর জন্য ট্যাক্স দেয়, তার কাছে তুমি আবার পয়সা খাও! মেন্টালিটি চেইঞ্জ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট– আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের মাস্টার নই। মেন্টালিটি আমাদের চেইঞ্জ করতে হবে। আর যাদের পয়সায় আমাদের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমাদের এসেম্বলি চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কি করলাম? সেটাই আজ বড় জিনিস।

আমি সেদিন গিয়েছি কুমিল্লা পর্যন্ত। একটা মাত্র প্রশ্ন করেছি– তোমরা না খেয়ে মরছ, খাবার চাল নাই, গায়ে তোমাদের কাপড় নাই, তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছো? তোমরা কেন আমাকে ভালোবাস আমি তা বুঝতে পারি। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক। আমি সহকর্মীদের কাছে বারবার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। বলেছি বহুদিন, ৩৫ বছর, আমি এ দেশে ১৯৩৮ সালে, আমার যখন বাচ্চা বয়স, তখন আমি জেলে গেছি। তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই, আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার আমি যা সহ্য করেছি সে সব বাদ দেন। যারা, কত লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে, দেশে আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে। কিন্তু একটা খেলা হয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলে, দাম নিয়ে খেলে, বেশি অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে নিউজ দেয়, এই নিউজটা একটু ছাপিয়ে দেন।

আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। ঐ যে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলাম। ফ্রি-স্টাইল চলে না। সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ৫৪ হাজার বর্গমাইল। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়, কোনো কিছু চলতে পারে না– এখানে free style চলে না। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। ক্ষেত-খামারে উৎপাদন করতে হবে। মানুষ হতে হবে। ছাত্র সমাজের লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে। জনগণ টাকা দেয় ছাত্রগণকে মানুষ হবার জন্য। সে মানুষ হতে হবে– আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে আমরা যেন মানুষ হই। কি পার্থক্য আছে জানোয়ারের সাথে আর আমাদের সাথে? যে জানোয়ার একটি মানুষের বাচ্চাকে কামড়াইয়া ধরে, খেয়ে ফেলে দেয়, আর একটি মানুষ বুদ্ধিবলে এখান থেকে পয়সা নিয়ে তাকে না খাইয়ে মারে? কি পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে– যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি তাহলে মানুষ কোথায়? প্রথমেই আমাকে মনুষ্যত্ব আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হবো। না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? Because আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলি তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। আমি সকলের কাছে আবেদন করবো, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করবো, আজ যে শাসনতন্ত্র, আজকে আমার দুঃখ হয়, আজ আপনারা আমাকে এই কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট-এর সাথে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমরা টু-থার্ড মেজরিটি; তবু আপনারা এমেন্ডমেন্ট করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সিটে আমি আর বসবো না। এটা কম দুঃখ আমার স্পকার সাহেব, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে। কারণ সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে। যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যেখানে মানুষ অনাচার অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। চেষ্টা নতুন, আজ আমি বলতে চাই— This is second revolution, second revolution আমাদের। এই revolution-এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আমি চাই এই হাউজ থেকে স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে দেশবাসী দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলবো, দেশকে ভালোবাস, জাতির চারটি প্রিন্সিপালকে ভালোবাস। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সেকুলারিজম। তোমরা আসো, কাজ করো, দরজা খোলা। সকলকে, যারা এই মতে বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকে Constituion (কনস্টিটিউশন)

করো, আসো, কাজ করো। দেশকে রক্ষা করো। দেশকে বাঁচাও। মানুষকে বাঁচাও। মানুষের দুঃখ দূর করো। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের উৎখাত করো। আর একটা দল– তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমরা। কোনো দেশে করে নাই। স্পিকার সাহেব, আপনিও তো ছিলেন। কোনো দেশের ইতিহাসে নেই। পড়েন দুনিয়ার ইতিহাস। বিপ্লবের পরে বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সাথে সহযোগিতা করেছে, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে তাদের কোনো দেশে কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম। সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ করো, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও, থাকো। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা এখনো গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এতবড়– যারা আজকে একটা bandit (ব্যান্ডিট) মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে, সে মনে করেছে তাকে কেউ ধরতে পারবে না। তাকে যদি ধরা যায়, আজ তার দলবদল সবাইকে যদি ধরা যায়, ধরতে পারবো না কোন অফিসার ঘুষ খান? ধরতে পারবো না যদি অন্ধকারে যেয়ে বিদেশের পয়সা খান? ধরতে পারবো না কারা harder (হোর্ডার) আছেন? ধরতে পারবো না কারা Black Marketing-এ (ব্ল্যাক মার্কেটিং) আছেন? নিশ্চয়ই ধরতে পারবো সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ ইনশাল্লাহ, পাপ একদিন ধরা দিবেই, এটা মিথ্যা হতে পারে না। আর কোনোদিন দুনিয়ায় পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে আর পাপ চলে আরেকদিকে। Vice and virtue can't mix together, we should not forget it. আমরা যাদের ক্ষমা করেছিলাম তারা গ্রামে গ্রামে বসে আমাদেরকে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আজকে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেয়া হবে সব। তাদেরকে অধিকার দেয়া হবে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য? কোনো দেশে দেয় নাই, আমরা দিয়েছিলাম মাফ। মাপ যদি হজম করতে না পারা যায় তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয় তাও আমি জানি। আজ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে একথা বলতে হচ্ছে।

আজকে Amended constituion-এ (এমেন্ডেড কনস্টিটিউশন) যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি এটাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। আমাদের শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার

মাটিতে কোনোদিন আসতে পারবে না, আমরা allow (এলাউ) করবো না। বাংলাদেশকে ভালোবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসব না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসব না, আর এখন পর্যন্ত বিকজ আমি ফ্রি স্টাইল দিয়েছিলাম–যার যা ইচ্ছা তারা তা লেখে। কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোর, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের, তেমন নাই ওই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী) যারা মনে করে ভুলে যান, ভুলে যান, ভুলে যান বাংলার মাটি, বাংলার নারী মানুষ জানি। স্পিকার সাহেব, ঐ রাত্রের বেলায় দুজনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। এ আওয়ামী লীগ–বোধহয় এরকম ১০/২০ বছর আগে আরম্ভ করতে পারতাম। দশটাকে মারলাম, পাঁচটাকে মারলাম, তাতে বিপ্লব হয় না। এটা ডাকাতি হয়। ওটা খুনই হয়। ওটা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করা হয়। বাগেরহাটের একটা জায়গাতে, চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রে এসে গুলি করে মেরেছে। এটা কি একটা পলিটিক্যাল ফিলোসফি? এ ফিলোসফি দুনিয়ার পচাগান্ধা ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষেপ হয়ে গেছে। এ ফিলোসপিতে কোনোদিন দেশের মধ্যে মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনোদিন তা সাকসেসফুল হতে পারে নাই, হতে পারে না। এটা শেষ আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম। আমি তো আন্দোলনের মধ্যেই মানুষ। আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি? ফ্রি স্টাইল। ওরা কিন্তু (এনজয়িং দ্যা পুল লিবার্টি) যার যা ইচ্ছা। বিদেশীরা আসেন এখানে, গোপনে দুবোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্রিফ করে দেয়া হয়। ওরা মনে করেন, খবর রাখি না। আমরা খবর রাখি! বাংলাদেশের নিশ্চয়ই আজ তিন বছরের মধ্যে আমরা বলতে পারবো, আমরা কিছু করেছি। আপনাদের কি গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ছিল? ছিল আপনাদের ফরেন অফিস? ছিল আপনাদের ডিফেন্স অফিস? ছিল আপনাদের প্লানিং? ছিল আপনাদের ন্যাশনাল ফিন্যান্স? ছিল আপনাদের কাস্টম? ছিল আপনাদের কি? কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আমরা? উই হ্যাব নাউ অর্গানাইজ এ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট এন্ড এফেকটিভ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট, ইনশাল্লাহ্। বেটার দ্যান মেনি কানট্রিজ। আই ক্যান চ্যালেঞ্জ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক এফিসিয়েন্ট গভর্নমেন্ট দেখছি। কিন্তু আমরা যেখানে কমিউনিকেশন নাই। যেখানে কিছুই

না, সেখানে আমরা দেখতে পেরেছি ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে ৫ হাজার ৭শ' লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচাবার মতো এফিসিয়েন্সি এ দেশের গভর্নমেন্টের আমরা দেখেছি। হয় না। কি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কোনোদিন কেউ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছে? আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি। এই গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনীতির কাঠামো সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। এডমিনিস্ট্রেশন সেটআপ করেছি। আজ আমরা আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর– আমরা সমস্ত অর্গানাইজ করেছি। কি নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? আজ আপনি বসে আছেন স্পিকার সাহেব, এসেম্বলির মধ্যে কি ছিল আমাদের? বলেন কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আজকে এই অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেয়া যায় না। আমাদের পরিবর্তন দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করেই দেশের মুক্তি আসে না। যদি মানুষের মেন্টাল পরিবর্তন না হয়। এবং সেজন্য আজকে শুধু আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে এসেছি, আমাদের কর্তব্য সাথে সাথে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন, আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি স্পিকার সাহেব যে, আমরা নতুন জীবন শুরু করবো, আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করবো। কেন করতে পারবো না? পারি নাই ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত? আমরা ঘরে বসে তিন চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের মুভমেন্ট আমরা চালাই নাই? একটা চুরি হয় নাই, চুরি হয় নাই, ভলানটিয়াররা কাজ করেছে। নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে মোবিলাইজ করতে হবে। মানুষ ভালো। বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরিব, বাংলার কৃষক ভালো। বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হয়, তবে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। যত গোলমালের মূলে এই তারাই। যত অঘটনের মূলে তারাই। কারণ তারাই হলেন ভোকাল শ্রেণী। তারা বক্তৃতা করেন, তারা কাগজে লেখেন। তারা এখানে করেন, ওখানে করেন। তারা আছেন বেশ, এ অবস্থায় দেশ চলতে পারে না। সেই জন্যই শাসনতন্ত্র আমাদের পরিবর্তন (এমেন্ড) করতে হবে। এখন আমাদের সামনে কাজ কী? এক, দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। কলে-কারখানায় সব জায়গায়। পপুলেশন প্লানিং আমাদের করতে হবে এবং পপুলেশন কন্ট্রোল আমাদের করতে হবে। আমাদের দুর্নীতি, ঘুষ,

চোরাকারবারী, মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কি করতে হবে? আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল সে প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণার মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। স্পিকার সাহেব, এজন্য আজ আপনার মাধ্যমে যারা যেখানে আছেন, যারা দেশকে ভালোবাসেন, সকলকে আমি আহ্বান করবো আসুন দেশ গড়ি। আসুন, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আসুন, আমরা দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে। স্পিকার সাহেব, বড় দুঃখ, এই হাউজের আমি লিডার ছিলাম, পার্টির আমি লিডার– তখন আমি এখানে এই সিটে বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমাকে–আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নিয়ে গেছেন, আমি মেম্বার থাকতে পারলাম না। আমাকে তারা প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে এবং আজকে নতুন সিস্টেমে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। সিস্টেম পরিবর্তন করেই আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো না। যদি আপনারা চেষ্টা না করেন এবং আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে– যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে ২৫ বছর সংগ্রাম করেছিলেন, সেই সংগ্রাম আপনারা না করেন, অন্যায় অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠনমূলক কাজে, দেশ গড়ার কাজে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে, তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি এ অনুরোধ করবো, চলুন আমরা অগ্রসর হই। বিসমিল্লাহ করে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবো। খোদা আমাদের সহায় আছেন। এত বড় দুর্ধর্ষ, এত বড় শক্তিশালী এত বড় বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানী সৈন্য, এত বড় তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, ইসকান্দার মির্জা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বাংলার মানুষকে অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে, তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে শেষপর্যন্ত যদি উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর, কিছু শোষক, কিছু ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্স বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারবো না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির নাজির করে নিজের আত্মসমালোচনা করে, আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে যদি ইনশাল্লাহ কাজে অগ্রসর হন,

বাংলার জনগণকে আপনারা যা বলবেন তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাল্লাহ আমি কামিয়াব হবো। আর আপনাদের সকলকে আমি মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আপনাদের নিয়ে চালিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি, এই ক্ষমতা সুখ নয়। এ বড় কষ্ট, বড় কন্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা, তবু আমাদের কাজ করতে হবে।

স্পিকার সাহেব, আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, যারা কর্মচারী তাদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের একজন এবং একজন হিসেবে থাকবো। আমি আপনাদের পাশে থাকবো। আপনাদের মধ্যে থাকবো এবং আপনাদের নিয়ে কাজ করবো। বিশেষত, আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, কাজকর্ম করবে, কোনো অসুবিধা হবার কারণ নেই। তবে কথা হলো এই যে, সবচেয়ে বড় কাজ আমাদের We have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of the country. আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। নিচে তার বিবরণ উদ্ধৃত হলো।

আমার ভাই ও বোনেরা,
আজ ২৬ মার্চ ১৯৭৫ সাল। ৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাতে বিডিআর-এর ক্যাম্পে, পুলিশ ক্যাম্পে, আমার বাড়িতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চারদিকে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি নিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম; ৭ মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম যে আর নয়, মোকাবিলা করবো। বাংলার মানুষ যে যেখানে আছ, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করবো। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিক বাহিনীতে যারা বাঙালি ছিল, আমার বিডিআর, আমার পুলিশ, আমার ছাত্র-যুবক ও কৃষকদের আমি আহ্বান করেছিলাম। বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল, শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানী শোষক শ্রেণী। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোনো দেশ দেয়, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এমনভাবে পঙ্কিলতা শুরু করলো, যা কিছু ছিল ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছিল। ভারতে আমার ১ কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল; তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে মাগফেরাত কামনা করি, যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি তাদের কথা স্মরণ

করবো– যে সকল মুক্তি বাহিনীর ছেলে, যেসব মা-বোনেরা, আমার যে কর্মী বাহিনী যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। এদেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। আজ আমি স্মরণ করি ভারতীয় সেনাবাহিনী যারা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে। তাদের কথাও আমি স্মরণ করি।

একটা কথা। আপনাদের মনে আছে, তারা যাবার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ১৬ ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবো, সম্পদ ধ্বংস করবো, বাঙালি স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাল্লাহ্ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক স্বাধীন হয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় ওড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ আজ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথ-এর সদস্য, ইসলামী সামিট (Summit) এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না। ভায়েরা-বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি–জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা কো-একজিস্টেনসে (co-existence) বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি, তাদের আমি বিচার করি নি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য যে, এশিয়ার দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানীরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না, আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোনো অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোনো অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিল না। কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্পদ এক পয়সাও আমাকে দিল না এবং যাবার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করল, রাস্তা ধ্বংস করল, রেলওয়ে ধ্বংস করল, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষপর্যন্ত কারেন্সী নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানীরা মনে করেছিল যে, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখাতে পারবো যে, তোমরা কি করেছ।

ভুট্টো সাহেব বক্তৃতা করেন। আমি তাকে সমর্থন দিয়েছিলাম লাহোরে আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল বলে। ভুট্টো সাহেব বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কি? ভুট্টো সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ফ্রন্টিয়ারের পাঠানদের অবস্থা কি? এরোপ্লেন দিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছেন। সিন্ধুর মানুষের অবস্থা কি? ঘর সামলান বন্ধু, ঘর সামলান। নিজের কথা চিন্তা করুন, পরের চিন্তা করবেন না। পরের সম্পদ লুট করে খেয়ে বড় কথা বলা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। তোমরা আমার কি করেছো? আমি সবার বন্ধুত্ব কামনা করি। পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই কিন্তু আমার সম্পদ তাকে দিতে হবে। আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, কারো সাথে দুশমনি করতে চাই না। সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই। আমার মানুষ দুঃখী, আমার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে ৭ কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। গত তিন-চার বছরে না হলেও বিদেশ থেকে খাদ্য বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। ২২ কোটি টাকার মতো বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য আমরা পেয়েছি। সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছেন সে সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর একটি কথা, অনেকে প্রশ্ন করেন, আমরা কি করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম, দেশের ভার নিলাম তখন দেশের রাস্তাঘাট যে অবস্থায় পেলাম তাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করলাম। সেনাবাহিনী নাই–প্রায় ধ্বংস করে গেছে; পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভালো করতে কী করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না, আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না, বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না, প্লানিং ডিপার্টমেন্ট ছিল না। এখানে কিছুই ছিল না– তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হলো। যারা শুধু কথা বলেন তারা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন আমরা কি করেছি। ১ কোটি লোককে ঘরবাড়ি দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোকে অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ

খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে।

তাই আজ কথা আছে। আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তি বাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক– আমার জানা আছে, যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল তারা অস্ত্র জমা দেয় নি। তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে শুরু করল। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করল। তবুও আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দিলাম। কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয় সে জন্য দোষ আমার নয়। ৩১৫ সদস্যের মধ্যে ৩০৭ সিট বাংলার মানুষ আমাকে দিলেন। কিন্তু একদল লোক বলে, কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোনো দিন কোনো দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কেউ কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না। কিন্তু অধিকার ভোগ করতে হলে তার জন্য রেস্‌পনসিবিলিটি আছে সেটা তারা ভুলে গেলেন। আমি বললাম তোমরা অপজিশন সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করলো। বক্তৃতা করতে আরম্ভ করল। অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করল। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। অস্ত্রের হুমকি দেয়া হলো। মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেললাইন ধ্বংস করে, ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে, জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যাতে বিদেশী এজেন্টরা– যারা দেশের মধ্যে আছে তারা সুযোগ পেয়ে গেল। আমাদের কর্তব্য মানুষকে বাঁচানো। চারদিকে হাহাকার, স্বাধীনতা পাবার সাথে সাথে সমস্ত জিনিসের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। সমস্ত দুনিয়া থেকে আমাদের কিনতে হয়। খাবার কিনতে হয়, ওষুধ কিনতে হয়, তেল কিনতে হয়। আমরা তো কলোনি ছিলাম, দুইশ' বছর ইংরেজদের কলোনি ছিলাম। ২৫ বছর পাকিস্তানের কলোনি ছিলাম। আমাদের তো সবকিছুই বিদেশ থেকে কিনতে হয়। কিন্তু তারপরেও বাংলার জনগণ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তারা এগুবার দেয় না, কাজ করতে দেয় না। আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল, তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করল। আজ এতদিনে কেন বলছি একথা! অনেক বলেছি, এত বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার চোখের সামনে মানুষের মুখ ভাসে, আমার দেশের মানুষের রক্ত আমার চোখের সামনে ভাসে, আমরা মানুষেরই আত্মা, আমার চোখের সামনে যে সমস্ত শহীদ ভাইরা ভাসে যারা ফুলের মতো ঝরে গেল,

শহীদ হলো। তাদের আত্মার কাছে, রোজকিয়ামতে কি জবাব দিল 'আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করেছো, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই।'

কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হলো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়, ফ্রিস্টাইল। ফ্যাক্টরিতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই। স্লোগান হলো– বঙ্গবন্ধু কঠোর হও।

বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে। কঠোর ছিল, আছে। কিন্তু দেখলাম, চেষ্টা করলাম। এত রক্ত এত বাধা দুঃখ–দেখি কি হয় পারি কিনা। আবদার করলাম। দুঃখে আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, রিকোয়েস্ট করলাম, কামনা করলাম। চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী। ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, আজকে যে সিস্টেম করেছি তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও', বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই, বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার জন্য।

দুঃখের বিষয়, তারা রাতের অন্ধকারে পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্যকে হত্যা করেছে, তিন-চার হাজারের মতো কর্মীকে হত্যা করেছে। আরেক দল দুর্নীতিবাজ টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। তবে যেখানে খালি দুর্নীতি ছিল গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে ইনশাআল্লাহ কিছুটা অবস্থা ইমপ্রুভ করেছে। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আজকে কিছু করা হয়েছে। হাঁ, প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন দুইজন তিনজনকে নমিনেশন দেয়া হবে। জনগণ বাছবে কে ভালো, কে মন্দ। আমার চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র– এটা পরিষ্কার।

আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি। আজকে আমাদের কাজ কি? আজকে আমাদের সামনে অনেক কাজ। আমি সকলকে অনুরোধ করবো। আপনারা মনে কিছু

করবেন না, আমার কিছু উচিত কথা কইতে হবে। কারণ আমি কোনোদিন ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। সত্য কথা বলার অভ্যাস আমার আছে। মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলবো। বন্যা হলো। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেল, হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরে গেল। দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনলাম। ৫৭ হাজার লঙ্গরখানা খুললাম মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কি স্বাধীনতা? আপনাদের মনে আছে, আমার কথার মধ্যে দুইটা কথা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না। আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাকমার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমি কেন ডাক দিয়েছি? এই ঘুণেধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তানী আমলের যে শাসন ব্যবস্থা তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে। তাহলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বছর দেখেছি। দেখেশুনে আমি আমার স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি। এবং তাই জনগণকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্মকথা।

আজকে জানি, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার চেয়ে অধিক কে জানতে পারে? বাংলার কোন থানা আমি ঘুরি নাই, বাংলার কোন জায়গায় আমি যাই নাই, বাংলার কোন মানুষকে আমার মতো কে ভালো করে জানে?

আপনারা দুঃখ পান, না খেয়ে পাচ্ছেন, আপনাদের গায়ে কাপড় নাই, আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস খাদ্য।

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে–সরকারি আইন করে কোনো দিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমার একমাত্র অনুরোধ আপনাদের কাছে, সেটা হলো এই, আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে জেহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে

আমি বলবো, বাংলার জনগণের এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। কেমন করে করতে হবে। আইন চালাবো, ক্ষমা করবো না। যাকে পাবো ছাড়বো না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণআন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে নামবো। এমন আন্দোলন করতে হবে যে, ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয় তাদের সামাজিক বয়কট করতে হবে। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখতে হবে, ঐ চোর, এ ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, ঐ ঘুষখোর! ভয় নাই, কোনো ভয় নাই, আমি আছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দিব না। কিন্তু আপনাদের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে পারে কে? ছাত্র ভাইরা পারে, পারে কে? যুবক ভাইরা পারে। পারে কে? বুদ্ধিজীবীরা পারে। পারে কে? জনগণ পারে। আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোরের চোর, এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে তা জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চোরদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম। এই চোর রেখে গিয়েছে। কিন্তু দালাল গিয়েছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম।

দ্বিতীয় কথা, আপনারা জানেন– আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ায় সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারবো না, দ্বিগুণ করতে পারবো না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ভিক্ষা করতে হবে না।

ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই। একটা লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন এক টাকা বা আট আনা। তারপর তার দিকে কিভাবে চান বলেন, "ও বেটা ভিক্ষুক, যা বেটা, নিয়ে যা আট আনা পয়সা।" একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও– সেই জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে– যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই–

জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না। ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না। আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ বছর '৭৫ সালে আমাকে ৬ কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কি করে মানুষকে বাঁচাবো? কি করে অন্যান্য জিনিস কিনবো? অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লাখ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লাখ বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বছরে বাংলায় কোনো জমি থাকবে না চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ, বাংলার মাংস খাবে। সে জন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো ৩ নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো– দুর্নীতিবাজ খতম কর, দুই নম্বর হলো– কারখানায় ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর হলো– পপুলেশন প্ল্যানিং, চার নম্বর হলো– জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশ ভলোবাসে, এর আদর্শ বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎপথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হবার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।

ভায়েরা, বোনেরা আমার,
এই জাতীয় দলের আপাতত ৫টা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই ৫টা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। আমাকে অনেক বলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ হলে আমাদের কি হবে। আমি বলি আওয়ামী মানে তো জনগণ, ছাত্র যুবক শিক্ষিত সমাজ সরকারি কর্মচারী সকলে মিলে কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

শিক্ষিত সমাজকে আমি অনুরোধ করবো, আমরা কতজন শিক্ষিত লোক। আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক; তারমধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমি যে এই দুর্নীতির কথা বললাম, আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্ল্যাকমার্কেটিং করে কারা? বিদেশী এজেন্ট হয় কারা? বিদেশী টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা, শতকরা ৫ জন শিক্ষিত–এই আমাদের মধ্যেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে। আতশুদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতিবাজ এই শতকরা ৫ জনের মধ্যে, এর বাইরে নয়। শিক্ষিত সমাজকে একটা কথা বলব, আপনার চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে, আমরা বলব, এই বেটা কোত্থেকে আইছিস? বাইরে বয়, বাইরে বয়। একজন শ্রমিক যদি আসে, বলি, এখানে দাঁড়া। এই রিকশাওয়ালা, ঐভাবে বসিস না। তাচ্ছিল্যের সাথে কথা বলে। তুচ্ছ করে। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনে দেয় গরিব কৃষক, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন। ইজ্জত করে কথা বলুন। ওরাই মালিক, ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে। সরকারি কর্মচারীদের বলি, মনে রেখো এটা স্বাধীন দেশ। এটা ব্রিটিশের কলোনি নয়, পাকিস্তানের কলোনি নয়। যে লোককে দেখবে তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো, তোমার ভায়ের মতো, ওরাই পরিশ্রমের পয়সা, ওরাই সম্মান বেশি পাবে। কারণ ওরা নিজেই কামাই করে খায়। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না, আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ডাক্তারি পাস করায় কে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করায় কে? সায়েন্স পাস করায় কে? বৈজ্ঞানিক করে কে? অফিসার করে কে? কার টাকায়?

বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। একজন ডাক্তার হতে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। একজন ইঞ্জিনিয়ার করতে ১ লাখ সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। বাংলার জনগণ গরিব। কিন্তু এরাই ইঞ্জিনিয়ার বানাতে টাকা দেয়, মেডিক্যালের টাকা দেয় একটা অংশ। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শিক্ষিত ভাইদের যে আপনার লেখাপড়ার খরচ দিয়েছে তা শুধু আপনার সংসার দেখার জন্য নয়। আপনার ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য নয়। দিয়েছে তাদের জন্য আপনি কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন বলে। তাদের আপনি কি দিয়েছেন? কি ফেরত দিয়েছেন, কতটুকু দিচ্ছেন?

তার টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, তার টাকায় ডাক্তার সাহেব, তার টাকায় অফিসার সাহেব, তার টাকায় রাজনীতিবিদ সাহেব, তার টাকায় মেম্বার সাহেব, তার টাকায় সব সাহেব। আপনি দিচ্ছেন কি? কি ফেরত দিচ্ছেন? আত্মসমালোচনা করেন, বক্তৃতা করে লাভ নাই। রাতের অন্ধকারে খবরের কাগজের কাগজ ব্লাকমার্কেটিং করে সকালবেলা বড় বড় কথা লেখার দাম নাই। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মদ খেয়ে অনেস্টির কথা বলার দাম নাই। আত্মসমালোচনা করুন, আত্মশুদ্ধি করুন; তা হলেই হবেন মানুষ। এই যে কি হয়েছে সমাজের। সমাজ ব্যবস্থায় যে ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই–যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না জমি নিয়ে যাবো– তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান– এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।

আপনাদের জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। দ্বিতীয়, থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী, সরকারি কর্মচারী, যেই হয়–একজন করে চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী। তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুবক প্রতিনিধি থাকবে, কৃষক প্রতিনিধি থাকবে– তারাই থানাকে চালাবে। আর মহকুমা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল

হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী একসাথে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবেন– এইভাবে আমি একটা সিস্টেমের চিন্তা করছি এবং করবো বলে ইনশাআল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।

ভাই ও বোনেরা আমার,

আজকে একটা কথা বলি। আমি জানি শ্রমিক ভাইয়েরা, আপনাদের কষ্ট আছে। এত কষ্ট, আমি জানি। তা আমি ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের কষ্টের সীমা নেই। কিন্তু কোথা থেকে হবে? টাকা ছাপিয়ে বাড়িয়ে দিলেই তো দেশের মুক্তি হবে না। ইনফ্লেশন হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে পারলে তার পরেই আপনাদের উন্নতি হবে, না হলে উন্নতি হবে না। আমি জানি। যেন আমরা আজকে দেখেছি। কপাল। আমাদের কপাল। আমরা গরিব দেশ তো। আমাদের কপাল– আমাদের পাটের দাম নাই। আমার চায়ের দাম নাই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর আমি যখন কিনে আনি– যারা বড় বড় দেশ তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। আমরা এই জন্য বলি, তোমরা মেহেরবানি করে যুদ্ধের মনোভাব বন্ধ করো। আরমামেন্ট রেস বন্ধ করো। তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করো। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় করো। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। আজকে তোমরা মনে করছো আমরা গরিব–

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের
করেছো অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের
সবার সমান।

তোমরা মনে করেছো আমরা গরিব, যে দামই হোক আমাকে বিক্রি করতে হবে। এইদিন থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি, ইনশাআল্লাহ এদিন থাকবে না। তোমরা আজকে সুযোগ পেয়ে জাহাজের ভাড়া বাড়িয়ে দাও। জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাও।

আর তাই আমাদের কিনতে হয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরি, আমাদের ইনফ্লেশন হয়, আমরা বাঁচতে পারি না। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাই, তোমরা কিছু খয়রাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাসো। হাসো, হাসো। দুঃখে পড়েছি, বিক্রীত হয়েছি। তোমাদের কাছে হাত পাততে হবে, হাসো। অনেকে হেসেছে– যুগ যুগ ধরে হেসেছে। হাসো। আরব ভাইয়েরাও গরিব ছিল। আরব ভাইদের সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। প্যালেস্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংলার মানুষ। আরব ভাইদের পিছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার জন্য। এও আমাদের পলিসি। যেখানে নির্যাতিত দুঃখী মানুষ সেখানে আমরা থাকব।

শ্রমিক ভাইয়েরা, আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করছি। আপনাদের প্রতিনিধি ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, লেবার ডিপার্টমেন্ট শ্রমিক প্রতিনিধি বসে একটা করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কি করে আমরা বাঁচতে পারি তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ছাত্র ভাইয়েরা, আপনারা লেখাপড়ার কাজ শিখেন। আমি খুশি হয়েছি যে, আপনারা নকল-টকল বন্ধ করেছেন একটু। কিন্তু একটা কথা আমি বলব, আমি পেপারে দেখেছি যে এবারে প্রায় এক পার্সেন্ট পাস, দুই পার্সেন্ট পাস, তিন পার্সেন্ট পাস। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্জি দুই পার্সেন্ট পাস করিয়ে আপনাদের কর্তব্য পালন করলেন। আপনাদের কর্তব্য আছে, ছেলেদের মানুষ করতে হবে। ফেল করানোতে আপনাদের তেমন বাহাদুরি নাই, পাস করালেই বাহাদুরি আছে। আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। খালি ফেল করিয়ে বাহাদুরি নিবেন তা হয় না। তাদের মানুষ করুন। আমি তো শিক্ষকদের বেতন দিব। আমরা সব আদায় করবো। আপনারা লেখাপড়া শিখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন। তাদের একটু মানুষ করার চেষ্টা করুন। একটু সংখ্যা বাড়ান, শুধু ১%, ২%, ৫% দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে বলবেন খুব স্ট্রিক্ট হয়েছি। আমি স্ট্রিক্ট চাই, নকল করতে দিবেন না। তবে আপনাদের কাছে আবেদন, মেহেরবানি করে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন, ছেলেদের মানুষ করার চেষ্টা করুন। পাসের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন। ওদের মানুষের মতো মানুষ তৈরি করুন। সেটাই ভালো হবে। রাগ করবেন না। আপনারা আবার আমার উপর রাগ করেন। আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের শুধু সম্মান করি। শুধু এইটুকুই বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যয় করুন। এর বেশি কিছু বলি না। বাবা, ওঁদের কিছু বলে কি বিপদে পড়ব। আবার কে কি বই লিখে বসবে। খালি সমালোচনা করলে লাভ হবে না।

আবার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।

আর একটা কথা বলতে চাই, বিচার। বিচার। বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে সেই মামলা শেষ হতে লাগে প্রায় ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ঐ মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, তিন বা চার বছরের আগে শেষ হয় না।

এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে থানায় ট্রাইব্যুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে–তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি সেটা হবে, তাই আমি একথা জানতে চাই আপনাদের কাছ থেকে, জানতে চাই একটি কথা। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে আমি কো-অপারেটিভ করবো, থানা কাউন্সিল করবো, সাবডিভিশনাল কাউন্সিল হবে, আর আমি যে আপনাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ফসল চেয়েছি, জমিতে যে ফসল হয় তার ডবল, কলকারখানায় কাজ–সরকারি কর্মচারী ভাইরা একটু ইনডিসিপ্লিন এসে গেছে। অফিসে যান, কাজ করেন। আপনাদের কষ্ট আছে, আমি জানি। দুঃখী মানুষ আপনারা। আপনারা কাজ করেন। তাদের পেটে খাবার নাই। তাদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পোষাতে পারবো না। প্রোডাকশন বাড়লে আপনাদেরও এদের সাথে উন্নতি হবে। এই যে কথাগুলো বললাম আপনারা আমাকে সমর্থন করেন কিনা, আমার উপর আপনাদের আস্থা আছে কিনা, আমাকে দুই হাতে তুলে দেখিয়ে দিন।

ভায়েরা, আবার দেখা হবে, কি বলেন, ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনারা বহুদূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ফিরে যান। যেয়ে বলবেন, দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে। ক্ষেতে-খামারে কলে-কারখানায় প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইরা, আপনারাও কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করুন। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে। আপনারা স্লোগান দিন আমার সাথে, জয় বাংলা।

বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।

বিনা কারণে সিস্টেম পরিবর্তন করি নি

বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেন তা নিচে উদ্ধৃত হলো।

আজকে প্রথম দিন আমরা এখানে বসেছি সকলের সাথে দেখাশোনা করবার জন্য–যাকে বলা হয় গেট টুগেদার। যাতে আমরা মেম্বার যারা রয়েছি, সকলে একসাথে বসতে চাই, সকলকে যেন চেনা যায়, আলোচনা করা যায় এবং জানা যায়, কি অবস্থা।

শিগগিরই এসেম্বলি সেশন হবে। বাজেট সেশন। আগস্ট মাসে সেন্ট্রাল কমিটি বৈঠক বসবে। একদিন দু'দিনের নয়, দরকার হলে পাঁচ সাত দিনের জন্য বসবে। এবং সেই সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে বিভিন্ন এজেন্ডা দেয়া হবে। সেই এজেন্ডা অনুযায়ী কনফারেন্সকে ভাগ করে কতকগুলো সাব-কমিটি বা কমিশন করে দেয়া হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং বাইরের কাউকে যদি দরকার হয় তাদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে একটি প্রপোজাল সাবমিট হবে কনফারেন্সের কাছে। যেমন, ফুড, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, ফ্লাড কন্ট্রোল, এডুকেশন ইত্যাদি। বিভিন্ন সাবজেক্টের সাব-কমিটি করে তাদের কাছে ভার দেয়া হবে। রেসপেক্টিভ মিনিস্টার সেখানে থাকবেন। সরকারি কর্মচারীরা থাকবেন। যদি দরকার হয়, বাহির থেকে–যাঁরা আমাদের কমিটি মেম্বার নন, কিন্তু যাঁরা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, তাঁদের আমরা ইনভাইট করতে পারবো। সেখানে বসে কতটুকু কি করা হয়েছে, কতটা ভুল হয়েছে, কি ত্রুটি হয়েছে বা কি করলে আমরা দেশের ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারবো, সে সম্পর্কে সাজেশন দিলে তখন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে এটা প্রস্তাব করে গভর্নমেন্ট সেই অনুযায়ী তাঁদের কাজকর্ম করবেন। এই আমাদের ইচ্ছে। আগস্ট মাসে একটা ফুল এজেন্ডা নিয়ে কাজ শুরু করা।

আপনাদের কাছে বক্তৃতা করে বোঝানোর দরকার নাই। তবে, এটুকু বলতে পারি, কেন আমরা এ নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করলাম আর কেনই বা

আমরা একে বিপ্লব বললাম। সেদিন ডক্টর এনামুল হক সাহেবের একটা লেখা পড়লাম। তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশ কি স্বাধীন হয় নাই, সেকথা সত্য নয়। বাংলাদেশ অনেকবার স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা রাখতে পারে নাই। বিদেশীদের ডেকে আনতে হয়েছে, ডেকে এনেছে এই বাঙালিরাই। কথাটা আমার মনে লাগল। কিন্তু আমি তো তাঁর মতো শিক্ষিত নই। তিনি তো আমার চেয়ে অনেক গুণীজন, গুরুজন। তাঁকে আজো ভক্তি করি আমি। আমি যা চিন্তা করতাম বা ইতিহাসে যা পড়েছি, তা তাঁর কথা পড়ে আমি কনফার্ম করলাম। আজকে স্বাধীনতার পরে বিনা কারণে এইভাবে সিস্টেম চেঞ্জ করি নাই। বাংলাদেশে নির্বাচন দিয়েই ৯৭ পারসেন্ট ভোট আউট অব থ্রি হানড্রেড ফিফ্‌টিন, থ্রি হানড্রেড সেভেন সিটস আমাদের পার্টি আওয়ামী লীগের ছিল। যদি তার পরেও ইলেকশন দিতাম, এখনো বিশ্বাস করি, দুই এক পারসেন্ট বাদ যেতেও পারে, কিন্তু নব্বই পারসেন্টের কম পাবে না আমাদের পার্টি। সেজন্য এই সিস্টেমে ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক দিন ছিল না, যদি ক্ষমতায় থাকতে চাইতাম। আর ক্ষমতার জন্য রাজনীতি যদি করতাম, তাহলে আমরা অনেকবারই ক্ষমতায় আসতে পারতাম। যদি নিগোশিয়েসন বা আপোসে আমরা ক্ষমতা চাইতাম, তাহলে কেন আমরা এই পরিবর্তন করলাম?

আজ দুনিয়ার দিকে আমাদের চাইতে হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের কি দশা হলো? ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম–এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম। সাড়ে ৭ কোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোনো পদার্থ আমাদের ছিল না। সমস্ত কিছু ধ্বংস। আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম যে, ঠিক আছে। আমরা একদম যাকে বলে ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বলো, আচ্ছা করো, আচ্ছা দল গড়ো, আচ্ছা লেখো, আচ্ছা বক্তৃতা করো। বাধা নাই, ফ্রি হ্যান্ড।

আমাদের অনেক পুরানো নেতৃবৃন্দ আছেন, আমার মনে পড়ে না যে, দশ-বিশ বছরের মধ্যে তাঁদের কেউ পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গালাগালি না করে ফিরে গেছেন। এ আমার জানা নাই বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু তাও বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বললাম, যদি কিছু ভালো কথা বলতে চাও বলো। যদি দেশের মঙ্গল হয়, বলো। কিন্তু দেখতে পেলাম কি? আমরা যখন এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশী চক্র এ দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তারা এ দেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রি স্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে

বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করলো। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

এ ছাড়াও আরো দেখা গেল, যাদের আমরা এ সমস্ত ভোগ করতে দিলাম, তারা রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আমরা বলেছি যে, বাবা, ঠিক আছে, পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে, ইলেকশন করো, ইলেকশনে যদি ডিফিট খাই, আর একজন এসে বসবে। হাইকোর্টের একজন এক্স-জাজ আমাদের ইদরিস সাহেবকে ইলেকশন কমিশনার করা হয়েছিল। তাঁকে আমি ইলেকশনের ব্যাপারে বলেছি, কোনো কথা নাই। যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন আপনি, ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। তারপরও যাঁরা ইলেকটেড মেম্বার তারা পার্লামেন্টে, রাতের অন্ধকারে তাঁদের হত্যা করা হলো। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন, দেশত্যাগ করেছেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যাঁদের সম্পত্তি, তাঁদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হলো। মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হলো, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাঁদের হত্যা করা হলো। চরম ষড়যন্ত্র। এতো অস্ত্র উদ্ধার করি, তবু অস্ত্র শেষ হয় না। এই রাজনীতির নাম হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি, টেলিফোন করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয় রাজনীতির নামে, একটা ফ্রি স্টাইল শুরু হয়ে গেল।

নব্য, কিছুদিন আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটা দেশে এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। পিপ্‌ল-এর মধ্যে যে ডিমরালাইজিং ইফেক্ট হয়, তার ফল খুব খারাপ হয়। আমরা জানি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। আমরা জানি, বন্যা হয়েছে, এক কোটি লোক চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে, তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দরকার। ওয়ার্লড ইনফ্লেশন, যা আমার হাতে আপনার হাতে নয়–জিনিসের দাম বেড়ে গেল। ড্রাফট হলো বাংলাদেশে, এই সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে। ফ্লাড এল। সাড়ে ৭ কোটি লোক, ২০০ বছরের গোলামি, অর্থনৈতিক কাঠামো নাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলে কোনো গভর্নমেন্ট নাই, সবকিছু রয়েছে ইসলামাবাদে। একটা প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট ছিল, ছোটখাটো। তাও নয় মাসে আর্মি কন্ট্রোলে নিয়ে নিলো। তাদের স্টাকচার ধ্বংস করে দিলো। নাই একটা ফরেন অফিস, নাই একটা প্ল্যানিং অফিস, নাই একটা কোনো কিছু। আমাদের সবকিছু আরম্ভ করতে হয়েছিল

গোড়া থেকে। এই সুযোগে আমাদের যারা স্বাধীনতার নামে অনেক চেষ্টা করেছিল, নিজেদের একটা বেস করা যায় কিনা, ভবিষ্যতে তাদের স্টুজ-রা এ দেশে সরকার চালাতে পারে কিনা তারা তার ফিকির খুঁজতে লাগল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এবং আগে যে পলিসি আমরা নিয়েছি, বৈদেশিক নীতি, বাংলাদেশের মানুষ, শিক্ষিত সমাজ এবং দুনিয়া এটাকে এ্যাপ্রিশিয়েট করেছে।

আমরা নন-এলায়েন্ড, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি, আমরা পিসফুল কো-এক্সিসটেনস-এ বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত পিপলের সাথে আছি, আমরা কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা আন্ডার ডেভেলপড্ কান্ট্রি, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই। আমরা কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমরা চাই না। আমরা দেশকে গড়তে চাই, আমরা সকলের শান্তি চাই, আমাদের লোক বাঁচতে চায়। এই পলিসি সকলেই, প্রায় whole world পছন্দ করল। আমার দেশবাসী এতে সমর্থন জানাল।

আমরা মনে করি, আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণরূপে সাক্সেসফুল হয়েছে। আজ আমরা নন-এলায়েন্ড কান্ট্রিতে আছি, আজ আমরা ইসলামিক সামিটে আছি, আজ আমরা কমনওয়েলথে আছি, আজ আমরা ইউ.এন.ও.তে আছি। ইউ.এন.ও-র চার্টারে বিশ্বাস করি। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে আমাদের প্রয়োজন নাই। এদের আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। যেখানে কোনো অপ্রেসড ইন্টারন্যাশনাল পিপল থাকবে, আমরা তাদের মর‍্যাল সমর্থন দিতে পারি এবং দেব। যেখাই থাকুক না কেন, আমরা দেব। আমরাও অপ্রেসড পিপল। আমরাও যুগ যুগ ধরে এটার সাথে পরিচিত ছিলাম। আমরাও মার খেয়েছি। দুনিয়ার শোষকগোষ্ঠী, ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ার আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের স্বজন হারানোর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, আমাদের অর্থনীতির মালিক আমরা এবং আমাদের দেশ সেই সম্পদ ভোগ করবে।

পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা এতো রক্ত দিয়েছি, এতো আমরা আঘাত পেয়েছি, এতো আমাদের ইনটেলেকচুয়ালকে হত্যা করা হয়েছে, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের রাস্তাঘাট ধ্বংস করা হয়েছে, তবুও আমরা বলেছি, আমরা সকলের

সাথে বন্ধুত্ব চাই। ১৯৫ জন, যারা কমিটেড ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, তাদের পর্যন্ত আমরা মাফ করে দিলাম। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা এ দেশে সাউথ-ইস্ট এশিয়া, পারটিকুলারলি সাব-কন্টিনেন্টে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে এ দেশে ডেভেলপমেন্টের কাজ করব। আমাদের এটেনশান থাকবে মানুষের মঙ্গল করা, দেশকে গড়া। কিন্তু পাকিস্তান, দুঃখের বিষয়, একটা পয়সা পর্যন্ত দিলো না। আমরা ছিলাম ৫৬ পারসেন্ট পপুলেশন, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সম্পদ আমাদের ছিল না। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আমাদের দিলো না। গোল্ড রিজার্ভ আমাদের দিলো না। আমাদের কোনো একটা জাহাজ দিলো না। কোনো কিছুই তারা আমাদের দিলো না। আমরা আমাদের দিক দিয়ে শত চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তরা এগিয়ে এল না। দ্যাটস্ অল রাইট। মাটি আছে, মানুষ আছে, দেশ আছে। ইনশাআল্লাহ, কষ্ট হয়েছে আমার মানুষের না খেয়ে মরেছে সত্য কথা, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে যে সম্পদ আছে, যদি গড়তে পারি, অনেস্টলি কাজ করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের কষ্ট একদিন দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, আমরা এখনো পর্যন্ত চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা এগুচ্ছে না।

কারো সঙ্গে দুশমনি নাই। চায়না রিকগনিশন দিলো না। কিন্তু আমরা চায়নার সাথে বন্ধুত্ব চাই। তারা একটা বিগ কান্ট্রি। আমরা এখনো বন্ধুত্ব চাই। আমার সাথে বন্ধুত্ব আছে রাশিয়ার, আমার বন্ধুত্ব আছে ভারতবর্ষের সাথে, আমার বন্ধুত্ব আমেরিকার সাথে। এ বন্ধুত্ব সকলের সাথে চাই। আমরা কারো সাথে গোলমাল করতে চাই না। কারণ, আমি আমার দেশকে গড়তে চাই।

এই পলিসিতে আজ পর্যন্ত আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু দেশের মধ্যে এজেন্সি শুরু হয়ে গেল। বহুদিন রাজনীতি করেছি। ১৮ বছর বয়স থেকে। তখন বোধ হয় ১৯৩৮ সাল। তারপর চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, পায়ে হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি। সেই রাজনীতি থেকে আজ এ পর্যন্ত এসেছি। আমি বলতে চাই না যে, আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি। সাধারণ মানুষ থেকে আমি চোঙ্গা ফুঁকেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজনীতি করেছি। আমি জানি, একটা খবরের কাগজ চলতে পারে না, যদি এ্যাডভারটাইজমেন্ট না পায়। বছরের পর বছর এই টাকা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ব্যয় করতে পারে বলে আমার জানা নাই। আর

আমি হলাম বিগেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি লিডার। আমি দেশে একটা পার্টি গড়ে তুলেছি এবং চালিয়েছি, যেটা নাম্বার ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি অব বাংলাদেশ, কিন্তু আমি একটি ডেইলি কাগজ চালাতে পারি না। অর্ধেক ভাগ করেন তার মানিক ভাই। বরং মানিক ভাইয়ের এবিলিটি এবং এক্সপেরিয়েন্স ছিল, ইত্তেফাক কাগজ চালাতেন তিনি। তা থেকে আমাদের সমর্থন করতেন। অথচ এই তিন বছরের মধ্যে দেখা গেল, এমন কাগজও চললো, যে কাগজ বছরে এক ইঞ্চি এডভারটাইজমেন্ট পায় নাই। কিন্তু একটা কাগজ করতে মাসে কমপক্ষে এক লাখ, সোয়া লাখ, দেড় লাখ টাকা খরচ হয়। আজকে এই টাকা তারা কোথায় থেকে পায়? কে দেয় তাদের এই টাকা, কোথা থেকে আসে? তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলতে যে পদার্থ বাংলাদেশে আছে, তাদের এতো টাকা আছে বলে আমার জানা নাই। ছিল কিনা তাও জানি না। এখন কিছু লোক নতুন টাকার মানুষ হয়েছে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা নিয়ে নিলাম। দেখা গেল যে, বিদেশের কিছু কিছু জায়গা থেকে পয়সা পেয়ে তারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, গোলমাল সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা এই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করলাম কেন? এই যে আমাদের সমাজ এখানে দেখতে পাই–আমি অনেক চিন্তা করেছি, বহুদিন কারাগারে একলা বসে বসে চিন্তা করতে আমি সময় পেয়েছি, এই সব বিষয়ে যে, আমার দেশের ২০% লোক শিক্ষিত। তার মধ্যে আমরা ১০% বা ৫% লোক লেখাপড়া কিছুটা জানি। এর মধ্যে এক গ্রুপ আমরা পলিটিসিয়ান হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। এক গ্রুপ স্কুল টিচার, যারা এই ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে আসতে চায় না। এক গ্রুপ সরকারি কর্মচারী হয়ে গেলাম। কেউ ডাক্তার হয়ে গেলাম, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম, কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আর কিছু সংখ্যক লোক হয়ে গেলাম রাজনীতিবিদ। কিন্তু একচুয়ালি যেটা পিপল, তাদেরসহ সবাইকে একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না।

সেজন্য আমরা চিন্তা করলাম, সমাজের যেখানে যিনি আছে, তিনি বুদ্ধিজীবী হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, ল-ইয়ার হন, আর যাই হন–কারণ, আমার সমাজে তো শতকরা ২০ জনের বেশি শিক্ষিত নন–এদের মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সেজন্য নতুন সিস্টেমের কথা বহুদিন পর্যন্ত

চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে। এবং ভালোভাবে গ্রহণ করেছে।

আর একটা জিনিস আমি মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে, একদল বলে, আমরা পলিটিসিয়ান, একদল বলে আমরা ব্যুরোক্রেট। তাদের এ্যাটিচিউট হলো হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিসিয়ান। পলিটিসিয়ানরা তাদের স্ট্রেংথ দেখাবার জন্য বলতো যে, অল্ রাইট, গেট আউট। এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকতো। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং দূর করে–সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়, এটা প্রমাণ করতে হবে। আমার সমাজে যে সমস্ত গুণীজ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের যতো লোক আছেন তাঁদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন দল সৃষ্টি করে–জাতীয় দল, যার মধ্যে এক মত, এক পথ, এক ভাব–এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারে। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।

আর দ্বিতীয়ত, পয়সাকড়ি খরচ করে অন্য ধরনের রাজনীতি করা যায়। কিন্তু আমি যেটা বলেছি শোষিতের গণতন্ত্র, কেন বলেছি? শোষিতের গণতন্ত্র এ জন্য বলেছি যে, আজকে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে মানুষ। বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছে, অল রাইট, যাও তুমি, যেয়ে কনটেস্ট করো। আমি যেয়ে কিছু বক্তৃতা করে দিয়ে এলাম, যাও। পছন্দ হয় না, কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আর করবো কি, ভোটটা দিয়েই দিলাম। এ-ও হয়েছে অনেক জায়গায়, হয়। কাজেই সেজন্য সিস্টেম চেঞ্জ করে বলেছি যে, কনস্টিটিউয়েন্সিতে চারজন কি তিনজন কি দুইজন লোক আছে, তাদের সম্বন্ধে সকলকে বলে দেয়া হলো, এই তিনজন চারজন পার্টির লোক আছে তাদের মধ্যে যাকে আপনারা পছন্দ করেন, ভোট দিন। ফলে জনগণ সুযোগ পেলে এ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওন চয়েস ভালো লোককে পাঠাবার জন্যে। না হলে আমরা অনেক সময় 'জিন্দাবাদ' 'মুর্দাবাদ' দিয়ে পাস করে নিয়ে আসি। তাতে দেখা গেল যে, সত্যিকারের ভালো লোক অনেক সময় নাও আসতে পারে। কিন্তু এতে সত্যিকারের ভালো লোক আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেজন্য এই সিস্টেম করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, জাতীয় ঐক্য, যেটা বলেছি আমি, জাতীয় ঐক্য আমরা করতে পারবো। যারা দেশকে ভালোবাসে না, দেশের সাথে বেঈমানি করছিল, তাদের সকলকে আমরা ক্ষমা করলাম। স্বাধীনতার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করল, বেঈমানি করল, রাজাকার হলো, তাদেরও আমরা ক্ষমা করে দিলাম। অন্য দেশে বিপ্লবের পরে এভাবে ক্ষমা করে নাই। একেবারে নির্মূল করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা ক্ষমা করলাম। বললাম যে, ঠিক আছে, তওবা করো, আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান দিক। তোমরা দেশের কাজ করো। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তাদের মধ্যে একটা গ্রুপ সেই শত্রু–যে শত্রু আমাদের এখানে ম্যাসাকার করল, তাদের মাধ্যমে লন্ডনে বসে অর্থ খরচ করে বাংলাদেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। তাদের কি অধিকার আছে বাংলাদেশে রাজনীতি করবার? ক্ষমা করতে পারি। প্রভিশন হবে ৬০টি জেলার। প্রত্যেক জেলার জন্য একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁর অধীনে এস.পি. থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। কাউন্সিলে সরকারি কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবেন। তিনি স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন।

শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রকীকরণ করা হবে। জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তার কাছে যাবে আমার খাদ্যসামগ্রী। তাঁর কাছে যাবে আমার টেস্ট রিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে। তবে, ব্রিটিশ আমলারা বলে গেছেন, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে হবে, এস.ডি. ও সাহেব যা করলেন, সেটাই হবে ফাইনাল কথা, সি.ও. শাসন করবেন থানায় বসে, সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাখতে হবে? এতে দেশের মঙ্গল হবে না। কারণ আমি যে টাকা দেব একটা থানায়, সেই টাকা দেব সি.ও. সাহেবকে। এনি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ বেটার দ্যান এনি সি.ও.ইফ দি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ সিনসিয়ার। অন্যথায় ক্যাশের টাকা সেখান থেকে লুট হয়ে যাবে।

আমি অর্ডার দিয়েছি, আজকে অর্ডার হয়ে গেছে। ১৫ জুলাই থেকে এই ৬০ জন গভর্নরকে ট্রেনিং দেয়া হবে। ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে।

এক বছরের মধ্যে থানা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করতে হবে। সেখানে বাকশালের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, শ্রমিকের থাকবে, যুবকের থাকবে, মহিলাদের থাকবে। একজন গভর্নর থাকবেন, যিনি হবেন হেড অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেখানে মেম্বার অব পার্লামেন্ট গভর্নর হতে পারেন। সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার নন, এমন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে পারেন। সেখানে সরকারি কর্মচারী যাঁকে বিশ্বাস করি তিনিও হতে পারেন। আবার নাক উঁচু করা চলবে না। পার্টির মেম্বার হবার পরে দে উইল টেক রেসপনসিবিলিটিজ অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

এই তো গেল এক দিক; তবে, আমি কাজ বাড়িয়ে দিয়েছি আইনমন্ত্রীর। আমি অর্ডারগুলো করে দিয়েছি; কিন্তু তাঁর জান শেষ। মানে এইগুলো করতে তাঁর জান শেষ হয়ে যাবে। বুঝেছি, শুনে মুখ কালো করে ফেলেছেন। অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েছি, আইন তাঁর বদলাতে হবে। আইন-টাইন আমি বুঝি না। আমি বলেছি, কাজ করে যান, যা কিছু দরকার হয়। এই এডমিনিস্ট্রেশন, তারপর আমাদের সেক্রেটারিয়েট, সব ভাঙ্গতে হবে। এসব চলতে পারে না। আই এ্যাম গোয়িং ফর দ্যাট। টাকা নাই, পয়সা নাই, খাবার নাই, এটা নাই, ওটা নাই। সব ভাঙ্গতে হবে। ডাবল ট্রিপল, এ্যান্ড দ্যাট। এক এক নোট লিখে নিয়ে আসে। আমি বলেছি এস্টাবলিশমেন্টের সাহেবরা আছেন। এখান থেকে আরম্ভ করে সেকশন অফিসার, তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি তারপর আসে আমার কাছে। এইটুকু নোট, এটুকু ফাঁক তা সত্ত্বেও।

এসবের প্রয়োজন নাই, সোজাসুজি কাম চালান। কর্পোরেশন করেছি। অলরেডি দুটি কর্পোরেশন করে ফেলেছি। এভরি কর্পোরেশন ডাইরেক্টলি আন্ডার দি মিনিস্টার থাকবে। লেট দি মিনিস্টার গেট ওয়ার্ক ফ্রম জয়েন্ট সেক্রেটারি। ব্রিটিশ আমলে সেই ঘুণে ধরা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। ইট মাস্ট গো। সেই জন্য আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে। দ্যাট ইজ অলসো এ রেভল্যুশন।

আজকে এই যে নতুন এবং পুরানো যে সমস্ত সিস্টেমে আমাদের দেশ চলছে, এর জন্য আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছিলাম। আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখবো না, সে জন্য আমি সবই ভুল করলে আর সকলই খারাপ কাজ

করবে, তা হতে পারে না ; আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেস্তা নই, শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবোই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না, আমি যেটা করেছি, সেটাই ভালো, দ্যাট ক্যানট হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হই নি যে সব কিছু ভালো হবে। হতে পারে, ভালো হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে, অল রাইট, রেকটিফাই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভে আসতে চাচ্ছি। দিজ ইউনিয়ন কাউন্সিল ওলড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সাথে সাথে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে আমরা যে আজকে মাল্টিপারমোসা কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি, এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এজন্যে ডেডিকেটেড ওয়ার্কারের দরকার। এটা উইদাউট ডেডিকেটেড ওয়ার্কার হতে পারে না। সেই জন্য আজকে আমি চাচ্ছি, আর্মির মধ্যে হোক, নেভির মধ্যে হোক, এয়ারফোর্সের মধ্যে হোক, বিডিআর হোক, রক্ষীবাহিনী হোক, পুলিশ হোক, সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক, পলিটিসিয়ান হোক, যেখানেই হোক, ভালো লোক যেখানে আছে, তাঁদের এক জায়গায় করে কাজে লাগাতে হবে। যাও, ওখানে বসো, কাজ করে নিয়ে এসো। আমার তো দরকার নাই, খালি খালি বসে আর্মির অতো পয়সা খরচ করবার তো দরকার নাই। আই ওয়ান্ট মাই আর্মি এ পিপলস আর্মি। আই ডু নট ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ফাইট এগেইনস্ট এনিবডি। বাট আই ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ফাইট এগেইনস্ট এনিমি। বাট আই ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ডিপেন্ড মাইসেলফ এন্ড দ্যাট দি সেম টাইম টু ওয়ার্ক।

আর একটা ফ্যাশান আছে আমাদের, এই কাজটা তো ফুড ডিপার্টমেন্টের, এটা তো এগ্রিকালচারের, আমার তো নয়, এটা তো ইরিগেশনের, আমার তো নয়। ডিস্ট্রিক্ট সাবডিভিশনে সব জায়গাতে হয় কি?

একজন আপনার বড় অফিসার। আমরা যখন কোথাও যাবো, দেখবো যে, রাস্তায় একটা ইট পড়ে আছে, এটা আমার ডিপার্টমেন্টের না, একথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। হোয়াট ইজ দিস? দিস মেন্টালিটি মাস্ট বি চেঞ্জড। প্রত্যেকটি লোক, প্রত্যেকটি কাজই আমার, মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ, রাস্তা বানানোও আমার কাজ। আমি একটা হাই অফিসিয়াল, আমি একটা পলিটিসিয়ান, আমি একটা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, আমি একটা এম.পি. আমি দেশের একটা কর্মচারী, একজন পুলিশ অফিসার, আই হ্যাভ মাই রেসপনসিবিলিটি। এখানে চুরি হচ্ছে, এখানে অন্যায় হচ্ছে, এখানে খারাপ হচ্ছে, এটা বলার অধিকার আমার থাকবে। দেখার অধিকার থাকবে। সেই জন্য আজকে যদি পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন স্ট্রং না করা হয়–ভিলেজ লেভেল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যাকে ওয়াচ ডগ বলা হয়, তা যদি না থাকে, তাহলে দেশের মঙ্গল করা যায় না শুধু সরকারি কর্মচারীর ওপর নির্ভর করে। দেয়ার মাস্ট বি এ ব্যালেন্স, দেয়ার মাস্ট বি পিপলস্ মবিলাইজেশন। আমাদের হলো কান্ট্রিকে মবিলাইজ করতে হবে ফর ডেফিনিট পারপাস। দেখুন, বাংলাদেশের কৃষকও পিছিয়ে নাই। আমি সার দিতে পারি নাই। যা সার দিয়েছি তার থার্টি পারসেন্ট চুরি হয়ে গেছে। স্বীকার করেন? আমি স্বীকার করি। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। মিথ্যা বলে একদিনও হারাম এ দেশের প্রেসিডেন্ট থাকবো না। আমার যে সার আমি দিয়েছি, তার কমপক্ষে থার্টি পারসেন্ট ব্ল্যাক মার্কেটিং-এ চুরি হয়ে গেছে। আমি যে ফুড দিই, তার কুড়ি পারসেন্ট চুরি হয়ে যায়। আমি যে মাল পাঠাই গ্রামে গ্রামে, তার বিশ পারসেন্ট/পঁচিশ পারসেন্ট চুরি হয়ে যায়। সব চুরি হয়ে যায়। হুইট–আমি তো হুইট পয়দা করি না, খুব কমই করি, তবু কোন বাজারে হুইট পাওয়া যায় না? গভর্নমেন্ট গোডাইনের হুইট। সার তো আমি ওপেন মার্কেটে বিক্রি করি না, তবু কোন বাজারে সার পাওয়া যায় না? লেট আস ডিসকাস দিস ম্যাটার। দেয়ার শ্যাল বি এ ফ্রি ডিসকাশন।

আমাদের একটি জিনিস মনে রাখা দরকার। যে লোক হাসতে হাসতে জীবনের মায়া কাটিয়ে ফাঁসি পর্যন্ত যেতে পারে, যে জানে, গুলি হয়ে এক ঘণ্টা পর মারা যেতে পারে, সেই মানুষ ক্ষমতার জন্য মিথ্যা কথা বলবে না। এটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত। এইগুলো কি করে আপনারা করবেন?

এই এগ্রিকালচার আমার নয়, চুরি হয় হোক। এই ফুড আমার নয়, চুরি হচ্ছে হোক। এটা আমার নয়, চুরি হচ্ছে হোক–এসব চলতে পারে না। নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না। এবং সেই সাথে সিস্টেমই পরিবর্তন করতে হবে। ঘুণে ধরা সিস্টেম দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যায় না। এই সিস্টেমই হলো করাপশনের পয়দা। এই সিস্টেম করাপশন পয়দা করে এবং করাপশন চলে।

সেই জন্য আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেশনে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই। আমি স্বাধীনভাবে স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সাথে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি এডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের জেনে কাজ করি। চুপিচুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি। সবকিছু নিয়ে। সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি ৬০টা থেকে ৭৫ কি ১০০টা কো-অপারেটিভ করবো। এই কো-অপারেটিভ যদি দরকার হয়, সেন্ট্রাল কমিটির এক-একজন মেম্বার এক-একটা চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ার-সেলভস। ১১৫ জন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বর আছে। এর মধ্যে ১০০ কি ৭০ জনকে এক-একটা কো-অপারেটিভের চার্জ দিয়ে সব সুপারভাইজিং অফিসার করে। লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স ইউ আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মালটিপারপাস সোসাইটি, দেশের মানুষের একতাবদ্ধ করা যাবে।

বদমায়েশ একদল লোক–জমি সব শেখ সাহেব নিয়ে যাবে বলে তারা প্রপাগান্ডা করে। জমি নেবো না। তোমরা চেষ্টা করবে, একসাথে ফসল উৎপাদন করবে, তোমার শেয়ার তুমি নেবে। কিন্তু তবু এগেইনেস্ট প্রপাগান্ডা করে। জমি নেবো না, জমি থাকবে। কিন্তু জমির একটা লিমিট আছে তোমাদের রাখার। আইন হয়েছে ১০০ বিঘার বেশি রাখতে পারবে না। সেটা আমরা ফলো করবার চেষ্টা করব। এবং আস্তে আস্তে যদি ফ্লাড বন্ধ করতে পারি, সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, ফার্টিলাইজার দিতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করব, আরো কত দূর কি করতে পারি। কেন না, আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমি যেখানে তিন

বছর বন্যা হয় এক বছর ফসল হয়-- নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, চিটাগাং হিল ট্রাক্টের জমি, আর অন্য সব জমি এক পর্যায়ে দেখতে চাই তাহলে অসুবিধা হবে। আমার স্টাডির প্রয়োজন আছে, কোন জায়গায় কতো পরিমাণ ফসল হতে পারে।

আজকে কো-অপারেটিভ যদি আমরা করতে পারি, সেখানে যদি ফার্টিলাইজার দিতে পারি, রেশন কার্ড দিতে পারি, তাহলে চুরিটা কম হবে। সেখানে যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা দিতে পারি, চুরিটা কম হবে। একটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারি। চিৎকার করে, গালাগালি করে কাজ হবে না।

এই যে পলিটিক্যাল পার্টি–এটা খুব ইমপরট্যান্ট জিনিস। এর মেম্বারশিপ ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। মেম্বার বেছে নিতে হবে। গলায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে বলবে, আমি মেম্বার, আমাকে একটা পারমিট দাও, সেটা হবে না। মেম্বার যে হবে, তার একটা কার্য থাকবে। প্রাইমারি মেম্বার থাকবে অনেক। এছাড়া আমি আপনাদের বর্তমান মেম্বার করে দিয়েছি। আপনাদের জন্য কৃষক, লেবার অর্গানাইজেশন হচ্ছে। লেবার পলিসি করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় থাকবে না। এই আমার আছে, এই তোমার ডেভেলপমেন্ট, এই ইনকাম করতে পারলে এই তোমরা পাবে।

দিতে চাই আমি তোমাদের লাভের জন্য। ওদেরও দিতে হবে। তোমরা মানুষের মতো বাস করবে। তাদের দিতে হবে, যাতে কৃষক কৃষকের মতো বাস করতে পারে। ছাত্র লেখাপড়া করবে নতুন সিস্টেমে। আমরা একটা নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে বলেছি। কেরানি পয়দা করে লাভ হবে না। মানুষ পয়দা করতে হবে। নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে পারি কিনা, আমরা তা দেখছি। দেশে সার্বিক অবস্থা ইমপ্রুভ করতে সময় লাগবে। তিন বছর, সাড়ে তিন বছর একটা দেশের জীবনে কিছুই না। আমাদের ইকনমিক কন্ডিশন ভালো নয়। আমাদের মাল বিদেশ থেকে বেশি আনতে হয়। কমিট করতে গেলে ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাহেব আমার কলম ধরে বসেন। মহাবিপদ আমাকে নিয়ে। টাকা পাওয়া যাবে না।

দেশের ট্যাক্স, জাতীয় আয় বাড়াতে পারলে দেশের আয়ও বাড়ে। ইনশাআল্লাহ আমরা কতকগুলো স্টেপ নিয়েছি, ইকনমিক স্টেপ। তাতে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আমরা যে একটা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম গত বছর, ইনশাআল্লাহ অতখানি খারাপ অবস্থায় এ বছর নাই। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি এখন এখানে বেশি বেশি কিছু

বলতে চাই না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার এ মাসের ২৩ তারিখে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করবেন। তিনি সেদিন বলবেন। তবে, আমি এটুকু বলতে পারি আমাদের ইকনমিক কন্ডিশন ইজ নট সো ব্যাড এ্যান্ড ইট উইল ইমপ্রুভ ডে বাই ডে। কারণ, দেশের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, তারা কাজ করছে, ফ্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, কৃষক ভাইয়েরা সবাই কাজে অ্যাডভান্স করেছে, দেশের মানুষও এগিয়ে এসেছে। ইনশাআল্লাহ আই সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি।

তবে, এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি, সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের। কোনো জায়গা থেকে হায়ার করে এনে, ইমপোর্ট করে এনে কোনো 'ইজম' চলে না। এ দেশে–কোনো দেশে চলে না। আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে, আমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ, আমার দেশে অনেক অসুবিধা আছে। কারণ, আমার মাটি কি, আমার পানি কতো, আমার এখানে মানুষের কালচার কি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দি ওয়ার্লড। এটা আমার মত, পার্টির মত।

আমরা কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে চাই না। আমাদের একটা ফ্যাশান হয়ে গেছে যে, এ ওর বিরুদ্ধে গালাগালি করে, ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে গালাগালি করে। বাংলাদেশের মাটিতে যেন একটা হটবেড অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হয়ে গেছে। এ ওরে গালাগালি করে, ও এরে গালাগালি করে। আমার মাটিতে বসে গালাগালি দরকার কি বাবা। যার যার দেশে গিয়ে গালাগালি করো। এটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেকোরাম আছে। এক দেশে দাঁড়িয়ে অন্য দেশের বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না। আমার দেশে তোমার কি ভালো, সেটা বল।

আই বিলিভ ইন পজিটিভ এ্যাপ্রোচ নট এ নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমার পার্টিতে আপনারা যারা আছেন, আসুন, আমরা পজেটিভ এ্যাপ্রোচ নিই। আমি যখন খুব ইয়ং ছিলাম; আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেউ গালাগালি করলে আমি রাগ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি হেসে

বলতেন, থাক বলতে দাও। ওতে কি হবে? উনি আমাকে বলছেন, থিংক ফর এ পজিটিভ এ্যাপ্রোচ দ্যান এ নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ। আমার লাইফকে আমি ঐ দৃষ্টিতেই দেখেছি।

যখন আমি ৬ দফা দিলাম, আমার বিরুদ্ধে যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলো সকলে মিলে, আমি কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বললাম না। আমি চলে গেলাম দেশের মানুষের কাছে। গিয়ে ৬ দফার প্রচার আরম্ভ করে দিলাম। আমি যখন পার্টি রিভাইভ করলাম, আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হলো। কিন্তু আমরা চলে গেলাম পিপলের কাছে। পিপল আমাকে গ্রহণ করে নিলো। কাউকে গালাগালি করে লাভ নাই।

আমি বিশ্বাস করি, ক্যাম্বোডিয়া, আই শুড রিকগনাইজ ইট। আই ডোন্ট কেয়ার এনিবডি ইন দি ওয়ার্ল্ড হোয়েদার এনিবডি ইজ স্যাটিসফায়েড অর এনিবডি ইজ আনহ্যাপি অর এনিবডি ইজ হ্যাপি। আই ফিল দ্যাট দে আর ফাইটিং ফর দেয়ার ওন লিবার্টি। আই এ্যাম উইথ দেম। আই সাপোর্ট পিআরজি। আই গিভ দেম রিকগনিশন বিকজ আই এ্যাম এ সাফারার ফর জেনারেশন টু জেনারেশন ফর দিস বেঙ্গলি নেশন। যে যুদ্ধ করছে তার মাতৃভূমির জন্য, তাকে সমর্থন দেবো। তাই বলে আমি অন্যকে গালাগালি করব না। এই জিনিসটি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব।

আজকে আপনারা মনে রাখবেন যে, নতুন আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, পলিটিশিয়ান, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ারস যদ্দূর সম্ভবপর এঁদের রাখার চেষ্টা করেছি। পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেক এক্সপিরিয়েন্সড–আমার পুরোনো বন্ধুরা আছেন যাঁরা আগে আমাদের সাথে ছিলেন। কিছুদিন ডিফারেন্ট পার্টি করেছেন। আগে আমরা এক জায়গায়ই ছিলাম। মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম, এটা সব জায়গায় হয়। আবার আমরা এক হয়েছি। সেকেন্ড রেভল্যুশন ইজ নট দি এন্ড। সেকেন্ড রেভল্যুশন যে করেছি আমি, চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি, এটাই শেষ নয়। করাপশন ন্যাশনাল ইউনিট এ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এগুলো করলেই আমরা একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারবো–যেখানে মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবে। এটাই হলো আমার সেকেন্ড লেভল্যুশনের মূল কথা, এজন্যই আমি সেকেন্ড লেভল্যুশনের ডাক দিয়েছি।

আজি আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আমার বহু সহকর্মী– যাঁদের সাথে আমি দুর্দিনে কাজ করেছি, বিপদের দিনে কাজ করেছি, '৪৭, '৪৮, '৪৯

সালে, তাঁরা আজকে এখানে এসেছেন। মাঝখানে এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে গিয়েছিলাম অনেকে। ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন-এর জন্য। আজকে আমরা আবার এক হয়েছি, সরকারি কর্মচারীরা এক হয়েছি। আজকে সকলে মিলে যার যা কর্তব্য আছে করুন। সেই সাথে করাপশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সারা বাংলাদেশের টুয়েনটি থেকে থার্টি পার্সেন্ট দুঃখ দূর হয়ে যাবে মানুষের। এজন্য লেট আস টেক ওথ টুডে। যে নিজেরা আমরা করাপ্ট প্র্যাকটিস করি, তাই আবার অন্য কেউ করলে আমরা সহ্য করি না। উই মাস্ট মবিলাইজ দি পিপল এগেইনস্ট করাপশন। এটা যদি করতে পারি, দেখবেন, অনেক প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারব। এ জন্যই আজকে আমাদের মবিলাইজ করতে হবে পিপলকে। আমাদের সোশ্যালি বয়কট করতে হবে– যে লোকটা ঘুষ খায়, তাকে। সোশ্যালি বয়কট করতে হবে যে লোকটার মাইনে হাজার টাকা, কিন্তু ব্যয় করে পাঁচ হাজার টাকা, তাকে। যে লোকটার ইনকাম তিন হাজার টাকা, কেমন করে সে ব্যয় করে ১৫ হাজার টাকা? এই জিনিসটা সমাজের কাছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এবং তাহলেই সমাজ তথা পিপলের আপনাদের ওপর আস্থা ফিরে আসবে।

আমি মাঝে মাঝে আল্লার কাছে বলি যে, গেছি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে গেছি সেখানে (বেতবুনিয়া), সে গ্রামের মধ্যে লাখ লাখ লোক দুই পাশে বসে আছেন, ওঁরা এসেছেন আমাকে দেখার জন্য– মনে মনে আমি বলি যে আমি কি করেছি ওঁদের জন্য? আমার দুঃখ হয় স্টিল দে লাভ মি। দুনিয়ার নিয়মই এই। ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয়। এবং সে ভালোবাসা সিনসিয়ারলি হওয়া দরকার তার মধ্যে যেন কোনো খুঁত না থাকে। ইফ ইউ ক্যান লাভ সামবডি সিনসিয়ারলি, ইউ উইল গেট দি লাভ অব সামবডি। দেয়ার ইজ নো ডাউট এবাউট ইট। আমার জীবনে আমি দেখেছি, লাখ লাখ লোক দু'পাশ দিয়ে কি অবস্থার মধ্যে আমি তো কল্পনাও করতে পারি না হোয়াই দে লাভ মি সো মাচ? আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, মবিলাইজ দি পিপল এ্যান্ড ডু গুড টু দি হিউম্যান বিইংস অব বাংলাদেশ। দিজ আনফরচুনেট পিপল হ্যাভ সাফার্ড লং-জেনারেশন আফটার জেনারেশন। এদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, এদের খাবার দিতে হবে।

যদি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি, যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ, বাংলার মাটিতে যা এখনো

আছে, তাতে ৭ কোটি লোক হলেও বাংলার মানুষ না খেয়ে মরতে পারে না। আই হ্যাভ সিন দ্যাট।

আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কারণ, আই হ্যাভ বিকাম ইমোশনাল। আগস্ট মাসে আমি আপনাদের সভা ডাকছে উইথ ডেফিনিট এজেন্ডা। ফুড, এগ্রিকালচার, ইনডাস্ট্রি, এডুকেশন, কো-অপারেটিভ সমস্ত প্রোগ্রাম দিয়া তারপর আমি আপনাদের এই হাউসটাকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দিচ্ছি। আপনারা ডিভাইড হয়ে যাবেন। সব কিছু ডিভাইড হয়ে গেলে তখন এই কমিটিতে বা গ্রুপে সেক্রেটারিয়েট থেকে লোক আসবে, গভর্নমেন্ট থেকে লোক আসবে, ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে, পলিটিক্যাল ওয়ার্কার আসবে, সমস্ত ফ্যাক্টস্-ফিগার নিয়ে। এই জায়গাতে কোথায় ডিফেক্ট হয়েছে, কোন জায়গাতে ইমপ্রুভ করতে পারি, সে সম্পর্কে আপনারা একটা সাজেশন দেবেন। তখন কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে সুপারিশ পেশ করবে এবং ঐ কমিটি সরকারকে এটা কার্যকরী করতে অনুরোধ করবে।

আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। বেয়াদবি মাফ করবেন। লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার, উই আর নাউ ওয়ান পার্টি। পার্টি মানে কি, জানেন? এভরি পার্টি ওয়ার্কার অব মাইন ইজ লাইক মাই ব্রাদার, ইজ লাইক মাই সন। আই ক্রিয়েটেড এ ফ্যামিলি হোয়েন আই অরগ্যানাইজড্ আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে আমি যাই নি। আর পলিটিক্যাল পার্টি মিন্স এ ফ্যামিলি, যার মধ্যে আছে আইডিওলজ্যিাল এফিনিটি। সেজন্য পার্টিতে উই আর ওয়ান ফর সাম পার্টিকুলার পারপাসেস, হোয়্যারেভার উই আর। আমাদের আদর্শ হলো বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট। আসুন, আমরা চেষ্টা করি সে সম্পর্কে সকলে মিলে।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

আপনারা কিন্তু সবাই এক

১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ প্রদান করেন। তা উদ্ধৃত হলো।

কি উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন, সকলেই জানেন। তবু আমি দুই একটা কথা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। কারণ, আপনারা যাঁরা নবনিযুক্ত গভর্নর, তাঁদের প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ প্রশিক্ষণ হবে এবং নানা বিষয় তাঁদের শিখতে হবে, জানতে হবে।

যাঁরা বহুদিন যাবৎ আমার সহকর্মী, তাঁরা জানেন, স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে বারবার আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছেন যে, প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দরকার। যে কোনো কারণেই হোক, ইংরেজ যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, সেটা শাসন বা শোষণ করবার জন্যই কায়েম করেছিল। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেলাম, আমাদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। বহুদিন পর্যন্ত পুরোনো আমলের মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি। যে ট্রেনিং আমরা আগে পেয়েছি, সেটা পুরোনো ঘুণে ধরা সিস্টেম ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা আজ জনগণের শাসক নন। আজ আমরা স্বাধীনতা এনেছি। আজকে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম সরকার পরিচালনা করছি। আমরা এ দেশের শাসক নই, আমরা এ দেশের সেবক–একথা মনে রাখতে হবে। জনগণের সেবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি এবং তাঁদের সেবাতেই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আপনারা যাঁরা বহুদিন যাবৎ এ দেশের শাসনের সাথে বা প্রশাসনের সাথে জড়িত আছেন, তাঁরা দেখেছেন– অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, কাজের মাধ্যমে দেখেছেন যে, জনগণ থেকে আমাদের শাসন কাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত যোগাযোগ তাদের সাথে ততটা নাই। যারাই আমরা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়েছি, তারাই মুরুব্বিয়ানা দেখিয়েছি। আমরাই

হলাম মালিক, তোমরা আমাদের গোলাম। তোমরা এসো, আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকো, আমাদের হুকুম নাও, আমাদের হুকুম মতো চলো, আমাদের হুকুম মতো কাজ করো, এই ছিল মনোভাব। কোনো স্বাধীন দেশে এই মনোভাব চলতে পারে না। তাতে দেশের মঙ্গল হয় না, তাতে দেশের অমঙ্গল টেনে আনা হয়। এটা বিস্তারিত আলোচনা না করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন। বক্তৃতা করে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা বহুদিন যাবৎ এই প্রশাসনযন্ত্রের সাথে জড়িত আছেন এবং বহুদিন যাবৎ রাজনীতি করছেন। সেজন্য আমি আপনাদের বোঝাতেও চাইও না। কিন্তু একথা সত্যি, এই চিন্তাধারা আমার ও আমার সহকর্মীদের মনে ছিল যে, এর আমূল পরিবর্তন দরকার।

দুনিয়ার অনেক দেশে দেখেছি, কোথাও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার, তাদের এক রকম চলে। কোথাও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, তাদের একরকম চলে। কোথাও বা আছে মিক্সড পদ্ধতির সরকার, তাদের অন্য রকম চলে। কিন্তু আমার বাংলাদেশের যে সমস্যা এবং বাংলাদেশের যে অবস্থা, তাতে সম্পূর্ণরূপে ভাড়া করে কোনোটা চালানো আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি থাকতে হবে। কারণ, আমাদের মানুষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাদের সাথে মিশতে হবে, তাদের মনোভাব জানতে হবে। তাদের ইতিহাস এবং অন্য যা কিছু আছে সংস্কার ইত্যাদি অনেক কিছুই এ দেশের মানুষের আছে, সেসব বিবেচনা করে একটা পন্থা অবলম্বন করা দরকার। যার উদ্দেশ্য হলো এ দেশের মানুষের মঙ্গল করা, এ দেশের উপর থেকে অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম উৎখাত করা। যাতে সহজ ও সরলভাবে মানুষের মধ্যে সোজাসুজি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পৌঁছে দেয়া যায়।

আজকে যে সিস্টেমটা করা হয়েছে, সেটা নতুন। পার্লামেন্টের মেম্বাররা বা সংসদ সদস্যরা লোকালি শাসন পরিচালনা করেন, এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নাই। এই পদ্ধতিতে এ্যাপয়েন্টেড গভর্নর, এ্যাপয়েন্টেড ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এমনি অনেক কিছুই আমরা এখানে দিয়েছি যা অন্য কোথাও নাই। এটা একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। এখন দেখা দরকার, এর উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জনগণের কতটা মঙ্গল করতে পারব। এবং যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছি, এর মাধ্যমে তার বাস্তবায়নে কতটা কৃতকার্য হবো।

আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সেটা পরিষ্কার করে বলা যাক। আজ ৬১টি জেলা করা হলো। এর কারণ আছে। বাংলাদেশের কমিউনিকেশন সিস্টেম অত্যন্ত খারাপ। বোধ হয় দুনিয়ার আর কোথাও এতো খারাপ সিস্টেম নাই। একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ৩৫ লাখ, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ, ৬০ লাখ লোকের উপর বসে থেকে সুচারুরূপে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। চেষ্টা করলেও তা হয় না। দুনিয়ার অনেক দেশের লোকসংখ্যা ১ লাখ থেকে ১০ লাখ, ২০ লাখ বা ২৫ লাখ। আমাদের এমন নতুন ডিস্ট্রিক্টও আছে, যার লোকসংখ্যা তাদের থেকে বেশি। ময়মনসিংহ সদর নামে যে ডিস্ট্রিক্ট করেছি, তার লোকসংখ্যা ৩০ লাখের কম নয়। কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, নেত্রকোণা, চাঁদপুর এবং এমনি আরো অনেক জেলায় ১৫ লাখ, ২০ লাখ, ২৫ লাখ পর্যন্ত লোকসংখ্যা রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের তেমন সুযোগ কোথায় যে, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ, ৬০ লাখ লোকের একটা প্রশাসন একটা জেলায় বসে সুপারভাইস করবেন? কেমন করে দেখবেন, কোন ইউনিয়নের মধ্যে কি হচ্ছে? কিসের মধ্যে কি হচ্ছে?

আরো কটি ডিফিকালটি আছে। অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের সরকারি কর্মচারীদের যখন বদলি করে দেয়া হয়, তখন তাঁরা ডিস্ট্রিক্ট যান ও থাকেন। তারপর আবার যখন দরকার পড়ে, তাঁরা চলে আসেন। তাঁদের পছন্দ হোক না বা হোক। ভালো কাজ করলে সুনাম নিয়ে চলে আসেন আর খারাপ কাজ করলেও সোজা চলে আসেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাঁদের আর সেখানে যাবার প্রয়োজন নাই। সেজন্য আজ একটা বিরাট কিছু চিন্তা করতে হবে। স্থানীয় এম.পি. সাহেবদের, রাজনীতিবিদদের আমি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় গভর্নর হিসেবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। তাঁদের বিশ্বাস করে অনেক বেশি দায়িত্ব দিয়েছি। কারণ, আমরা বুঝি, লোকালি নিজেদের মধ্যে দলাদলি থাকে, একজন একজনকে পছন্দ করেন, একজন আর একজনকে পছন্দ করেন না। এছাড়া নিজের পার্টি আগে ছিল। অন্য দলও। নানারকম জিনিস আছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থাকে, কুটুম্বসাক্ষাৎ থাকে। বড় ভীষণ ব্যাপার। যদি আপনারা এ সমস্ত জিনিসের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারেন, তাহলে যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার কি অবস্থা হবে, তা বলতে, তা ভাবতে আমার ভয় হয়। আপনাদের স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

গভর্নরশিপের যে ক্ষমতা আমরা আইনে দিয়েছি, তা কম নয়। আমরা সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে জেলার কানেকশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সাথে থানার, থানার সাথে ইউনিয়নের কানেশন রাখতে হবে। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন। যে ক্ষমতা আইনে গভর্নরদের দেয়া হয়েছে, তা আগে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ভোগ করেন নাই। তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আপনাদের দেয়া হয়েছে। আপনাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার সাথে সাথে কাউন্সিল করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পার্টি থাকবে। পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন, আপনার চেয়ে তাঁর ক্ষমতা কোনো অংশে কম থাকবে না। এক দিকে আপনি যেমন রেসপনসিবল ফর দ্যা এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তেমনি পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন তিনি রেসপনসিবল সমস্ত পার্টির জন্য। যখন গভর্নর সাহেব কাউন্সিল মিটিং কল করবেন, তখন নিশ্চয়ই সেক্রেটারি সেখানে উপস্থিত হবেন। আবার, যখন সেক্রেটারি সাহেব পার্টি মিটিং কল করবেন, তখন গভর্নর সাহেব তাঁর সামনে গিয়ে বসবেন। এটা ভুললে চলবে না।

কিন্তু যে কথা আমি আগে বলেছিলাম। আপনাদের মহাবিপদ। বিশেষ করে, পার্লামেন্টের যেসব মেম্বার বা যে সমস্ত লোকাল লিডার গভর্নর হয়েছেন, তাঁদের রেসপনসিবিলিটি কতখানি, তা আপনারা ভেবে দেখবেন। আমি আমার বিবেকমতো সকলের সাথে পরামর্শ করি। যাদের গভর্নর করেছি, যাঁরা আমার সাথে বহুদিন রাজনীতি করেছেন, তাঁদের আমি চিনি এবং তাঁদের উপর বিশ্বাস আর আস্থা আছে বলেই আমি তাঁদের গভর্নর করেছি। কিন্তু বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাদেরও রাখার কর্তব্য রয়েছে। আমার বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাদের উপর রেখেছি। সেই জন্য আপনাদের গভর্নর করেছি। যাঁরা পার্লামেন্টারি মেম্বার, আপনাদের গভর্নর করেছি। যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার, তাঁদের কাজ হলো, তাঁরা এ্যাসেমব্লিতে আইন পাস করে বাড়ি যাবেন, দেখবেন, শুনবেন। কিন্তু এখানে আপনাদের রেসপনসিবিলিটি দিয়েছি। কারণ, দেখা যায়, বাংলার জনগণ পার্লামেন্টের মেম্বারদের এই আশায় ভোট দেয় যে, তাঁরা সব কাজ করে দেবেন। কিন্তু আইন পাস ছাড়া তাঁদের রেসপনসিবিলিটি এমন কিছু নাই। কিন্তু লায়াবিলিটি তাঁদের বেশি। তাঁদের গালাগালি খেতে হয়। কিন্তু শাসন তাঁরা চালাতে পারেন না। সেই জন্য আমি নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি। আপনারা রেসপনসিবিলিটি নিন, আইন পাস করুন। মাঠে-ময়দানে কাজ করলে আপনারা সবই বুঝতে পারবেন।

এখানে একটি কথা বলব। আপনাদের কেউ কেউ এমন জেলায় গভর্নর হয়েছেন, যেখানে আপনাদের নিজেদের বাড়িঘর, নিজেদের আত্মীয়স্বজন, নিজেদের পার্টি রয়েছে। তাঁরা সাবধান। তাঁদের স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করবার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। তাঁদের একটা রিস্ক আছে। আপনাদের যাঁরা পার্লামেন্ট মেম্বার, সবচেয়ে বড় রিস্ক তাঁদের। সেটা কি, জানেন? যদি আপনারা কৃতকার্য না হতে পারেন, যদি মানুষ আপনাদের ভালো না বাসে, আপনারা মানুষকে যদি খুশি করতে না পারেন, তাহলে অসুবিধায় পড়বেন। পার্লামেন্টের মেম্বাররা আগে ছাড়া পেতে পারতেন। কোনো রকমে লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু এবার সুদ-আসলে দুটোই যাবার সম্ভাবনা আছে। গভর্নর সাহেবদের ভয় থাকা দরকার।

আপনাদের চার্জ দেয়া হয়েছে। আপনাদের এবার কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করুন। ল এন্ড অর্ডার আপনাদের দেখতে হবে। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আপনাদের দেখতে হবে। জিনিসপত্র বিদেশ থেকে যা আসে, তার ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, দেখতে হবে। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আপনাদের দেখতে হবে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং আপনাদের দেখতে হবে। পাবলিসিটি আপনাদের দেখতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। খাল কাটা হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। ঘুষ খাওয়া বন্ধ হয়েছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। থানার মধ্যে করাপশন আছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। আপনাদের সাথে থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট, আপনাদের সাথে থাকবেন এস.পি.। আপনাদের সাথে থাকবেন জয়েন্ট এস.পি. (ক্রাইম)। আপনাদের সাথে থাকবেন সমস্ত অফিসার, আপনাদের সাথে থাকবেন রাজনৈতিক কর্মীরা। আপনাদের একটি কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলকে আপনাদের কনফিডেন্সে নিতে হবে। কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে নিজে সব সময় ডিক্টেটরশীপ করতে যাবেন না। কাউন্সিল ডেকে তাঁদের সাথে আলোচনা করে কাজ করতে হবে।

কিন্তু আজকে মেম্বার সাহেবের একটি বড় ভয়ের ব্যাপার আছে। বাংলাদেশের জনগণ সাংঘাতিক রি-এ্যাক্ট করে–এটা মনে রাখবেন। সারা জীবন সাধনা করবেন, তারপর একটা অন্যায় করবেন, তার ফলেই মুছে যাবেন বাংলাদেশ থেকে। এইটেই বাংলাদেশের নিয়ম। সারা জীবন সাধনা

বেন, তারপর একটা অন্যায় করবেন, তারপর একটা অন্যায় করলে লাদেশের মানুষ আপনাদের মুছে দেবে। আপনারা যাঁরা যেখানে লোকাল বেন, সেখানে পার্মানেন্টলি থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, ডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হবে। দেখতে হবে, যে নতুন জিনিস আমরা করতে চ্ছি, তাতে আমরা সাকসেসফুল হতে পারি কি না। বাংলাদেশ একটি ছোট শ। এ ব্রিজ বিটুইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট এন্ড সাউথইস্ট এশিয়া। অন্যান্য দেশ ত বড়ই হোক না কেন, ভবিষ্যতে তারা আমাদের ফলো করবে, যদি আমাদের সিস্টেম সাকসেসফুল হয়। এটা মনে রাখা দরকার। আর তা যদি না হয়, ইতিহাস থেকে আপনারা মুছে যাবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য কি? কেন আপনারা রিস্ক নিয়েছিলেন? কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন? যাঁদের আজ আমি গভর্নর করেছি, তাঁরা আমার সাথে একত্রে কাজ করেছেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার যে ২৫/২৬ বৎসর আমার সাথে কাজ করেছেন। আপনারা বিট্রে করেন নি, বেঈমানি করেন নি। আপনারা আমাকে ছেড়ে সরকারি দলে যোগদান করেন নি। আপনারা যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। তারা আপনাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনারা সংসার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আপনারা সব কিছু করেছেন। কেন করেছিলেন? নিজের জন্য? তা নয়। এ দেশের গরিব-দুঃখীদের জন্য। যাতে একটা শোষণমুক্ত সমাজ করতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে পারেন। যাতে বাংলার মানুষ সুখী হয়, বাংলার মানুষ অত্যাচার-অবিচার থেকে বাঁচতে পারে।

চারটে যদি মডেল করি, ডিস্ট্রিক্টে যদি আমরা সাকসেসফুল হই, সেখানে যদি মানুষের উপর অত্যাচার না হয়, অবিচার না হয়, ঘুষ-দুর্নীতি যদি বন্ধ করতে পারেন, রাস্তাঘাট যদি করতে পারেন, জনগণকে যদি মবিলাইজ করতে পারেন, তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। শুধু সরকারি অর্থে জনগণের মঙ্গল হয় না, উন্নতির কাজ হয় না। জনগণকে একতাবদ্ধ করতে হবে। আপনাদের জনগণকে মবিলাইজ করতে হবে। সেজন্য জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। সেই অনুপ্রেরণা সৃষ্টির দায়িত্ব থাকবে পার্টির এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের, গভর্নরের, জয়েন্টলি। সরকার যদি দেন ৫০ হাজার টাকা, আপনারা কাজ করাবেন ৫ লাখ টাকার। বাংলার মানুষকে কোনো কাজ করতে বললে তারা 'না' বলে না। বাংলার মানুষ যদি বোঝে

যে, এই কাজে তাদের উন্নতি হয়, তবে তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেজন্য আপনাদের–যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার গভর্নর হয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার আগে ছিলেন, এখন নাই, তাঁরা আমার সাথে কাজ করেছেন। তাঁদের এবিলিটি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। পার্লামেন্ট মেম্বার যাঁরা গভর্নর হয়েছেন, তাঁরা যদি মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা না পান, আপনাদের পরিষ্কার কথায় বলতে চাই যে, তাঁরা যদি পপুলারিটি হারিয়ে ফেলেন তাহলে অসুবিধায় পড়বেন। আমার কিন্তু সাফ সাফ কথা। আমার কে কি করল না করল আমি কিছু শুনবো-টুনবো না। আপনার জায়গায় মানুষ আপনাকে ভালোবাসে কিনা, আমি সেটা দেখব। যদি আপনার বিরুদ্ধে সেখানে গণবিক্ষোভ হয়, বাংলার জনগণ যদি দেখে যে আপনি ভালো কাজ করেছেন না, যদি আপনার সম্বন্ধে নেপোটিজম, করাপশনের অভিযোগ দেখা যায়, আমি কিছু শুনবো-টুনবো না। আপনাদের তো ধারণা আছে যে, আমি কোনো কিছুতেই হাত দিলে কিন্তু হাত উঠাই না। ওটা আমার নিয়ম নয়। হাত দেয়ার আগে আমি বহুবার চিন্তা করি। কিন্তু একবার যদি হাত দিয়ে বসি–মাথা চলে যেতে পারে কিন্তু সে হাত আমার কমই ওঠে।

আমি আপনাদের যে নতুন সিস্টেম দিয়েছি, এর মধ্যে শুধু আপনারা বেঁচে থাকবেন না, আমিও বেঁচে থাকব। বাংলাদেশ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে। অনেক অনুন্নত দেশ আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে,– এখানে কি ব্যাপার হয়েছে। অত্যাচার-অবিচার আপনাদের এরিয়ার মধ্যে যাতে না হয়, তার জন্য আপনারা সেখানে ড্রাসটিক্যালি শাসন চালাবেন। ভালো করে কাজ চালাবেন। আমি আছি, সরকার আছেন, মিনিস্টার সাহেবরা আছেন, সবাই আছেন আপনাদের সাহায্যের জন্য। যদি দরকার হয়, তাঁদের ডাকবেন। তাঁরা বসবেন। বলবেন আপনাদের সাহায্য করবেন। যদি দরকার হয়, আমার কাছে চলে আসবেন। গণভবনে সোজাসুজি টেলিফোন থাকবে। আমার অফিস থাকবে একটা। আপনারা যদি দেখেন যে, কোনো জায়গায় কোনো ডিপার্টমেন্ট আপনাদের সাথে কো-অপারেট করছে না, সোজাসুজি টেলিফোন করবেন। সেল থাকবে, অফিসার বসে থাকবেন,– সিনিয়র অফিসার। খবর দিলে দেখবেন যে, সাথে সাথে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা আমি আপনাদের জন্য করেছি।

আর একটা কথা। পার্টির সদস্য ছাড়া অন্য কেউ গভর্নর হতে পারেন না এবং এখন পর্যন্ত খুব কম মানুষই পার্টির সদস্য পদ পেয়েছে। যাঁদের আমি আজকে গভর্নর করেছি, তাঁদের পার্টির মেম্বারশিপ দিয়ে এখানে আসতে বসতে দেয়া হয়েছে। তা না হলে তারা এখানে বসতে পারেন না। যেসব সরকারি কর্মচারী ভাইদের গভর্নর করেছি, তাঁদের বেলায়ও এমনি করতে হয়েছে। পার্টির সদস্য পদ দেয়া হয়েছে সেই সব সরকারি কর্মচারীদের যাঁরা আমার চোখে ভালো। তাঁরা সিনিয়র হন বা জুনিয়র হন, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁদের আমি গভর্নর করেছি। পূর্ণ রেসপনসিবিলিটি তাঁরা নিচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, সরকারি কর্মচারীদের মধ্য থেকে যাঁরা গভর্নর হয়েছেন, তাঁরা প্রিসাইডও করবেন। পার্লামেন্টের মেম্বারও সেখানে বসবেন। তাহলে এই গভর্নরদের পজিশন কোথায় উঠে গেল, সে কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। দ্বিতীয়ত, যেখানে পার্টি কল করবে সেখানে গভর্নরকে যেতে হবে, সেখানে বসতে হবে, আলোচনা করতে হবে। আপনারা এখন থেকে আর সরকারি কর্মচারী নন, পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্কার–রিমেম্বার ইট–বাকশালের সদস্য। যেমন আমাদের পার্লামেন্টের মেম্বাররা বাকশালের সদস্য, তেমনি সরকারি কর্মচারীরাও বাকশালের সদস্য। এবং সদস্য হিসেবে তাঁদের সেই পজিশনে সেখানে যেতে হবে এবং সেখানে কাজ করতে হবে। পার্লামেন্টের মেম্বার থাকবেন ঐ কাউন্সিলের সদস্য। আর্মি থেকেও একজনকে দিয়েছি। তাঁকেও মেম্বারশিপ দিয়ে খুলনায় গভর্নর করেছি।

এই রকম করে আমি সব জায়গা থেকে লোক এনে দেখতে চাই। এটা মনোপলি নয় আর যিনিই ফেল করবেন, চলে যাবেন। রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে বসিয়ে দেবো। যিনি ভালো কাজ করবেন, তিনিই প্রশাসন চালাবেন। আর কোনো কথা নাই। তবে, এটা একটা নতুন সিস্টেম। আর নতুন সিস্টেমে বাধা আছে। নতুন সিস্টেমের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। নতুন কিছু করতে গেলে একটা আশঙ্কা আসে। মানুষের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু গত বিশ-পঁচিশ বছর আমি দেখেছি, ইংরেজ আমলের সিস্টেম এ দেশে চলতে পারে না।

আজ আমি কেবল গোড়ায় হাত দিয়েছি। এখন ডিস্ট্রিক্ট করেছি। এক বছরের মধ্যে আমি থানায় যাচ্ছি। থানায় আমি এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করছি। থানায় যিনি হেড হবেন, তাঁর নাম হবে থানা প্রশাসক। তিনি এমপি

হতে পারেন, গভর্নমেন্ট অফিসার হতে পারেন, বাইরের মানুষ হতে পারেন। সেখানেও হাই অফিসিয়াল থাকবেন। এইভাবে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে।

এমনি করে লোকাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, কালেকশন, সব কাজই চলবে, ভবিষ্যতে আরো অনেক কাজই করতে হতে পারে। এই যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টগুলো হয়েছে– যখন আমরা সেগুলোর অবস্থা জানতে পারব, তখন প্রোকিয়োরমেন্টের অবস্থা জানতে পারব, ডিস্ট্রিবিউশনের অবস্থাও জানতে পারব। তখন সেখানকার ফুল রেসপনসিবিলিটি তাঁদের নিতে হবে। ভবিষ্যতে সবকিছুর দায়িত্ব নিতে হবে।

এ দায়িত্ব গভর্নর সাহেবদের এবং আপনাদের কাউন্সিলের। যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হয়, সমস্ত দায়িত্ব হবে আপনাদের। যদি ফুড সিচুয়েশন খারাপ হয়, পুরো দায়িত্ব আপনাদের। যদি সেখানে দুর্নীতি হয়, তা দমনের কর্তব্য আপনাদের। যদি সেখানে টেস্ট রিলিফের টাকা চুরি হয়, তাহলে তা বন্ধ করবার ভারও আপনাদের। যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা চুরি হয়, তবে জনসাধারণের কাছে আপনাদেরই জবাব দিতে হবে। দেখুন কোথায় আছি আমরা! ফারটিলাইজার বাজারে বিক্রি হয় না? ফারটিলাইজার আমার সরকার থেকে দিই কিন্তু কোন বাজারে ফারটিলাইজার পাওয়া যায় না? আমাকে বুঝিয়ে বলুন, কোথা থেকে বাজারে যায়? গভর্নমেন্ট গোডাউন থেকে যায়। আমরা গম আনি, গম বাজারে বিক্রি হয়। আমি ওয়ার্কস প্রোগ্রামে গম দিই, ফুড ফর ওয়ার্কে দিই। এজন্য গমের ব্যাপারে আমরা কিছুটা জাস্টিফাই করতে পারি। কিন্তু ফারটিলাইজারের ব্যাপারে জাস্টিফাই করি কি করে?

আজকে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যে টাকা যাবে, প্রত্যেক গভর্নরকেই একটা রুমে তার চার্ট টাঙিয়ে রাখতে হবে বড় করে। পাবলিক যাতে দেখতে পারে। আমার টেস্ট রিলিফের টাকা আসছে, এই প্রোজেক্টে এইখানে খরচ হচ্ছে। এই ওয়ার্কস প্রোগ্রামে আসছে এখানে খরচ হচ্ছে। এই ফারটিলাইজার আসছে, এই জায়গায় গেল, অমুক ইউনিয়নে গেল। সব কিছুরই চার্ট টাঙিয়ে দিতে হবে। ডিস্ট্রিক্টের লোকদের জানাতে হবে। সরকারের জিনিসপত্র কোন দিক দিয়ে আসে, কোন দিক দিয়ে যায়, কেউ জানে না। কত ফুড গেল ডিস্ট্রিক্টে, তা জানতে হবে। কোন থানায় কত গিয়েছে; কোন ইউনিয়নে কত গিয়েছে, তাও জানতে হবে।

এখন সমস্ত জাতিকে মবিলাইজ করতে হবে। তা না করতে পারলে কোনো কাজ হবে না। আজ দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। আপনাদের যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং আছে, সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। বক্তৃতা করলে চলবে না। এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হবে। বুঝেছেন! শিখতে হবে। শুধু অর্ডার দিলে হবে না। শুধু এটা করো, ওটা করো, এমন করলে হবে না।

দেশে আইনকানুন আছে। আইনকানুনের মধ্যে আপনারা বেআইনী কোনো কাজ করবেন না। দেশের আইনের মধ্যে থাকতে হবে, তার মধ্যে অর্ডার করতে হবে। এই আইনগুলো পার্লামেন্টের শুধু একথা বললে হবে না। আপনাদের দেখে নিতে হবে, এই আইন এবং এই আপনাদের অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ ক্ষমতা। আপনাদের সাথে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁদের এক্সপিরিয়েনস আছে। তারা এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করছেন। তারা ঐ সমস্ত আইনকানুন খুটিনাটি জানেন।

আর, মনে রাখবেন, মিনিস্টার সাহেবরা আছেন, তারা অর্ডার করেন। কিন্তু অর্ডার ইস্যু হয় সেক্রেটারির নামে, সেকশন অফিসারের নামে। এসব ভুলে গেলে চলবে না। আমরা অর্ডার করি, ডু দিস। সেটা ঐ জায়গায় ফাইলেই থাকে। ঐখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, সেকশন অফিসার থেকে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে ইস্যু হয়ে যায়। তেমনি করেই আপনারও বলবেন। আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যারা সেক্রেটারি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তাদের নাম ইস্যু হবে। আপনাদের অর্ডার আপনাদের ফাইলেই থাকবে। এই নিয়ম আছে।

আপনাদের কতকগুলো প্রটোকল মানতে হবে। সব কিছু আপনাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। বিদেশী লোক গেলে আপনারা কি করে প্রটোকল করবেন? আপনাদের ফরেন পলিসি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার; আপনাদের রাষ্ট্রের কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধেও ধারণা থাকা দরকার।

আর, বিচার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি বদলে ফেলা দরকার। বিচারের নামে অবিচার আর চলে না। এবার নতুন একটা কাঠামো করুন। সোজাসুজি বিচার হয়ে যাক। যাওয়ার সময় একজন জামাইয়ের কাছে ব্রিফ করে দিয়ে যান, তার মরবার আগে পর্যন্ত মামলা চলতে থাকে। সাহেবরা এবার থানায় যান। থানায় গিয়ে ওকালতি করুন। আমার আপত্তি নাই,– সব থানায় নিয়ে

যান। থানায় মানুষ অতি সহজে নৌকা ভাড়া করে পায়ে হেঁটে এসে বিচার পাবে। ডিস্ট্রিক্টে এসে, মানে সদরে এসে, বাংলার দুঃখী মানুষ কোনো দিন বিচার পায় নাই। দেখুন গিয়ে, লোকে জেলের মধ্যে ফিফটি ফোর-এর আসামী হয়ে ছয় মাস, এক বছর পড়ে থাকে, কিন্তু তার পনের দিন জেল হয়। জীবনভর আমি জেল খেটেছি, কয়েদিদের সাথে জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি তাদের কি দুঃখ, কি কষ্ট। বিচার হোক, জেল খাটুক। কিন্তু বিচার হয় না, হাজতে থাকে। ফিফটি ফোর-এর এক বছর দুবছর হাজত খেটে এক মাস জেল হয়। আর, এই যে এক বছর এগার মাস গেল, তার ক্ষতিপূরণটা কে দেয়? আবার অনেক সময় খালাসও হয়ে যায়। আমি এগুলোকে থানা লেভেলে নিয়ে যেতে চাই। পয়সাকড়ির আমাদের অভাব আছে, বুঝি। এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পয়সা কিছু কম খরচ করতে হবে।

এখন, অনেকে আমাকে বলেন, আমাদের অফিস কোথায় হবে। গভর্নর সাহেবরা আপনাদের নিজের নিজের এরিয়ার মধ্যে বাড়ি আছে। যারা সরকারি কর্মচারী আছেন, তাদের একটু হেল্প করব আর আপনাদের বাড়িঘর ওখান থেকে যোগাড় করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা দেবো, কিছু কিছু বাড়িঘর করে দেবো। কিন্তু নিজেদেরও যোগাড় করে নিতে হবে। আর যদি দরকার হয়, নিজে কুঁড়েঘরে থাকবেন। গ্রামে যান। আর ঐ ডাকবাংলো করবেন না। আগে ডাকবাংলো করা হতো, এখন তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য ডাকবাংলো উপকারে লাগে। কিন্তু এর মেইনটেন্যান্স খরচ অনেক বেশি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

যাই হোক, আগে যান। যেখানে যাবেন, সেখানে কিছু কিছু টিনের শেড করুন। টাকা কিছু কিছু আমরা রেখেছি দেয়ার জন্য। টিনের শেড করে অফিসারদের জন্য কিছু বাড়ি, কিছু থানা, কিছু জেলখানা করতে হবে। এগুলো আমরা করে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি হয়। এবং সেটারও আপনাদেরই উপর চার্জ দিচ্ছি। রিমেম্বার, টাকা ভাগ করে স্কিম করে, সব বলে দেয়া হবে। গভর্নর সাহেবরা, আপনারা টেন্ডার কল করে তাড়াতাড়ি করে ঘর উঠিয়ে ফেলুন। অনলি ইঞ্জিনিয়ার যাবেন। যদি দরকার হয়, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন, হাই ওয়েজের ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা, গভর্নর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই পাঁচজনকে দিয়ে আমরা কমিটি করে দেবো এবং টাকা তাঁদের হাতে ফেলে দেবো। সেই টাকা আমরা তাদের কাছে

দিয়ে, তাদের স্কিম করে দেবো। সেই টাকা দিয়ে কাটছাঁট করে কিছু অফিস, কিছু টিনশেড ঘরবাড়ি তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। যেখানে যা কিছু পাওয়া যায়, ভাগ করে থাকবেন। এক কামরা, দু'কামরা যা পাওয়া যায়, তাতে থাকবেন। এ দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যায়। এখানে অত ফ্যাশনের কি দরকার! আপনারা ঠিকভাবে কাজ করুন।

অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করবার জন্য আমি সমস্ত মিনিস্টার সাহেবদের অনুরোধ করেছি। ভাইস-প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করেছি। প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে। প্রাইম মিনিস্টার সাহেবকেও অনুরোধ করেছি। তিনিও বলবেন। আর এই যে–আমি আপনাদের জন্য ম্যাপ করে এনেছি। দেখেছেন? অলরেডি ম্যাপ করা হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন, আমরা কত অগ্রসর হয়ে গিয়েছি। আপনাদের এরিয়া কম নয়। বুঝতেই পারছেন, এক-একটা এরিয়ার যা পপুলেশন তাতে দেখা যায় যে, অনেক দেশ–অনেকে বলতে পারে, যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বলতে পারেন যে, ২০ লাখ, ৩০ লাখ লোকের দেশ, শ'খানেক দুনিয়ায় হবেই। আমাদেরও ১০ লাখ, ২০ লাখ, ৩০ লাখ লোকের দেশ, আপনারা এক-একজন তার বাদশার মতো। অফ কোর্স, ইউ আর নট বাদশা। আপনারা খাদেম। সমস্ত জেলা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। শুধু একটার মধ্যে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। বান্দরবান এরিয়ার একটা থানা কক্সবাজারে নিয়ে যেতে হবে। আর সব দেখে ম্যাপ করা হয়েছে। এ্যাডজাস্টমেন্ট, রি-এ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। তার জন্য কমিটি করে দেয়া হয়েছে। সেখানে দেখবেন, কোথায় কি এ্যাডজাস্টমেন্ট রি-এ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার হয়।

এখন আমি সরকারি কর্মচারীদের আর একটি কথা বলব। যদিও আপনারা সরকারি কর্মচারী; আপনারা গভর্নর হয়েছেন। সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার থাকবেন। সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এখন থেকে সবাই গভর্নমেন্টের চাকরি করবেন, সাথে সাথে পার্টি মেম্বারও থাকবেন। পার্টি মেম্বার গোজ, গভর্নরশিপ, গোজ, এভরিথিং গোজ। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? সব কাঁধের উপর চাপিয়ে দেবো। যাতে খালি বক্তৃতা না করেন, এর পর থানায় থানায় দেবো। বলব কাজ করুন। ফেল করলেন–ব্যস খতম। আমি গিয়ে বক্তৃতা করে আসবো, উনি কাজ করতে পারেন না, ওকে বিদায় করে দাও। লোকে তাই করে দেবে। হ্যাঁ, এইভাবে কাজ করতে হবে।

মোটকথা, এই শাসন ব্যবস্থা হয়েছে জনগণের মঙ্গলের জন্য। জনগণ যাতে সোজাসুজি শাসন ব্যবস্থার ফল ভোগ করতে পারে, তার জন্যই এই সিস্টেম করা হয়েছে। সোজা কথায়, কোনোরকম অসুবিধা যেন তাদের ভোগ করতে না হয়। সব কিছুই যেন জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় ইডেন বিল্ডিংস বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, ইউনিয়নে, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি এসবের সুযোগ-সুবিধা পায়।

বড় জিনিস হলো, একটা লাস্ট কথা, যেটা আমি বারবার বলি, করাপশন। আমি আমার সহকর্মীদের ভেতর থেকে যাদের দিচ্ছি এবং এ পর্যন্ত যাদের আমি গভর্নর করেছি, তাঁদের প্রতি–সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে, সকলের প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁরা করাপশনের উর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু শুধু নিজেরা ঘুষ খাওয়াই করাপশন নয়। এ সম্বন্ধে আমার কথা হলো করাপ্ট পিপলকে সাহায্য করাও করাপশন। নেপোটিজমও কিন্তু এই টাইপ অফ করাপশন। স্বজনপ্রীতিও কিন্তু করাপশন। আপনারা এসব বন্ধ করুন। কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। কারো ভয় নাই। আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় করবেন না। আমিও আপনাদের সাথেই আছি।

স্বজনপ্রীতি ছেড়ে দিলে আপনারা করাপশন বন্ধ করতে পারবেন। যাঁরা থানা এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছেন, তাঁরা সেখানে করাপশন বন্ধ করবেন। সেখানে অনেক জিনিসের ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সব কিছুর ডিস্ট্রিবিউশন হয় থানা লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে। এসব জায়গায় যদি করাপশন বন্ধ করতে পারেন, তাহলে উপরের করাপশন অটোমেটিক্যাল বন্ধ হয়ে যাবে। এটার উপর সোজা নজর দেবেন, প্রত্যেকে নজর দেবেন।

আর, আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে, স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটা লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না–আমি এর প্রতিকার দেখতে চাই। এর জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইলো। আর, আমার কর্মী যাঁরা আছেন, যাঁরা আমার কথায় বন্দুক ধরে যুদ্ধ করেছিলেন, যাঁরা আমার কথায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাঁরা আমার কথায় সব কিছু ত্যাগ করতে পারতেন, তাঁরা আমার একটা কথা রাখুন। ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ

করুন, আপনাদের এরিয়াতে যেয়ে দেখুন, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর হয় কিনা। তারা না খেয়েও কথা বলবে না। যদি তারা দেখে যে, তাদের সামনের খাবার অন্যে না খায়। যদি তাদের বোঝনো যায় যে, না, আমার নাই, তাহলে তারা দুঃখ করবে না। তারা যখন দেখে যে, তাদের জন্য যে আটা পাঠানো হচ্ছে, তা অন্যে চুরি করে খায়, তাহলে তাদের দুঃখের জায়গা থাকে না। তখন তারা অভিশাপ দেয়। সে অভিশাপ আপনাদের লাগে কিনা, জানি না। কিন্তু আমার লাগে। কারণ, তারা আমায় দোয়া করেছে। এ দেশের মা-বোনেরা যদি আমার জন্য রোজা না রাখতো, মসজিদে মন্দিরে যদি দোয়া না করতো, তাহলে বোধ হয় আমি ফিরে নাও আসতে পারতাম। লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষ রোজা রেখেছে আমার জন্য মাসের পর মাস।

মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে, যখন ভাবি, কেন এই করাপশন সমাজের মধ্যে ঢুকেছে? এখন অনেকে এগিয়ে আসছে। আপনারা ইচ্ছা করলে নিজের নিজের এরিয়ার মধ্যে করাপশন বন্ধ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা পারবেন। অন্য কাজ করুন বা না করুন, এটা করবেন। দুর্নীতি যেন আর না থাকে।

আর একটা কথা আমি আজ আপনাদের বলে দিতে চাই। থানায় এসে যেন মানুষ বসতে পারে, তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে এলে তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সিও অফিসে যেন পয়সা দিতে না হয়। কোর্টে এলে যেন পয়সা না দিতে হয় এবং তাদের যেন হয়রানি না হয়।

যিনি যেখানে থাকবেন, সেখানকার পুলিশ তাঁর আন্ডারে থাকবে। যে রক্ষীবাহিনী সেখানে থাকবে, তা তাঁর আন্ডারে থাকবে। এমনকি, যে আর্মি সেখানে পোস্টিং আছে, সেই আর্মিও তাঁর আন্ডারে থাকবে এ মুহূর্তে ঐ জায়গায়। অফ কোর্স, তাদের নিজ নিজ কমান্ড আছে। কিন্তু আপনারা যা বলবেন, তা তাদের শুনতে হবে। আপনাদের কর্তব্য আছে অনেক। করাপশন বন্ধ করুন, আল্লাহর দোহাই, করাপশন বন্ধ করবার চেষ্টা করুন। আপনাদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আপনারা পারবেন।

আপনারা লোকালি ঘুরতে থাকুন। আপনারা নৌকায় ঘুরুন, গাড়ি নিয়ে ঘুরুন–মানুষ যাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যে থানায় চুরি-ডাকাতি কমবে না, সেখানকার লোক ডেকে কনফারেন্স করে বলুন, চুরি-ডাকাতি তোমাদের

এরিয়ায় বন্ধ করতে না পারলে তোমরা বিদায় হবে। সাফ সাফ কথা। রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে। তোমরা যারা ঐখানে আছো, তাদেরই এসব বন্ধ করতে হবে।

চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে– এটা ভালো করে জানবেন। সাবধান, আপনাদের সবাইকেই আমি এসব বলে রাখছি এখানে। যাঁরা এখানে আছেন, তাঁদের সবাইকে সাবধান করে রাখছি। আমি এ ব্যাপারে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি। ভাবছি, কি করে এগুলো দূর করা যাবে। আমি একটা কাজের কথা বলি দুই বছর আগে। আর, এক বছর পরে তাতে হাত দিই। রিমেম্বার ইট। আপনারা জানেন, আমাকে ভালো করেই জানেন। আপনাদের কাছে আমার কথা রইল, যাদের আমি গভর্নর করেছি, তারা করাপশন বন্ধ করুন।

ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের যে চারটি প্রোগ্রাম আছে, সেগুলোও আপনারা করুন। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না,– এসব বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ করুন। যেখানে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। মবিলাইজ দি পিপল। পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভালো। যদি না পাওয়া যায়, তবে স্বনির্ভর হন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিল? দরকার হয়, কুয়া কেটে পানি আনুন। আমাদের দেশ পাঁচ হাত, সাত হাত, আট হাত কুয়া কাটলেই পানি ওঠে। সেখানে অসুবিধা কি আছে? যে দেশে পানি আটকে রাখলে পানি থাকে, সেখানে ফসল করবার জন্য চিন্তার কি আছে? আর, এখন থেকে যে সমস্ত সার থানায় যাবে, তা যেন রেগুলারলি গরিব-দুঃখীরা পায়।

আর একটি কথা। মাথা যেন গরম না থাকে। সাবধান, মাথা গরম করে শাসন করা যায় না। মাথা গরম না করে কাজ করতে হবে। আর সংযম ও সহনশীলতা যেন থাকে। সংযম ও সহনশীলতা না থাকলে কোনো কিছুই করতে পারবেন না। এবং যে কোনো ডিসিশন নিতে চিন্তা-ভাবনা করে, পরামর্শ করে করবেন। যেটা ভালো মনে করবেন, সেটা করবেন। চিন্তা-ভাবনা করে। হঠাৎ কিছু করবেন না। হঠাৎ করলে কিন্তু মানুষের ভুল হয়। চিন্তা-ভাবনা করে ডিসিশন নিয়ে যদি মনে করেন, এটা ভালো, তাহলে স্টিক করবেন।

স্কুল-কলেজ আছে, সেখানে গভর্নমেন্ট টাকা দেয়। প্রাইমারি স্কুলে আমরা টাকা দিয়েছি। অনেকে স্কুল করে না, অনেকে পড়ায় না, স্কুলেও যায় না। সেখানে লোকে গরু-ছাগল বেঁধে রাখে। টাকাও পায়, আবার রেশনও দিই। সেগুলো ওয়াচ করবেন। আপনি না পারেন, আপনার একজন অফিসার পাঠিয়ে দেবেন। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার, স্কুল অফিসার, এই সমস্তকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসুন। তাঁরা এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে আসুন। যদি দেখেন কোনো টিচার কাজ করছেন না, তাঁকে বদলি করে দিন। তাঁরা সরকারি কর্মচারী এখন। টাকা যা পাঠানো হয়, খেয়ে ফেলেন। সাবধান। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সবগুলোর ব্রাঞ্চ সব ডিস্ট্রিক্টে থাকবে। ওভারঅল রেসপনসিবিলিটি আপনাদের। ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। বাংলাদেশে এখানে বসে যে কাজ হয়, পাবলিসিটি এই ডিপার্টমেন্ট দেয়। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, সাব-ডিভিশনে এর ব্রাঞ্চ আছে। আল্লাহর মর্জি সেখানকার লোক কয়েকখানা কাগজ দরজায় লাগিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকেন আর বাকি কাগজ সের দরে বিক্রি করে দেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিতে হবে, কত কাগজ এল। গ্রামে গ্রামে যান, পাবলিসিটি করুন।

আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই নতুন সিস্টেম করলাম কেন? কোন ডিপার্টমেন্ট কাউকে মানতে চাইত না। আমি অমুক, আমি ফুড, আমি এগ্রিকালচার, আমি হেলথ, আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং, আমি এটা, আমি ওটা। এসডিও সাহেব, ডিসি সাহেব যতদূর পারতেন করতেন। না পারতেন, না করতেন। কিন্তু সকলেরই সকল বিষয়ে কর্তব্য আছে। একথা সকলেরই মনে রাখা দরকার। যদি গভর্নর বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, এই অফিসারের এই কাজ, তাহলে সেই অফিসারকে সে কাজ করতে হবে। যিনি ফুড ডিপার্টমেন্টের অফিসার, তাঁকে সে কাজ করতে হবে। তিনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অফিসার হলেও এ কাজ করতে হবে। আমার কাজ ওটা নয়–একথা বললে চলবে না। রাস্তার উপর একটা বাঁশ পড়ে আছে, সেটা কেউ উঠাবেন না। বলবেন, এ কাজ আমার নয়, এটা রোড এন্ড হাইওয়েজের। হাত দিয়ে কেউ বাঁশটা তুলবেন না। এ হয়েছে আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। এটা আমার নয়, অমুক ডিপার্টমেন্টের। দ্যাট নুইসেন্স মাস্ট স্টপড ইন দিস কানট্রি। সকলেরই সকল কাজে রেসপনসিবিলিটি আছে। সবাই বাংলাদেশের নাগরিক,

বাংলাদেশের সরকারের চাকরি করে। আপনাদের কর্তব্য, যেখানে অন্যায় বা খারাপ কাজ হয়, সেটা দেখতে হবে। যাঁর কাজ তাঁকে ডেকে বলুন। কিন্তু খবরই দেয় না কেউ।

এই ঢাকা শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি, কোটি কোটি টাকার মাল এখানে সেখানে পড়ে থাকে। তেজগাঁও এয়ারপোর্টের কাছে মাল পড়ে ছিল। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের কাছে মাল পড়ে ছিল। কিছু মাল পড়ে ছিল অন্যান্য জায়গায়। এটা কার? এটা আমার নয়, টিএন্ডটি'র। এটা কার? এটা আমার নয়, সিএন্ডবি'র। আমি বললাম, এসব কথা আমি বুঝি না। আগামীকালের মধ্যেই সব মাল পরিষ্কার করে নেয়া হোক। এটা ঢাকা শহরে দেখেছি। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখতে হবে, কোথায় কি আছে, না আছে। আমরা ঢাকা মেট্রোপলিসে বাস করি। আর কয়দিন পর ঢাকা শহর থাকবে কিনা, ভাবার কথা। টিএন্ডটি রাস্তা কেটে, যায়, গ্যাস রাস্তা কেটে যায়, ওয়াসা কেটে যায়। রাস্তার জান শেষ। প্ল্যান্ড ওয়েতে কাজ হচ্ছে না।

আর একটা কথা। কো-অর্ডিনেশন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাউ, আপনাদের রেসপনসিবিলিটি আর ক্ষমতা কতখানি। আমি চারটি কথা বলেছি সেকেন্ড রেভল্যুশনের জন্য। আশা করি, সকলের মনে আছে। এগুলো সামনে রেখে কাজ করবেন। বক্তৃতা যা করি, মেহেরবানি করে একটু পড়ুন, যেগুলো পলিসি বক্তৃতা করেছি। আজ বক্তৃতা করি নি, আজ আপনাদের ট্রেনিংয়ের বিষয় আলোচনা করেছি। আপনাদের ট্রেনিং কোর্সের উপর বললাম আপনারা কি কি শিখে যাবেন, এর অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, কেন অন্য মিনিস্টার এটা বললেন, এসব বুঝতে হবে। প্ল্যানিং থেকে কাগজপত্র নিতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমাদের একটা ন্যাশনাল প্ল্যানিং আছে। সে সম্বন্ধে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাল বলবেন। ন্যাশনাল প্ল্যানিং একটা হবে। কিন্তু লোকালি হাপহ্যাজার্ড ওয়েতে কাজ করা হয়। আগে দেখেছি, ওয়ার্কস প্রোগ্রামে মাটি কাটার দরুন পানি বন্ধ হবার ফলে জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওটা আমরা বন্ধ করেছি। এখন লোকালি বসে আমাদের প্ল্যান করতে হবে। আপনারা নিজেরা কামড়াকামড়ি করবেন না। এ একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিস্ট্রিক্টে পাঁচজন বা ছয়জন এমপি আছে, চারটি থানা আছে। কেউ বলবেন, আমার থানায় এটা হোক, কেউ বলবেন, আমার থানায় ওটা হোক,–এভাবে কাজ হয় না। এই প্রোজেক্টটি ভালো, এই বছর হোক, নেকস্ট প্রোজেক্ট এই বছর

হোক, তার পরের প্রোজেক্ট অন্য জায়গায় করুন। এইভাবে আস্তে আস্তে করুন। ভাগ করে করে প্ল্যান নষ্ট করবেন না। এখানে এই জিনিসটা ভালো হবে, এটা করলে এতো হাজার একর জমিতে ফসল ভালো হয়, এই খালটা আমি করবো। এখানে এই রাস্তাটা করলে ভালো হয়, এটা করবো। এখানে এই পুকুরটা খনন করলে ভালো হয়, এটা আমি করবো। এইভাবে কাজ করতে হবে।

সবাই যখন কনফারেন্সে বসবেন, তখন কেউ বলবেন না, যে, আমার থানায় কত দিলেন। আগেই সবাই প্রোজেক্ট নিয়ে আসবেন, কাজ করবেন। তারপর যা দেয়ার দিবেন। প্রথমে দেখবেন, কোনটাতে মানুষের উপকার বেশি হবে। সেটা আগে করবেন। আজ এখানে হোক, কাল ওখানে হোক, এভাবে করলে পাঁচ বছরে সব জায়গায় হয়ে যাবে। অসুবিধার কিছু নাই। দু'টো করে প্রোজেক্ট করুন। মানুষ দেখুক, বুঝুক। এটা ভুললে চলবে না আপনাদের।

সেজন্য আপনারা নিজেরা আপনাদের ছোট ছোট প্ল্যান রাখুন। এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন। আপনাদের কাছে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে, টেস্ট রিলিফ যাবে, ফুড ফর ওয়ার্ক যাবে। এসবের জন্য প্রোজেক্ট করে রাখবেন। এছাড়া কোনো প্রোজেক্ট ভালো হলো, তা দেখবেন– ওয়ার্কসে পাঠিয়ে দেবেন। পাওয়ারের দরকার যেখানে আছে, তার প্ল্যান করে সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি খবর পেলাম, ঠাকুরগাঁয়ে একটা কোল্ড স্টোরেজ করা হয়েছে। এক বছর আগে সেটা হয়ে গেছে। কিন্তু পাওয়ার নাই। খবর নিয়ে জানলাম, পাওয়ার সেখানে যেতে এক বছর লাগবে। কারণ, খাম্বা নাই। খাম্বা নাকি বিদেশ থেকে আনতে হবে। মিনিস্টার সাহেবকে বললাম, খাম্বা-টাম্বা আমি বুঝি না। বাঁশ তো আছে। এখানে দাঁড়াও, খাম্বা কাটো, দা লাগাও। দেড় মাস, দুই মাসের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এটা লাগাও। কি করে লাগবে, সেটা আমি বুঝি-টুঝি না। দিল, লেগে গেল। কিন্তু আমার কাছে যদি না আসত, এক বছরের আগে খাম্বা পেত না, ঐটা হতো না। খাম্বা আসে কোত্থেকে? পাওয়া গেল, আলু রাখল। আলু রাখার জায়গা নাই। এই মেন্টালিটি কেন হয়? খাম্বা বাংলাদেশের গাছে গাছে হয়। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় পাওয়ার দিতে চাই।

কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। এর জন্য ১০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। এর জন্য আমার একটা টার্গেট রয়েছে। আপনারা ৬১ জন গভর্নর যখন চার্জ নিয়ে যাবেন, দুই-তিন মাসের মধ্যে জায়গা ঠিক করে, একটা ভিলেইজ ঠিক করে সব ব্যবস্থা করবেন। আমি এখন প্রোগ্রাম করছি। আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ।

প্রথমে এরিয়া ভাগ করে নেবেন। এমন জায়গায় নেবেন, যেখানে আমি ইমিডিয়েটলি পাওয়ার দিতে পারি। ঐ কো-অপারেটিভগুলোতে আমি পাওয়ার দেবো। ধরুন, রাজশাহীতে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে, যেখানে পাওয়ার নিতে পারি। যদি নাটোরে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে যেন সেখানে পাওয়ার নিতে পারি। এভাবে একটা, দুটো, তিনটে গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ। এতে কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই।

তারপর সিস্টেম যা হবে, সবাইকে তা বলে দিতে হবে। এটাকে সাকসেসফুল করতে হবে। এটাকে পুরাপুরি সাকসেসফুল করতে হবে,—এটা স্পেশাল কো-অপারেটিভ নামে পুরাপুরি করতে হবে। তারপর আমার সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বারদের সুপারভিশনে একটা কো-অপারেটিভ করব। তাঁরা সেখানে সুপারভাইজ করবেন। একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ তারপর আর কোনো অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভ-এ মানুষ দেখে যে এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও, আমাদের করে দাও, আমাদের করে দাও।

আর আমাদের আইডিয়া হলো, একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার করুন। শেখে বই পড়ে, ট্রেনিং হয় না। হলেও খুব কম হয়। কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর, সবচেয়ে যে বেশি শেখে সে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন। কাজ করে দেখিয়ে দিন, কিভাবে কাজ করতে হয়। বই পড়ে আমাদের একটা ফ্যাশন হয়েছে।

ট্রেনিং সেন্টার করুন। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার করে সেখানে সবাইকে নিয়ে যান। এক মাস এখানে ট্রেনিং হবে। সেখানে পেনশন খাইয়ে কি হবে? কি করবেন সেখানে? লেকচার? পাট গাছে ধান হয় না, ধান গাছে পাট হয় না,—বাংলাদেশের মানুষ এটা ভালোই বোঝে। তামাকে বৃষ্টি পড়লে তামাক নষ্ট হয়, তাও বোঝে। রবিশস্য কেমন করে হয় তাও বোঝে। আমরা অনেক লোক এখানে আছি। আমাদের কোনো জন ধান-আম-পাট বেচে লেখাপড়া শিখি নি—এই যাঁদের গভর্নর করেছি, তাঁদের মধ্যে কে ধান-পাট বেচে, মরিচ-পেঁয়াজ বেচে লেখাপড়া শেখেন নি? আপনাদের প্রাকটিক্যাল নলেজ নাই। খালে ডুবে গোসল করেছি আমরা। নদী সাঁতরে পার হয়েছি। কত কি গ্রামে করেছি। কি জানেন না।

তবে, হ্যাঁ, একটা সিস্টেম শিখবার জন্য কোর্স আমরা দিচ্ছি। এই জন্য যে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখতে হবে আপনাদের কাগজে কলমে। কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।

আপনারা আমার কথা জীবনভর শুনেছেন। আজো শুনুন। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশের জন্য কাজ করুন। সিস্টেমটাকে আমাদের সাকসেসফুল করতেই হবে। আমি অনেক ভালো অফিসার দিয়েছি। যদি দরকার হয়, ভবিষ্যতে আরো দেবো। আমি তাঁদের বিশ্বাস করি বলেই দিয়েছি। বিশ্বাস করি, তাঁরা ভালো কাজ করবেন। এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

এতে কিন্তু একটা কমপিটিশন আছে। এই সিস্টেমে গভর্নমেন্ট অফিসার আছেন, আর্মি অফিসার আছেন, পলিটিশিয়ানরা আছে, আর এমপি আছেন, নন-এমপি আছেন। কমপিটিশানও কিন্তু একটা আছে। এমপি আছেন, নন-এমপি আছেন, সরকারি কর্মচারী আছেন, আর্মি অফিসার আছেন, কমপিটিশন ভালো হবে।

যাই হোক, তার জন্য একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাফ কথা বলে দিলাম, বি কেয়ারফুল। আপনারা কিন্তু সবাই এক।

———